পুরুষমেধ

এক

ওগো পুষাণ, ওগো পথের দেবতা, আমাকে পথ দেখাও। কে জানে কোন্ অপদেবতার মায়ায় সারা দিন এই গহীন বনে ঘুরে ঘুরে মরছি। পুষাণ, তুমি সকল মায়াবীর শ্রেষ্ঠ মায়াবী, তোমার মায়ার সামনে কার মায়া দাঁড়াতে পারে! সূর্যের আলোর মত প্রখর তোমার ওই তীরের আঘাতে, যারা অন্ধকারের গোপন পথে চলাচল করে, তাদের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক।

হে পথিকের বন্ধু, পথিকের রক্ষক, ঊর্ধ্বে আকাশ-লোক তোমার অধিষ্ঠান। এমন কোন্ পথ আছে যা তোমার দৃষ্টির বাইরে? আমাদের গরু আর মেষগুলি যখন তৃণভূমিতে চরতে চরতে পথ হারিয়ে বিপথে চলে যায়, তখন তুমিই তো তাদের পথ দেখিয়ে আন। আমি আজ পথ হারানো পশুর মতই নিরুপায়, তুমি আমাকে পথ দেখাও। পথ দেখাও, পথ দেখাও, ওগো দেবতা, পথ দেখাও।

সুদাস কত রকম করেই না তার প্রার্থনা জানাল। কিন্তু পুষাণ তার ডাকে সাড়া দিলেন না। দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, সুদাস পথ খুঁজে পায় না। এমন তো কোন দিন হয় না।

কত দিন ধরে দল বেঁধে শিকার করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। বুনো পশুগুলি কোথায় যে সব পালিয়েছে! বন কি পশু-শূন্য হয়ে গেল নাকি? এমন অবশ্য মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, সুদাস বুড়োদের মুখে শুনেছে। বনের দেবতারা নিয়ম ভঙ্গ করে চলতে দেখলে অপ্রসন্ন হয়ে শিকারের পশুদের এমন ভাবে আগলে রাখেন যে, তখন চোখের সামনে দিয়ে গেলেও নাকি তাদের চোখে দেখা যায় না। বুড়োরা আরও বলে, এ সব আজকালকার দিনের দোষ। এ যুগের মানুষ তো

আর ঋত রক্ষা করে চলে না, পদে পদে নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙে। এই-জন্যই তো লোকের এত তুর্দশা।

ক'দিন ধরে ওরা বলাবলি করছিল একটা হরিণের দল নাকি নেমে এসেছে। খবরটা শুনেই ওর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। ভোর হবার আগেই অন্ধকার থাকতেই সুদাস বেরিয়ে পড়ল সন্ধান নিতে। বনের ভিতর ঢুকে কিছুটা যেতেই সে বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়। এক দল পশু বনের পথে তাদের চলাচলের চিহ্ন রেখে গেছে। এপাশে ওপাশে কতগুলি ডালপালা ভাঙা। কতগুলি নুয়ে পড়া ডালের পাতা মুড়িয়ে মুড়িয়ে খেয়েছে। পাতা খাওয়া একটা কচি ডালকে নাকের উপর চেপে ধরে সে খুব কষে দম টানল। শেষে দমটা আস্তে আস্তে ছাড়তে ছাড়তে অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা নেড়ে নিজের মনেই বলল, হুঁ, আজ রাত্রেই এসেছিল বটে! কিন্তু কি পশু ? আবার সে শুঁকে দেখল, শেষে বলল, হুঁ, হরিণ-হরিণ গন্ধই তো।

সুদাস চতুষ্পদের মত হাত-পায়ের উপর ভর দিয়ে মাটিটা পরখ করে দেখতে লাগল। পাতলা পাতলা ঘাস, শুকনো পাতা পড়ে মাঝে মাঝে স্তূপাকৃতি হয়ে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু মাটি, দেখা যায় কি দেখা যায় না। অন্ধকার তখনও কাটে নি। কিন্তু সুদাসের চোখ অন্ধকারে বিড়ালের মতই জ্বলে। মাটির উপরে অস্পষ্ট পদচিহ্ন তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সে উপুড় হয়ে পশুর মত মাটি শুঁকতে শুঁকতে উল্লাসে চীৎকার দিয়ে উঠল, হরিণ! হরিণ! ঘুমন্ত বনের অখণ্ড নিস্তব্ধতা তার এই চীৎকারে খান খান হয়ে ভেঙে গেল। মাথার উপর ঝোপড়া গাছটার পাতার আড়ালে ক'টা পাখি ঘুমিয়ে ছিল। ওরা এই আচমকা শব্দে জেগে উঠে ভয়ে কিচিমিচি করে উঠল। ওদের এই কিচিমিচি শব্দে চার দিককার গাছে গাছে অসংখ্য পাখি এক সঙ্গে ঐকতান তুলল। ওরা ভেবেছে ভোর হয়ে গেছে, এ বুঝি তারই সংকেত। সত্যি সত্যিই ভোর হতে আর বেশী বাকি নেই।

সুদাস সেই চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছে। যেতে যেতে কখন এক সময় হরিণের পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেল। অনেক খুঁজেও আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না। বেলা বাড়তে লাগল, রোদ চড়তে লাগল, ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল মাথা। সুদাস বন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু যতই যায়, বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পায় না। সব অজানা আর অচেনা, এমন জায়গায় আর কোন দিন আসে নি সে। চলেছে তো চলেইছে, চলার বিরাম নেই, কিন্তু কোথায় চলেছে? এ পথ তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে চমকে উঠল সুদাস। এ-কি! সূর্য আজ এ-পথ দিয়ে চলেছে কেন? অন্য দিন তো এ-পথ দিয়ে যায় না। তার তো বাঁধা পথ, রোজ সেই পথ দিয়েই যায়। তবে কি তারও আজ পথের ভুল হয়ে গেছে? কিন্তু সূর্য তো তার মত মানুষ নয়, সূর্য দেবতা, সারা আকাশ জুড়ে তার রাজত্ব, তার কি কখনও ভুল হতে পারে?

তা হলে যে-কথাটা কিছুক্ষণ ধরে মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারছিল সেইটাই ঠিক। আর সন্দেহ নেই। এ নিশ্চয়ই সেই ঋভুদের কাজ। সেই খর্বাকৃতি, দুষ্ট-বুদ্ধি অপদেবতার দল। ওরা ছাড়া কেউ নয়। ওরা মানুষের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়, একটু ছিদ্র পেলেই হ'ল, আর কথা নেই, অমনি তার উপর চেপে বসে। মানুষ কি আর তখন মানুষের মধ্যে থাকে? সে সোজা জিনিস উল্টো দেখে, পথ-বিপথ জ্ঞান থাকে না। আর সেই সুযোগে মানুষের চিরশত্রু এই ঋভুরা তাকে জলার মধ্যে নিয়ে ডুবিয়ে মারে, কাদার মধ্যে পুঁতে রাখে, কখনও বা পাহাড়ের উপর তুলে নিয়ে সেখান থেকে গড়িয়ে ফেলে দেয়। সেই ঋভুদের পাল্লায় পড়েছে সে, আজ কি আর তার রক্ষা আছে! সুদাস ভাল করে চোখ মুছে নিয়ে সূর্যের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিকই তাই, সূর্যের রথ আজ দিক পরিবর্তন করেছে। জন্মাবধি সূর্যকে সে দেখে আসছে, কোন দিন সে তার ঋত থেকে বিচ্যুত হয় না। সূর্য যদি ঋতভ্রষ্ট হয়, এ সংসার কি আর তবে চলতে পারে! সুদাস

বুঝল, সূর্য ঠিকই আছে, তারই মতিভ্রম ঘটেছে। আর এ সবই সেই ঋভুদের মায়া।

এখন কি করবে সুদাস? এ অবস্থায় কী-যে করতে হয় তা তার ভাল করে জানা নেই। তবু মাথায় যা এল, তাই সে করল। সে তার মাথার চুলগুলি ঝাড়ল, হাত পা সর্বাঙ্গ ঝাড়ল। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে কাপড়টা খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাপড়টাকে প্রাণপণে ঝাড়তে লাগল। কি জানি কাপড়ের আনাচে-কানাচে, ভাঁজে ভাঁজে আর সুতোর ফাঁকে ফাঁকে ঋভুরা যদি রক্তখাদক কীটের মত আশ্রয় নিয়ে থাকে! তারপর সে তার সর্বাঙ্গে থু থু ছিটাতে লাগল। বড়-ছোট সমস্ত দেবতাকেই ডেকে ডেকে সে প্রার্থনা জানাল, হে দেবতারা, তোমরা আমাকে এই ঋভুদের হাত থেকে রক্ষা করো।

কিন্তু এত কিছু করবার পরেও সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে ফিরে এল না। সুদাস তার বাড়ি ফেরবার পথও খুঁজে পেল না। সে একবার এদিক থেকে ওদিকে, আরেক বার ওদিক থেকে এদিকে, এমনি ভাবে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে মরতে লাগল।

ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-শ্রান্তিতে তার সর্ব শরীর অবসন্ন হয়ে এল। কিন্তু সর্বোপরি দেখা দিল আতঙ্ক। এমন ভয় সে তার জীবনে আর কখনও পায় নি। সূর্য অস্ত গেছে। এগিয়ে আসছে অন্ধকার রাত্রি, শকুনির মত কালো পাখা মেলে চলে আসছে। আর এই অন্ধকার কত কিছু নিয়ে আসছে তার সাথে করে, যাদের নামও সে জানে না। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই-যে তার এপাশে ওপাশে চারদিকে দৈত্যের মত বিরাট বিরাট গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, এরা সবাই সত্যিকারের গাছ তো? দিনের আলোয় কত মায়াবী দৈত্য-দানব হয়তো এদের মাঝে মাঝে নিরীহ গাছের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কে জানে, ওরা ওর দিকে তাকিয়ে কানাকানি আর হাসা-হাসি করছে কি না। অন্ধকারটা আরও গাঢ় হয়ে আসুক, তার পরেই ওরা হয়তো ওদের স্বমূর্তি ধরবে। তখন?

বিষম ভয় পেয়েছে সুদাস। কিন্তু সুদাস কোন দিনই ভীরু নয়। সমাজে সে সাহসী পুরুষ বলে পরিচিত। তারা দল বেঁধে যখন শিকারে যায় বা পার্বত্য দস্যুদের কাছ থেকে অপহৃত গো-ধন কেড়ে নিয়ে আসবার জন্য লড়াই করতে যায়, তখন সব সময় সামনের সারিতেই সে থাকে। মারতে আর মরতে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। কিন্তু আজ-যে তার ডাইনে, বাঁয়ে আর পেছনে কেউ নেই। দলছাড়া যে মানুষ, সে মানুষ কি মানুষ? দলের জোরেই মানুষের জোর, দলের সাহসেই সাহস। একা মানুষ একটা পুরো মানুষ নয়, এত দিন বাদে এই কথাটা সে আজ প্রথম বুঝল।

দিনের আলোর শেষ কণাটুকুও মিলিয়ে গেল। ক্রমে অন্ধকার ঘন হতে হতে এমন কঠিন রূপ ধারণ করল যে, মনে হ'ল এক পা এগোতে গেলেই ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হবে। সুদাস বুঝল, অন্ধকারের প্রাচীর দিয়ে ওরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। এর ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার মত কোন পথ নেই। জলে স্থলে আকাশে যে-সব দেবতা বিচরণ করে থাকেন, সুদাস তাঁদের সবার কাছেই কাকুতি জানাল। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না! শুধু উপর থেকে কারা যেন চাপা হাসি হেসে উঠল। এই শব্দ সুদাসের কাছে অপরিচিত নয়। বনের মধ্যে হঠাৎ যখন বাতাস ছাড়ে, তখন ঠিক এমনি শব্দই হয়ে থাকে বটে। কিন্তু সে তো দিনের বেলায়। দিনের বেলায় এই শব্দের যেই মানে, নিকষ-কালো রাত্রিতেও কি তার একই মানে হতে পারে? সুদাস ধপ্ করে মাটির উপর বসে পড়ল। সে বুঝল—এইবার। সারাটা বন যেন ঋভুদের সঙ্গে একই ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠেছে। সে মরীয়া হয়ে ভাবল, যা হবার তা যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভাল। যা ঘটে ঘটুক, এ নিয়ে সে আর ভাবতে পারে না।

কিন্তু না ভেবে উপায় আছে! ভাবতেই হয় যে। কি একটা প্রাণী তার পাশ দিয়ে সড়সড় করে দ্রুত চলে গেল। অন্ধকারে দেখতে না পাওয়া গেলেও চলার রকম থেকেই বোঝা গেল সাপ। চমকে

পেছিয়ে গেল সুদাস, কিন্তু পরক্ষণেই স্থির হয়ে বসল। কি হবে'ভয় করে? যা হবার হয়ে যাক।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। কোন কিছুর শব্দ নেই, থমথম করছে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ গোঁ গোঁ করে চাপা একটা আওয়াজ, তারপর ভীষণ একটা গর্জন। একটুখানি দূরে কে যেন দুটো কি নিয়ে ছোঁড়াছোঁড়ি শুরু করে দিয়েছে। মনে হ'ল ওরা জড়াজড়ি করতে করতে যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সুদাসের বৈরাগ্যের ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। যা হবার হয়ে যাক, এ কথাটা আর মনে রইল না। হাতের কাছে যে-গাছটা পেল, তাই ধরে সে তর তর করে উঠে পড়ল।

বেশ বড় আর মোটা গাছটা। কিছুটা উপরে উঠেই কাণ্ডটা দু-তিনটা ডালে বিভক্ত হয়ে গেছে। সে জায়গাটায় দিব্যি বসা যায়, বসে বসে নিরাপদে ঘুমানোও চলে। কিন্তু ঘুম সুদাসের চোখে নেই। টপ্ টপ্ করে গাছের পাতা থেকে শিশির বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ছে, তারই মধ্যে সুদাস শুনতে পাচ্ছে ঋভুদের পায়ের শব্দ। মাটির তলা থেকে কত রকম কীট পতঙ্গের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠছে, কিন্তু সুদাসের মনে হচ্ছে, এই গুঞ্জন সাধারণ কীট পতঙ্গের গুঞ্জন নয়, এ যেন তাদের রাত্রির আসর বসেছে। আর তাদের যা কিছু আলাপ-আলোচনা সবই চলছে সুদাসকে কেন্দ্র করে। সুদাস না দেখেও দেখতে পাচ্ছিল, শত শত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আগুনের হলকার মত ওর উপরে এসে পড়ছে। যাদের ভয়ে সে গাছের উপর এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের হুটোপাটি এখনও থামে নি। কি ওগুলি? শেয়াল? কিংবা অন্য কোন বুনো পশু? না, না, সুদাস ভাল করেই বুঝতে পারছে এ-সব ওদেরই মায়া। বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, তেমনি করে সারা দিন ওরা তাকে নিয়ে খেলেছে। তারপর যখন খুশী, ওরা ওদের শেষ খেলা খেলবে। এমন অনেক কাহিনী সে লোকের মুখে শুনেছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে গেল কে বলবে! সুদাসের সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কঃ কঃ কঃ, কহ্-হ্-হ্-হ্, কুরর পক্ষীর এই তীক্ষ্ণ আওয়াজে বনের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়ে উঠল। সুদাস সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে নুয়ে পড়ল। এই কুরর পক্ষীই সুদাসদের বংশের আদিপুরুষ। আর ভয় কি? আদি পিতা অভয় বাণী নিয়ে এসেছে। আজই প্রথম নয়, তার জীবনে আরও এক দিন এমনি ঘটনা ঘটেছে। ঠিক এমনি ভাবেই এক দিন বিপদের ঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আর সেই মুহূর্তেই একটি আকাশ-কাঁপানো ডাক শোনা গিয়েছিল—কহ্-হ্-হ্-হ্। সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বায়ুর তাড়নায় বিপদ দেখতে দেখতে মেঘের মত মিলিয়ে গেল। রক্তের টানকে এড়িয়ে চলবার শক্তি কারু নেই। দেবতাদেরও না। আদি পিতা কুরর স্বর্গের অধিবাসী, তবু সন্তানের টানে তাকে ফিরে ফিরে আসতে হয়। আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত কত দেবতার কাছে সে মাথা খুঁড়ে মরেছে, কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় নি। আদি পিতার কথা একবারও তার মনে হয় নি, তবু সন্তানের মায়ায় নিজেই সে চলে এসেছে।

সুদাসের রক্তে ঝংকার দিয়া উঠল। একই রক্ত যেন এক সুরে কথা বলে উঠেছে। আদি পিতার সঙ্গে অদ্ভুত একটা একাত্মতা অনুভব করল সে। সে-যে মানুষ, সে কথা তার মনে রইল না। সেই মুহূর্তের জন্য সে যেন সত্য সত্যই কুরর হয়ে গেল। কুররের মতই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে সাড়া দিয়ে উঠল, কহ্-হ্-হ্-হ্-হ্। একটু বাদেই তার সম্বিত আবার ফিরে পেল সে। কিন্তু ভয় বলতে কিছুই তার এখন নেই। সে বুঝতে পারল, সে আর এখন একা নয়, আদি পিতা তার মাথার কাছে বসে পাহারা দিচ্ছে। তুচ্ছ ঋভুরা আর কি করবে! সারা দিনের ক্লান্ত দেহ আর ক্লান্ত মন এবার পরম নিশ্চিন্ততায় শিথিল হয়ে এল। ঝিরঝির করে বাতাস বইছিল। সুদাস যে-ভাবে বসে ছিল, সেই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে অবাক হয়ে ভাবল

সুদাস, এ কি, এমন অবস্থায় এখানে কেন সে? পরক্ষণেই সব কথা মনে পড়তে সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়ল। গাছ থেকে নামতেই আরেক দফা অবাক হবার পালা—এ কি, এ-যে তার চেনা জায়গা! কাল ভোরে এইখানে এসেই সে হরিণ চলাচলের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিল। অথচ কাল সন্ধ্যাবেলা এখানে আসার পরেও জায়গাটাকে কিছুতেই চিনে উঠতে পারেনি। এখান থেকে তার ঘর কতটুকুই বা দূর! অপদেবতা যখন ভর করে, তখন এমনি করেই মতিভ্রম ঘটে।

সুদাসের বউ ইদা অস্থির হয়ে ঘর বার করছিল। কাল সারা রাত সারা দিন ঘরে ফেরে নি সুদাস। এমন কোন দিন হয় না। সুদাস তো অন্য পুরুষের মত নয়। তার যত কিছু সব ইদা-কে নিয়েই। আর কোন মেয়েকে নিয়ে এখানে সেখানে রাত কাটানোর অভ্যাস তাব নেই।

সুদাসকে দেখে প্রথমে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইদা—ওর এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! পরক্ষণেই দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কথায় আর কান্নায় মিলিয়ে হাউ মাউ করে উঠল। সুদাস দু'কথায় ব্যাপারটা সেরে ফেলল। বেশী কথা বলবার ফুরসৎ নেই। তার পেটে তখন ক্ষিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ইদারও পেটে ক্ষিদে ছিল প্রচুর। দুশ্চিন্তায় কাল ওর ভাল করে খাওয়া হয় নি। কালকের বাসি খাবারটা চাপা দেওয়া আছে। দু'জনে একই সঙ্গে বসে গেল। মুঠো মুঠো যবের ছাতু, তার সঙ্গে সাত দিন আগেকার শুকনো নেউলের মাংস আগুনে ঝলসে নেওয়া হয়েছে। আঃ, কি অপূর্ব তার স্বাদ! ওরা দু'জনে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। পেটে যদি ক্ষিদে থাকে, সংসারে খাওয়ার মত আনন্দ আর কি আছে! সুদাস আর ইদার অভাবের সংসার, তাই ক্ষিদের অভাব ওদের কোন দিনই থাকে না। আজ ক্ষিদেও আছে, খাবারও আছে, আজ ওদের মত সুখী কে! শুধু কি তাই? আরও আছে।

ইদা বড় কর্মঠ আর সঞ্চয়ী মেয়ে। সে কোন কিছু ফেলে দেয় না। ঝড়িতি পড়তি যবের ভূষি আর কণাগুলিকে গোপনে গোপনে জমিয়ে রেখেছে। আর তাই পচিয়ে পচাই তৈরি করেছে। সুদাস এ কথা কেমন করে জানবে! মাটির পাত্রের ঢাকনাটা খুলতেই ভক্ করে গন্ধটা বেরিয়ে পড়ল। আর সেই গন্ধে নেচে উঠল সুদাসের মনটা।

ইদা মাটির ভাণ্ডটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরেছে, সুদাস চোঁ চোঁ করে টান মারল। অনেক দিন বাদে আজ আবার অমৃতের স্বাদ পেয়েছে। নাঃ, ইদার মত এমন একটা মেয়ে সংসারে আর হয় না। পচাইর ভাণ্ডটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সুদাস ডাকল, আয়, এবার তুই আয়।

"না", ছিটকে সরে পড়ল ইদা।

সুদাস উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল। পিছলে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু ওর মাথার এক গোছা চুল সুদাসের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ে গেল। শেষপর্যন্ত ধরা দিতেই হ'ল। আরও গভীরভাবে ধরা পড়বার জন্যই তো ওর এই লুকোচুরি আর ছলনা। আচমকা হ্যাঁচকা টানে ওর গা থেকে কাপড়টা খসে পড়ে গেছে। ওর নিটোল কালো যৌবনোদ্ধত দেহ সুদাসের দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সুদাস জোর করে ওকে এক ঢোক পচাই খাইয়ে দিল। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল ইদা। এ হাসির মধ্যে আমন্ত্রণের গূঢ় সংকেত। ইদারা জানে কেমন করে পুরুষের মনের আগুনকে উসকে তুলতে হয়।

একটা ক্ষুধা মিটতে না মিটতেই আর এক ক্ষুধা জেগে উঠেছে। প্রচণ্ড বহ্নি-মুখী সেই ক্ষুধা। প্রমত্ত কুরর যেমন করে ডানা প্রসারিত করে কুররীকে জাপটে ধরে, তেমনি করে ইদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুদাস। তার পর অশান্ত সমুদ্রে সে কি তরঙ্গোচ্ছ্বাস!

ঝড় যখন থেমে যায়, উন্মত্ত সমুদ্র স্থির হয়ে আসে। সুদাসের

পরম ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেছে, সেই অস্থির উন্মাদনা শান্ত হয়ে গেছে ইদা মায়ের মত স্নেহে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে, আর মমতার সঙ্গে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের মত সুখী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই, না রে ইদা?

চুপ চুপ চুপ, এমন কথা মুখ ফুটে বলতে নেই, ওরা শুনতে পাবে যে।

কেন, চুপ করব কেন? কারা শুনতে পাবে?

ইদা সুদাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, আকাশে বাতাসে কত কি সব ঘুরে বেড়ায়। ওরা তক্কে তক্কে থাকে, কার কি সর্বনাশ করতে পারে। ওরা যে আমাদের ভাল দেখতে পারে না।

ইদার কথা শুনে সুদাসের মনে পড়ে গেল ঋভুদের কথা। দুঃস্বপ্নের মত গত রাত্রির কথাগুলিকে স্মরণ করে সে একটু শিউরে উঠল।

দুই

বৃষ্টি নামে না, নামে না। ওরা সেই কত দিন ধরে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে! চাষের সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই, মেঘ তো নামে না। কবে আকাশ ভেঙে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি নামবে আর তার ছোঁওয়া পেয়ে রোদে-পোড়া পাথুরে মাটি ননীর মত কোমল হয়ে উঠবে। মাটি প্রসারিত করে দেবে আপনার দেহ, লাঙ্গলের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মেয়েরা দল বেঁধে আকাশের দিকে কালো কটাক্ষ হেনে বৃষ্টি ঝরানোর গান গায়,

ধলা মেঘ কালা মেঘ, আয় আয় আয়
তোর গলায় দেব ফুলের মালা, নূপুর দেব পায়
নরম মেয়ে তুল তুল
কুঁড়ির মুখে রাঙ্গা ফুল
আর কত কাল করবে দেরী সময় বয়ে যায়।

এমন মধুর প্রলোভনে দূর আকাশের কালো মেঘ বুঝি না এসে পারে না। ধূসর কালো বৃষভের মত তার শৃঙ্গ দিগন্ত ফুঁড়ে দেখা দেয়। তার পর তার পাহাড়ের মত বিশাল বপু ভেসে ওঠে, আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সারা আকাশ ব্যাপ্ত করে গর্জন করে ধেয়ে আসতে থাকে। প্রমত্ত বৃষভের মতই দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে গম্ভীর সুরে গর্জন করে ওঠে—গুম গুম গুম!

মেঘ এসেছে, মেঘ এসেছে—সারা জনপদে আলোড়ন পড়ে যায়। আশা আর আগ্রহে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে সবাই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। গায়িকার দল আনন্দে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে

ওঠে। হ্যাঁ, মেঘ ওদের ডাক শুনেছে। ওরা আঁচল উড়িয়ে উড়িয়ে মেঘকে ডাকে—ধলা মেঘ কালা মেঘ ঝরঝরিয়ে আয়! এবার গানের সুরে ওদের পায়েও নাচের সুর লাগে। আর সেই নাচের তালে তালে ওদের পরিপূর্ণ বুক ঢেউ-এর মতই দুলে দুলে আছড়ে পড়তে থাকে! দমকা বাতাসের ঝাপটায় ওদের চুলগুলি এলোমেলো হয়ে উড়ে চলে।

ক'টা মেয়ে ঋতুমত্তা গাভীর অনুকরণ করে উপুড় হয়ে নুয়ে পড়ে ঘন ঘন ডাকতে থাকে ম্ হা, ম্ হা, ম্ হা! বাকী মেয়েরা নেচে নেচে গান করে,

শ্যামল বৃষ কোথায় ধাও?
গাভীর প্রাণের সাধ মিটাও।
হাঁকছে বায়ু, জাগছে ঝড়
ঝাঁপিয়ে পড় গাভীর পর।

ধূম্র-কৃষ্ণ মেঘ যেন তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলে—হুঁ-হুঁ-হুঁ! কিন্তু একই সঙ্গে চার দিক থেকে ডাক আসে যে। এক নায়ক তার সহস্র নায়িকা—মেঘ কোন্ দিকে যাবে? সাদা মাটি, পাংশু মাটি, কালো মাটি, পিঙ্গল মাটি, গেরুয়া মাটি, কত দেশ কত জনপদের কত রকম মাটি, কত রকম ইসারা করে তাকে ডাকে, কার ডাকে সে সাড়া দেবে? উদ্‌ভ্রান্ত মেঘ সম্মুখের ডাকে ছুটে চলে। পেছনে ফেলে রেখে যায় রৌদ্রদগ্ধ আকাশ। গানের মেয়েরা গান থামিয়ে কপালে করাঘাত হানে।

বুড়ো বটগাছটার তলায় যেখানে দেশের কল্যাণে পূজো-আর্চা দেওয়া হয়, সেখানে বহু ঘটা করে ভেক-দেবতার পূজো দিল সবাই মিলে। ভেক-দেবতার অসীম ক্ষমতা। সাদা মেঘ, কালো মেঘ, ধূসর মেঘ, ঘন মেঘ, পাতলা মেঘ, কোদাল-ভাঙা মেঘ, যেমন মেঘই হোক না কেন, কাছেই থাক আর শত যোজন দূরেই থাক, ভেক-দেবতার মকমকানি শুনতে পেলে আসতেই হবে তাকে, না

এসে উপায় নেই। শুধু আসাই নয়, কাদা কাদা করে ভেজাতে হবে মাটিকে। মেঘ বশ করবার মন্ত্র ভেক-দেবতার কাছে আছে। কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলে তবেই তো! তই ভেক-দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্য ওরা কোন ক্রুটিই রাখল না, যা যা করণীয় সবই করল। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হ'ল না।

গান গেয়ে বৃষ্টি নামানো গেল না। ভেক-দেবতার পূজা করা হ'ল, তাতেও কোন কিছু হ'ল না। অবশেষে উঠল মেঘ-নামানি ব্রতের কথা। এ ব্রত মেয়েদের একেবারেই নিজস্ব জিনিস। কোন পুরুষ এর মধ্যে থাকতে পারে না। দেবতার অভিশাপ আছে এ ব্রত অনুষ্ঠানের সময় কোন পুরুষ যদি তার কাছাকাছি থাকে, তবে তার পুরুষত্ব হানি ঘটবে। সেইজন্যই এই সময় পুরুষেরা ভয় পেয়ে সেই এলাকা ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকে।

ষাট বছরের বুড়ী মাতঙ্গী—এই অঞ্চলে সেই হচ্ছে একমাত্র মেয়ে যে এই ব্রতের গূঢ় রহস্য জানে। বড় বিপজ্জনক এই অনুষ্ঠান। নিয়মের একটু ভুলচুক যদি ঘটে, তা হলে সর্বনাশ। সর্বনাশটা-যে কী তা কেউ পরিষ্কার করে বলতে পারে না। স্বয়ং মাতঙ্গীও না। কিন্তু "সর্বনাশ" এই কথাটাই যথেষ্ট। নেহাং অনুপায় হয়ে না পড়লে কেউ এ ব্যাপারে মত দিতে চায় না। তবে যে-ক'দিন মাতঙ্গী আছে সেই পর্যন্ত-ই। তারপর এই অঞ্চলে আর এমন কেউ নেই যে এই ব্রতকে ধরে রাখবে। এই ব্রত মাতঙ্গী পেয়েছিল তার মা'র কাছ থেকে। আর মাতঙ্গীর মা পেয়েছিল মাতঙ্গীর দিদিমার কাছ থেকে। এই ভাবে মাতৃসূত্রে চলে আসছে। কিন্তু মাতঙ্গীর মেয়ে নেই। কাজেই এই ব্রত সে আর কাউকে শিখিয়ে যেতে পারবে না। এমন মহামূল্য জিনিস, এইখানেই ঘটবে তার ইতি।

এবার এই নিয়ে সমাজে দুটো মত দেখা দিল। এক পক্ষ বলল, এ বড় মারাত্মক ব্যাপার, এতে হাত না দেওয়াই ভাল।

অপর পক্ষ বলল, কিন্তু এ না করে উপায়টা কি? মাঠ-যে ফেটে

একেবারে চৌচির হয়ে গেল। কবেই বা বৃষ্টি নামবে, কবেই বা ফসল ফলবে! মাতঙ্গী বুড়ী এই ব্রত আরও ছ'বার করিয়েছে, কিন্তু কোন বারই কোন অঘটন ঘটে নি।

কোন বার ঘটে নি বলে কোন দিন ঘটবে না এমন কি কথা আছে!

তা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু তা হলেও শেষপর্যন্ত উভয় পক্ষকে একমতে আসতে হ'ল। সময় যদি পেরিয়ে যায়, তখন বৃষ্টি হ'লেই কি আর না হ'লেই কি! মাটি মেয়েমানুষের মতই। যখন তখন বীজ বুনলে হয় না। তার একটা সময় অসময় আছে।

ব্রতের ছুটো অঙ্গ, প্রথমে অনুষ্ঠান, তারপর ব্রতের কথা শোনা।

একটি ঋতুমতী যুবতী মেয়েকে তিন দিন পর্যন্ত মাটির তলায় একটা অন্ধ কুঠরীতে বন্ধ করে রাখতে হয়। তার সঙ্গে তিন দিনের মত খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। সেই অন্ধকার কুঠরীতে সামান্য আলোটুকুও প্রবেশ করতে পারবে না। একটু আলোকরেখা সেখানে পৌঁছলে পর ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে। আব তার পরিণাম ভয়াবহ। তিন দিন ধরে মাতঙ্গী বুড়ী সেই কুঠরীর দরজার ধারে বসে বসে পাহারা দেয়। এই তিন দিন আর তিন রাত্রি এক ফোঁটা ঘুমও তার জন্য বরাদ্দ নেই। বড় কঠিন দায়িত্ব তার। মাটির তলায় বন্ধ থাকলেও এই মেয়ের রজঃকুসুমের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে। আর সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্ব, যক্ষ আর ঋভুরা সেই মেয়েকে নষ্ট করবার জন্য ছুটে আসে। ওরা আসে পালে পালে বন্য কুকুরের মত। তখন ওদের ঠেকিয়ে রাখা বড় কঠিন। এই শক্তি আছে একমাত্র মাতঙ্গী বুড়ীর। এই রহস্য আর কেউ জানে না।

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে মাতঙ্গী বুড়ী সেই কুঠরী ঘিরে মস্ত বড় এক গোলাকৃতি গণ্ডী টানে, আর গণ্ডীরেখার উপর কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুঠরীর মুখের কাছে বসে পাহারা দিতে থাকে। বেলা যখন অপরাহ্ন. ওরা তখন এল। কিন্তু ওরা নিশাচর।

দিনের আলো ওদের শক্তিকে দমিয়ে রাখে। তাই ওরা কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না। দূর থেকে লোভীর মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল। মাতঙ্গী বুড়ী অনুভব করল, বাতাসটা একটু ভারী ভারী ঠেকছে। সে জানে দিনের বেলা ওরা এই আগুনের গণ্ডী ভেদ করে আসতে সাহস করবে না। তবু সাবধান হয়ে তৈরী থাকাই ভাল। সে জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। সেই মন্ত্রের আঘাত সামলাতে না পেরে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে-সব মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে বসে মাতঙ্গী বুড়ীর ক্রিয়াকলাপ দেখছিল, তারা এর ভাল মন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু মাতঙ্গী বুঝল দূষিত বাতাস আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই মেয়েরা যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সেই নির্জন কুঠরীর মধ্যে রইল শুধু সেই মেয়ে। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় দুরু দুরু করে কাঁপছে ওর বুক। কে জানে কি হবে আজ। কুঠরীর দরজার মুখে স্থির হয়ে বসে আছে মাতঙ্গী বুড়ী। আজকের রাত্রি অন্য দিনের রাত্রির মত নয়। কেমন যেন থমথমে। খাঁ খাঁ করছে চার দিক। জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। সবাই যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মুহূর্ত গুণে চলেছে। সব কিছুই অবিচল, স্থির—শুধু মাতঙ্গীকে ঘিরে আগুনের জিহ্বাগুলি লকলক করে উঠেছে।

রাত যখন এক প্রহর কাটল, ওরা আবার দল বেঁধে ফিরে এল। এবার যেন একেবারে গণ্ডীরেখার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তা না হ'লে বাতাস এমন ভারী হয়ে উঠবে কেন? মাতঙ্গীর মনে হ'ল যেন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে কাঠগুলিকে নেড়েচেড়ে আগুনটাকে উসকে দিল আর জোরে জোরে মন্ত্র আউড়ে চলল। কিন্তু বাতাস যেমন ভারী ছিল তেমনি রইল। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া ভেসে এল। আগুনের বেড়া ভেদ করে সেই হাওয়া মাতঙ্গীর গায়ে এসে লাগল। মনে হ'ল তার রক্ত জমে বুঝি বরফ হয়ে যাবে। মাতঙ্গী চেয়ে দেখল বাইরে, কোন গাছে একটা

পাতাও নড়ছে না। আরও মনে হ'ল আগুনের তাপ যেন ক্রমেই নরম হয়ে আসছে। তার বুঝতে বাকী রইল না, এ সব ওদেরই কারসাজি। কিন্তু তাই বলে ভয় পেলে চলবে না। কেনই বা ভয় করবে সে? ওদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার হাড় পেকে গেছে। ওদের অন্ধি-সন্ধি কোন কিছুই তার জানতে বাকী নেই। মাতঙ্গী হাঃ হাঃ-হাঃ করে বিকট এক অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে একমুঠো সরষে নিয়ে গণ্ডীর বাইরে ছিটোতে ছিটোতে চলল। নৈশ নীরবতাকে বিদীর্ণ করে তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর উচু থেকে উচুতে উঠতে লাগল। এ কেমন মন্ত্র! শুধু অশ্লীল আর কুৎসিত গালিগালাজ।

মাটির তলার কুঠরীর মধ্য থেকেও মেয়েটা বুঝতে পারল বাইরে ভীষণ একটা কিছু ঘটে চলেছে। এবার আর্তনাদ করে উঠল সে। কিন্তু শুধু কুঠরীর মধ্যেই নয়, মাতঙ্গীর সেই ভীষণ অট্টহাসি আর উচ্চ মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি শুনতে কারুই বাকী ছিল না। ঘরে ঘরে বিভীষিকার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। কোন ঘরে পুরুষ নেই, তারা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েরা যে যার শয্যায় কাঠ হয়ে পড়ে রইল। একই রাত্রিতে বার বার তিন বার এই রকম হানাহানি চলল। সেই রাত্রিতে কারু চোখেই ঘুম ছিল না।

তার পরদিন সকালবেলা সবাই দল বেঁধে দেখতে এল। দেখতে এল মাতঙ্গী বুড়ী বেঁচে আছে না মরে গেছে। কিন্তু এসে দেখল, কিসের কি, যেমন ছিল তেমনি বসে আছে। উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। এই ভাবে পর পর তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। সবাই একবাক্যে বলল, মাতঙ্গী বুড়ীর সঙ্গে যুঝতে পারে, আজও এমন অপদেবতার সৃষ্টি হয় নি।

চার দিনের দিন সকাল বেলা সেই মেয়েকে কুঠরী থেকে বার করে নিয়ে আসা হ'ল। মেয়েটা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। কতক্ষণ পর্যন্ত কেমন স্তব্ধের মত বসে রইল, চোখে অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত

দৃষ্টি। মাতঙ্গী ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ও স্বাভাবিকতায় ফিরে এল। শেষে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসি হাসল। সেই সঙ্গে সবাই হেসে উঠল—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী সবাই। তিন দিনের ভয় ভীতি দুর্ভাবনার ভার এক মুহূর্তে কেটে গেল। আনন্দের হিল্লোলে চঞ্চল হয়ে উঠল মেয়েগুলি। এবার উৎসব শুরু হয়ে গেল।

আঙ্গিনার উপর একটা মাদুর পেতে দিল একজন। দু'জন সেই মেয়েকে ধরে মাদুরের উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

খোল লো খোল, মেঘের বউ পিথিবীর বসন খোল, বলতে বলতে মাতঙ্গী ওর কাপড়ের আঁচলটা মুঠো করে চেপে ধরল। মেয়েটা বুঝতে পারে নি ; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাতঙ্গীর মুখের দিকে তাকাল। এবার মাতঙ্গী ওর কাপড়টা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারতেই ওর গা থেকে খসে পড়ে গেল আঁচলটা। মেয়েটা দু'হাতে কাপড়টা কোমরের সঙ্গে সাপটে ধরেছে। ওর চোখে গভীর লজ্জা আর আতঙ্কের ছায়া। এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কেমন করে ওদের ঠেকাবে? মুহূর্তের মধ্যে দু দিক থেকে দুটো হাত এসে ওর কম্পিত হাতের মুঠো থেকে কাপড়টাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অনুপায় হয়ে ও দু'হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢাকল। এবার মেয়েরা সবাই কলকলিয়ে হেসে উঠল। এদিক থেকে ওদিকে হাসির ঢল বয়ে গেল। উৎসব জমে উঠল এবার।

ওরা ওকে মাদুরের উপর শুইয়ে দিয়েছে। মেয়েটার লজ্জার ঘোর তখনও কাটে নি, চোখ বুজে পড়ে আছে।

উঁহুঃ, ও, হবে না, মাতঙ্গী বলে উঠল, মেঘের বউ পিথিবী, মেঘের দিকে তাকা। মাতঙ্গী বুড়ীর আদেশ, না মেনে উপায় নেই। মেয়ে এবার চোখ মেলে তাকাল। আকাশে এক খণ্ড মেঘ নেই, সে শূন্য আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল।

মাতঙ্গী হাত নেড়ে নেড়ে মন্ত্র পড়ল—মেঘের বউ পিথিবী লো, মেঘকে টেনে আন।

মেয়েরা এবার দল বেঁধে গান ধরল,

ফুল বাগানে ফুল ফুটেছে আকুল করে প্রাণ
মেঘের বউ পিথিবী লো মেঘকে টেনে আন।
চোখ মেলে চা লজ্জাবতী চোখের টানে টান
মেঘের বউ পিথিবী লো মেঘকে টেনে আন।
রূপের ঝলক লাগিয়ে দিয়ে ভুলা মেঘের প্রাণ
মেঘের বউ পিথিবী লো মেঘকে টেনে আন।

এবার মাতঙ্গী সিঁদুর দিয়ে ওর সর্ব অঙ্গ লাল করে দিল। মেয়েরা গেয়ে উঠল,

সিন্দুর না লো সিন্দুর না লো লাল শোণিতের ফুল
নামো নামো মেঘের কুমার, হয় না যেন ভুল।
ফুলের শোভা ক'দিন থাকে ক্ষণেক আয়ু তার
নামো নামো মেঘের কুমার, সয় না দেরী আর।

মাতঙ্গী উপর থেকে সিঁদুর-গোলা জলের ধারা ঢালতে লাগল মেয়েটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সিঁদুর রক্তের ধারার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মেয়েরা ওর চার দিকে নেচে নেচে হাততালি দিয়ে গেয়ে চলেছে,

মেঘ নেমেছে পুটপুটিয়ে করতালি দে,
মেঘের বউ পিথিবী লো, বিছানা পেতে দে,
মেঘ নেমেছে ঝরঝরিয়ে করতালি দে,
মেঘের বউ পিথিবী লো মেঘকে বুকে নে।

এ মেয়ে বড় ভাগ্যবতী। ছেলেমেয়েতে ওর ঘর পিল পিল করবে। গরুর মত বছর বছর বিয়োবে, আর ওর কোলে পিঠে এক সঙ্গে দুটো তিনটে করে ঝুলতে থাকবে। এর চেয়ে ভাগ্যের কথা

আর কি আছে! কুমারী মেয়েরা আর যে-সব মেয়েদের এখনও ছেলেপিলে হয় নি, তারা ওর সঙ্গে গলাগলি কোলাকুলি করতে লাগল। ওর গায়ের সিঁদুরের ছাপ তাদের গায়ে আর কাপড়ে পড়েছে। এ কথা সবাই জানে, এই মন্ত্রপূত পবিত্র সিঁদুর মেয়েদের উর্বরতা বাড়ায়।

প্রকাণ্ড একটা মাটির জালার মধ্যে সিঁদুর গুলে রং করা হয়েছে। রক্তের মত টকটকে রং। ওরা নাচতে নাচতে সেই রং-গোলা জল নিয়ে ছিটাছিটি খেলতে লাগল। বুড়ী, যুবতী, কিশোরী কেউ বাকী রইল না। সবাই লালে লাল। মাটি ভিজে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। সেই সিঁদুর-মাখা কাদা ওরা একজন আর একজনকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। নাচের ছন্দ উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হয়ে হয়ে উঠল। ওরা গেয়ে চলেছে,

মেঘ নেমেছে মেঘ নেমেছে করতালি দে,
মেঘের বউ পিথিবী লো মেঘকে বুকে নে।

অবশেষে এক সময় নাচ গান থামল। মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। এর পব ভোজের উৎসব। মদ-মাংসের ছড়াছড়ি। ক্ষুধার্ত মেয়েগুলি গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

এই ভাবে উৎসব শেষ হ'ল। কিন্তু ব্রত এখনও সাঙ্গ হয় নি। মেয়েরা দল বেঁধে হাতে দূর্বা নিয়ে ব্রতের কথা শুনতে বসল। ব্রতের কথা না শুনলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না, ব্রতের ফলও ফলে না। মাতঙ্গী বুড়ী তার মা তাবকা বুড়ীব মুখে যেমন শুনেছে, অবিকল সেই ভাষায়, সেই সুরে আর সেই ভঙ্গিতে ব্রতের কথা বলে চলল :

সে কত যুগ আগেকার কথা, সে কথা কেউ বলতে পারে না। একবার কি হ'ল, সারা দেশে বৃষ্টি নামল না। ঠা ঠা রোদে পুড়তে লাগল মাটি। মাটি শক্ত হয়ে যেন পাথর হয়ে গেল। সেই পাথরে লাঙল ঠেকাতেই লাঙল খানখান। মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সেবার ক্ষেতে ফসল ফলল না। মানুষ হা অন্ন হা অন্ন করে মাথা কপাল ঠুকল আর দাপিয়ে দাপিয়ে মরতে লাগল।

তখন সব মানুষ দল বেঁধে বুড়ো বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আদি দেবী জাঙ্গালী বুড়ীর উদ্দেশ্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নায় জাঙ্গালী বুড়ীর আসন টলল। সে যুগ এ যুগের মত ছিল না। তখন দেবদেবীরা এসে মানুষের কাছে দেখা দিতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। জাঙ্গালী বুড়ী শূন্যের উপর ভর করে নীচে নেমে এলেন। উপর থেকে ডাক দিয়ে বললেন,

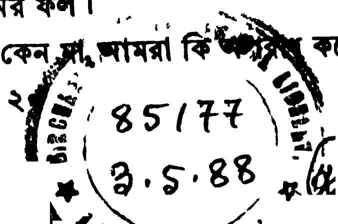
কে তোমরা? তোমরা আমার নাম করে কাঁদছ কেন?

মানুষেরা বলল, মা, আমরা তোমার সন্তান। তুমিই আমাদের ছিষ্টি করেছ। মা, আমরা-যে না খেয়ে মরছি, সেই জন্যই কাঁদছি।

কেন, তোমাদের অন্নের অভাব কি? আমি-যে তোমাদের জন্য মাটির তলায় অন্নের ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা মাটি খুঁড়ে তুলে খাও।

তারা বলল, আমরা এত কাল তো তাই করেছি। কিন্তু এবার বৃষ্টি নামল না, মাটি নরম হ'ল না, আমাদের লাঙল ভেঙে গেল। আমরা কেমন করে মাটি খুঁড়ব! জাঙ্গালী বুড়ী ভাবলেন, তাই তো, এমন তো হবার কথা নয়, এমন কেন হ'ল? তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, মেঘ! মেঘ! কিন্তু মেঘ কোন সাড়া দিল না। জাঙ্গালী বুড়ী তখন ধ্যানে বসলেন। সাত দিন সাত রাত চলে যায়, তবু তিনি আসন ছেড়ে ওঠেন না। তাঁর ধ্যান তাঁকে ঘিরে আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। দেখে মানুষেরা ভয় পেয়ে গেল। আট দিনের দিন তিনি চোখ খুললেন। বললেন, বুঝেছি, দুষ্ট অসুরেরা ওদের মায়ার বলে সমস্ত মেঘগুলিকে গরুর মত বেঁধে পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রেখেছে। তাই মেঘ আসে না, তাই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু এ সবই তোমাদের কৃতকর্মের ফল।

ওরা করুণ সুরে প্রশ্ন করল, কেন মা, আমরা কি অপরাধ করেছি?


45177
3.5.88

তোমরা নিয়ম ভঙ্গ করেছ। তোমাদের সৃষ্টির দিনে আমি যে-নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলাম, তোমরা তা রক্ষা করে চল নি। মায়াবী অসুরেরা তারই ছিদ্রপথ দিয়ে তাদের মায়ার জাল বিস্তার করে দিয়েছে। তা নইলে অসুরদের সাধ্য কি যে, তারা তোমাদের মেয়েদের বন্দী করে রাখে।

মা, বিস্তার করে বল, আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা তোমার কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করেছি?

জাঙ্গালী বুড়ী বললেন, পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা করে চলে। তাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি নেই। তাই তাদের অভাবও নেই। তারা আকাশের তারার মত বংশবৃদ্ধি করে চলে। তবু তোমাদের মত হা-অন্ন হা-অন্ন করে মরে না।

তবুও ওরা বুঝতে পারল না, নির্বোধের মত জাঙ্গালী বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনি তখন তাদের বোঝবার মত করে সহজ কথায় বললেন, পুরুষ আর নারী, মানুষের মধ্যে এটাই শুধু ভেদ। সৃষ্টির নিয়মে পুরুষে পুরুষে আর নারীতে নারীতে সঙ্গম হওয়া নিষিদ্ধ। আর সবই সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা তোমাদের এই আদি নিয়ম ত্যাগ করে মা, ছেলে, ভাই, বোন আর জ্ঞাতি গোত্রের মধ্যে সঙ্গম নিষিদ্ধ করে দিয়ে এই দুর্গতিকে ডেকে এনেছ।

ওরা এবার বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

তোমাদের সৃষ্টি করেছে কে—আমি না আর কেউ? জাঙ্গালী বুড়ী রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

ওরা এক বাক্যে উত্তর দিল, তুমি। তুমিই আমাদের ছিষ্টি করেছ।

কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা তোমরা জান?

না, আমরা সে কথা কেমন করে জানব।

তবে শোন, আমি আমার নিজপুত্রের সঙ্গে সঙ্গম করে তোমাদের জন্ম দিয়েছিলাম।

ওরা স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, তবু কেউ কোন কথা কইল না।

তাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে জাঙ্গালী বুড়ী রোষে জ্বলে উঠলেন। তাঁর দুই চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল।

সে রূপ দেখে ওরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। আর সবাই মিলে আকুল কণ্ঠে বিলাপ করে বলল, মা, আমাদের ক্ষমা কর। আমরা যে-নিয়মে জড়িয়ে পড়েছি তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারব না। সে আমাদের অসাধ্য। তুমি মা অসীম শক্তিময়ী, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। অন্য কোন পথ দিয়ে তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

ওরা যেটুকু কথা বলল, তার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদল। জাঙ্গালী বুড়ীর পায়ের তলায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল।

মায়ের মন, সন্তানদের কান্নায় গলে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে শেষে তিনি বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আমি বছরের মধ্যে একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিলাম। সেই দিন তোমরা সেই আদি নিয়ম পালন করে চলবে। সেদিন হবে মেয়েপুরুষের মিলনের উৎসবের দিন। সে দিন কোন বাছ-বিচার থাকবে না। সবাই সবার সঙ্গে মিলতে পারবে। সেই উৎসবের তিন দিন আগে থেকে তোমরা কঠিন ভাবে সংযম রক্ষা করে চলবে। এই তিন দিন কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না। তিন দিন এইভাবে কাটাবার পর সারা দিন আর সারা রাত ধরে উৎসব চলবে। সেদিন কেউ কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। সকল রকম ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সবাই সবার সঙ্গে মিলিত হবে। আর এর মধ্য দিয়ে যে-বিপুল শক্তির সৃষ্টি হবে, সেই শক্তিতে আমার অধিষ্ঠান, একথা নিশ্চিত ভাবে জানবে। সেই

প্রচণ্ড শক্তির ঘা খেয়ে অসুরদের মায়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর তার আকর্ষণে বন্ধনমুক্ত গরুর মত মেঘগুলি দ্রুতবেগে ছুটে আসবে আর প্রবল বর্ষণে তোমাদের দেশের মাটি ভিজিয়ে ননীর মত নরম করে দেবে।

এর পর ওরা আর কোন কথা বলতে সাহস করল না, নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘরে ফিরে এল।

অবশেষে সেই উৎসবের দিন এসে গেল। সবাই মন স্থির করে এসে উৎসবে যোগ দিল। কিন্তু তবু ওরা ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিতে পারল না। নিষিদ্ধ সম্পর্কের পুরুষ আর মেয়েরা পরস্পরকে সম্ভাষণ করল, ইসারায় আহ্বান জানাল, কিন্তু পরক্ষণেই তারা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে চলে এল। যে যার নিজের নিজের কথাই জানল, একে অপরের কথা জানতে পারল না। উৎসব তিথি এই ভাবেই অনুষ্ঠিত হ'ল।

দিনের পর দিন যায়, কই, মেঘ তো এল না। শূন্য আকাশ তেমনি খাঁ খাঁ করতে লাগল। কি করবে ওরা, আবার সেই বড়ো বটগাছটার তলায় গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়ল।

জাঙ্গালী বুড়ীর ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টির সামনে ওদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমরা একে অপরের চোখকে ফাঁকি দিতে পাব, কিন্তু আমাকে প্রবঞ্চনা করবে, এমন শক্তি কি তোমাদের আছে? আমি বালুভূমির প্রতিটি বালুকণিকাকে আলাদা আলাদা করে দেখতে পাই। তোমরা কেমন করে আমার দৃষ্টি এড়াবে? আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েও আবার তোমরা নিয়মভঙ্গ করেছ।

নিয়মভঙ্গকারী অপরাধীর দল নিঃশব্দে মাথা নত করে রইল। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে একজন একটু সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বলল, মা, আমরা আবারও নিয়মভঙ্গ করেছি, সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি আমাদের উপর অপ্রসন্না হয়ো না। আমরা ইচ্ছা করে

তোমার অবাধ্য হই নি। লজ্জা আমাদের বাধা দিয়েছে। তুমি আমাদের এই লজ্জার মূল কেটে দাও।

জাঙ্গালী বুড়ী অল্পেই রুষ্ট, অল্পেই তুষ্ট। সন্তানের কাকুতি মিনতিতে প্রসন্ন হয়ে বললেন, বেশ, তাই হোক। লজ্জা মানুষের চোখের মধ্যে বাস করে। সেই দিন থেকে জাঙ্গালী বুড়ীর আদেশে উৎসবের দিনে লজ্জা তাদের চোখ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তার পর সেই থেকেই চলে আসছিল এই উৎসব। ফলে আমাদের দুঃখকষ্ট রইল না। সময়মত মেঘ আসত, বর্ষণ হ'ত ফসল ফলত অফুরন্ত, লোকে খেয়ে আর ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারত না। পালের গরু বেড়ে চলল দিন দিন। গোয়াল ঘর ভরতি হয়ে উঠল। গৃহস্থদের মোটা তাজা বউগুলি গাইগরুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সন্তান বিয়োতে লাগল। ঘরে ঘরে চাঁদের হাট। সে কী সব দিনই না গেছে! কিন্তু পোড়া কপাল মানুষের, এত সুখ তাদের কপালে সইল না। এত ভোগ আর আনন্দের মধ্যে জাঙ্গালী বুড়ীর সেই নিয়ম অনেকের মনেই আর দাগ কাটে না। উৎসবের দিন সবাই উৎসবে মেতে ওঠে, কিন্তু সেই তিন রাত্রির সংযমের কথা মনে থাকে না। কিছু কিছু লোক ছিল যারা এই নিষেধ মেনে চলত। তারা ছাড়া আর সবাই সেই তেরাত্তিরের মধ্যেও যে যার বউকে নিয়ে শোয়। কি সাহসের সাহস! সর্বনাশ যখন ঘটে তখন এমনি করেই বেড়ে ওঠে।

কিন্তু এমনি করে ক'দিন যায়! জাঙ্গালী বুড়ীর কাছে কোন কিছু লুকা-ছাপা থাকে না। তিনি দেখেন, দেখেন, কিন্তু ভাল না মন্দ না, কোন কিছু বলেন না। শেষে পাপের ভরা যখন পূর্ণ হ'ল, তখন তাঁর সে কি মূর্তি! সেই ভীষণ মূর্তি দেখে বিশ্বভুবন টলমল করে উঠল। সেদিন সারা দেশ জুড়ে কত লোকের কত-যে কান্না, কিন্তু কোন কিছু তাঁর কানে গেল না। সাপের মত কুণ্ডলী-পাকানো তাঁর জটাগুলি, তাই থেকে একটা জটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে তিনি

অভিশাপ দিলেন, সেই তিন রাত্রির মধ্যে যে-সব বাড়িতে এই অনাচার ঘটেছে তারা সব শূদ্র হয়ে যাক। এরা ভিন্ন জাতির পায়ের তলায় বসে পদসেবা করবে, আর তাদের পায়ের লাথি খাবে। এই না বলে তিনি তাদের গায়ের রং আর জ্ঞানবুদ্ধি ছিনিয়ে নিলেন। এই থেকেই শূদ্র জাতির সৃষ্টি হ'ল।

সেই শূদ্রদের মধ্যে এক মেয়ে ছিল, তার নাম চম্পী। জাঙ্গালী বুড়ীর পরম ভক্ত সেই মেয়ে। তার মত এমন ভক্ত আর কোথাও নেই। সেই চম্পীর ঘরের সবাই জাঙ্গালী বুড়ীর অভিশাপে কালো শূদ্র হয়ে গেছে। চম্পী নিজেও তাই। জাঙ্গালী বুড়ী বসেছিলেন হঠাৎ চমকে উঠলেন। রাগের ঝোঁকে আর মনের ভুলে এ কি করে বসেছেন তিনি! তাঁর অভিশাপ-যে তাঁর বড় আদরের চম্পীর উপরেও গিয়ে পড়েছে।

একলা ঘরে শুয়ে ছিল চম্পী। জাঙ্গালী বুড়ী তার শিয়রের কাছে গিয়ে বসলেন। আহা, কি সুন্দর মেয়েটা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে তার! ওর দিকে তাকিয়ে জাঙ্গালী বুড়ীর চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠল। তিনি ডাকলেন, চম্পী, চম্পী!

চম্পী চিনল! সাড়া দিল, কি গো মা?

মনের ভুলে হয়ে গেছে চম্পী। তোকে আমি শূদ্র করতে চাই নি। তাই কি আমার উপর রাগ করেছিস্ তুই?

না গো মা, রাগ কিসের? তুমি যা করেছ, ভালই করেছ। ভাল যদি না-ই হবে তুমি তা করবে কেন? বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারী হয়ে এল।

ভয় করিস্ নে চম্পী, আমি তোকে তোর হারা-রূপ ফিরিয়ে দেব। যেমন ছিল তেমনি করে দেব।

তারপর?

তার পর কোন ভাল জাতের মানুষের ঘরে তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

না গো মা, না, অমন কাজ কোরো না। আমার বাপ মা ভাই বোন—আমার ঘরের মানুষ, আপন মানুষ যারা তারা যদি সবার পায়ে-ঠেলা শূদ্র হয়ে থাকে, তবে আমি কোন্ সুখে ভাল জাতের মানুষের ঘরে ঘর করতে যাব? তুমি আশীর্বাদ কর মা, আমি যেন এদের সেবা করেই মরতে পারি।

জাঙ্গালী বুড়ী কিছুতেই তার মত ফেরাতে পারলেন না। সে বড় কঠিন মেয়ে, তার মনকে কোন মতেই গলানো গেল না। এত যার শক্তি, সেই জাঙ্গালী বুড়ীকে হার মানতে হ'ল এইটুকুন মেয়ের কাছে।

চম্পী, আমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না। তবে তুই বর মাগ, যা তোর মন চায়।

বর দেবে মা—বর? মা, আমি দেখতে পাচ্ছি বহু দুঃখ আর লাঞ্ছনা সইতে হবে আমাদের। এ দুঃখের কোন সীমা নেই, শেষ নেই। আমাদের পাপে আমরা ভুগছি, আমরা ভুগব। কিন্তু আমাদের পরে আমাদের যে-নিষ্পাপ সন্তানেরা আসবে, তাদেরও তো আমাদের মত এমনি করেই ভুগে মরতে হবে। তাদের পরে যারা আসবে তাদেরও। এই ভাবেই বংশের পর বংশ ধরে ওরা এই অভিশাপ বহন করে চলবে। তুমি কিসের জন্য কি কর, তুমিই ভাল জান মা। আমি তার বিচার করতে চাই না। আমি কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না। কিন্তু আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি সামনের দিনের এই ছবি। বর দেবে মা? দাও বর। আমি বড় দুর্বল, বড় অক্ষম। আমাকে সেই শক্তি দাও, সেই মন্ত্র দাও, যাতে আমি আমাদের সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলির মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ করতে পারি।

এবার জাঙ্গালী বুড়ীর মাথা নত হয়ে এল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোকে আমি সেই বর দেব। এই বলে তিনি তার কানে কানে মন্ত্র দিয়ে দিলেন। আর বললেন, আজ থেকে তুই আমার মেয়ে

হয়ে বেঁচে থাক। যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকবে, ততদিন জাঙ্গালী বুড়ীর মেয়ে চম্পী বুড়ীর নাম পৃথিবীময় প্রচারিত থাকবে।

সেই দিন থেকে চম্পী বুড়ী মন্ত্রসিদ্ধা হয়ে গেল।

জাঙ্গালী বুড়ী আবার ডাকলেন, চম্পী!

কি গো মা?

এ আমি তোর কি করলাম? এ-যে আমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়লাম। লক্ষ্মী মা, আর একটা বর চা।

মা, বর দেবে? আমাদের এই শূদ্র জাত কত যুগের পর যুগ ধরে এই দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে চলবে, কে জানে! কিন্তু আমি আর কতদিন বাঁচব! তারপর? বর দেবে মা? দাও বর। আমি যেন মরার আগে আমার মেয়ের কাছে এই মন্ত্র দিয়ে যেতে পারি। সেও যেন তার মেয়েকে এই মন্ত্র দিতে পারে। এই ভাবে মেয়ের সূত্র ধরে এই মন্ত্র যেন চিরকাল থাকে। আমার রক্তবিন্দু তাদের মধ্য দিয়ে এই মন্ত্র বহন করতে থাকবে আর তাই দিয়ে তারা আমাদের এই সমাজের দুঃখী মানুষদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে চলবে, এই কথাটা মনে করে মরবার সময় আমি হাসিমুখে চোখ বুঁজব।

আচ্ছা, চম্পী, তাই হবে। দিলাম এই বর। এবার লক্ষ্মী মেয়ে সোনার মেয়ে, এবার তোর নিজের জন্য একটা বর চা।

আমার আর কিছুই চাইবার নেই মা।

কিছুই না? ওরে কিছুই না?

জাঙ্গালী বুড়ীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। দেব-দেবীরাও কি কাঁদে? হ্যাঁ, কাঁদে বই কি, সবাইকে কাঁদতে হয়। তবে মানুষেরা তাদের কান্না দেখতে পায় না।

বলতে বলতে মাতঙ্গী বুড়ীর গালের লোলচর্ম বেয়ে জল ঝরতে শুরু করে দিয়েছে। যারা গোল হয়ে বসে ব্রতকথা শুনছিল তাদের মধ্যেও কেউ কেউ কাঁদছে।

ব্রতকথা এইখানেই সমাপ্ত হ'ল।

তিন

দিন কয়েক বাদে সত্যসত্যই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি আর বাতাস আর বিদ্যুৎ আর গর্জন! মিলন রঙে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল পৃথিবী।

কে নিয়ে এল এই বৃষ্টিকে? সেই সুন্দরী যৌবনবতী মেয়ে, সেই নরম মেয়ে তুলতুল? তার কথা স্মরণ করেই কি লুব্ধ মেঘ দূরে গিয়েও স্থির হয়ে থাকতে পারল না, আবার তাকে ফিরে চলে আসতে হয়েছে? নাকি পূজায় তুষ্ট ভেক দেবতা তার মকমকানির মন্ত্রে মেঘকে ঘনবর্ষণের জন্য নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে? নাকি মাতঙ্গী বুড়ীর সেই গোপন রহস্যময় মেঘ-নামানির ব্রত? নানা জনে নানা কথা বলে। কিন্তু শূদ্র পল্লীর বেশীর ভাগ লোকই মাতঙ্গীর উপর ভরসা করে থাকে। তার তুকতাক আর বশীকরণের শক্তির কথা কার না জানা আছে।

যার জন্যই নামুক, বৃষ্টি নেমেছে এইটাই বড় কথা। কাল সারাদিন সারারাত অঝোরে ঝরেছে। আর আজ সকালে নীল নির্মেঘ আকাশ প্রসন্ন হাসি হাসছে। তার সেই হাসির আভায় সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। আশায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে মানুষ। পশু পাখি কীট পতঙ্গ তারাও তাদের চাঞ্চল্যকে চেপে রাখতে পারছে না। তরুলতা গুল্মতৃণ, তাদের পাণ্ডুরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে। জীর্ণতার নির্মোক বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসছে নতুন জীবন।

রোদের প্রথম ঝলক এসে নামল। যেন কাঁচা সোনা গলে গলে পড়ছে। সূর্য তার শুভাশিস্ পাঠিয়েছে। শূদ্র পল্লীর কর্ষকেরা

লাঙল আর বলদ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দলে দলে। বলদগুলির গলায় দুলছে লাল ফুলের মালা। মেয়েরা সিন্দুর-গোলায় হাত চুবিয়ে নিয়ে তাদের পাঁচ আঙুলের ছাপ মেরে দিয়েছে ওদের মাথায়, পিঠে, সর্বাঙ্গে। সিন্দুর মেখে শিংগুলিকেও লাল করে তুলেছে। লাঙলের শীষে মেখে দিয়েছে মন্ত্রপূত সিন্দুর। এই সিন্দুরের আমোঘ শক্তি। লাল, শুধু লাল, শুধু লালের যাদুখেলা। রক্তের মধ্য দিয়েই তো সৃষ্টি। সৃষ্টিধর্মী মেয়েদের কাছে সে কথা অজানা নয়।

প্রথমে আসছে কর্ষকদের বউরা, মেয়েরা। পুরুষেরা লাঙল আর বলদ নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে। কালো কালো স্বাস্থ্যবতী পরিপুষ্ট মেয়েগুলি, যার যা ভাল পোশাক আছে তাই পরে বেরিয়েছে। পুরুষেরা যে যার ক্ষেতে নেমে বলদের ঘাড়ে জোয়াল চাপাল, জোয়ালের সঙ্গে লাঙল জুতল, তারপর পিছিয়ে এল। এবার মেয়েরা এগিয়ে এসে লঙালগুলির মুঠো চেপে ধরল। একটু ইসারা করতেই বলদগুলি রোমন্থন করতে করতে ধীর গতিতে চলতে শুরু করল, আর চলার সাথে সাথে নরম মাটি বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। ক্ষেতটা এক পাক শেষ করতেই পুরুষেরা দৌড়ে এসে বলল, ছাড় ছাড়! মেয়েরা কিন্তু ছাড়ল না। কোন কথা না বলে আরও শক্ত করে লাঙলের মুঠো চেপে ধরল, আর মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। তখন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। পুরুষেরা মেয়েগুলিকে আড়কোলা করে বুকের উপরে তুলে ক্ষেতের সীমানার বাইরে রেখে এল, তারপর লাঙলের মুঠো চেপে ধরে বলদকে ইসারা করল। এ সব রহস্য বলদদের যেন ভাল করেই জানা আছে। তারা তখনকার মত রোমন্থন স্থগিত রেখে এবার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। ওদিকে মেয়েরা তখন হাত ধরাধরি করে নেচে গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। সেই গানের তালে কর্ষকদের সারা দেহেও নাচের তরঙ্গ দেখা দিল। মেয়েগুলি নাচছে আর গাইছে আর মাঝে মাঝে পুরুষদের লক্ষ করে দুটো একটা গানের কলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে।

মেয়েবা গাইল : আমার হাতের যন্তর কেড়ে নিলি—ও চো:
ও চোর!

পুরুষেরা গানের সুরে পালটা জবাব দিল :

সোনার চুড়ি পরিয়ে দেব সোনার হাতে তোর।

মেয়েরা গাইল : আমার যৌবনধন কেড়ে নিলি—ও চোর,ও চোর!

পুরুষেরা জবাব দিল : আমার যৌবন দান করিব, দুঃখ কিসের
তোর?

মেয়েরা গাইল : আমার মন যে কেড়ে নিলে, কেমন যাদু তোর!

পুরুষেরা জবাব দিল : আমার মন তো আগেই নিছিস, ও চোর
ও চোর!

এই ভাবে সেই ফসলের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ক্ষেতের বুকে নাচ, গান, খেলা আর কাজ সব কিছু মিলে রূপে রসে উচ্ছল এক অপরূপ জীবনকাব্য রচিত হয়ে চলল।

কর্ষণের উৎসব দেখবার জন্য উচ্চ বর্ণের কিছু কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সমাজে কাজের মধ্য দিয়ে এমন জীবন্ত আর রঙিন ছবি তারা কখনোই দেখে নি। দর্শকদের ভিড়ের মধ্য থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুজন ক্ষত্রিয় যুবক, সুদর্শন আর শ্রুতকীর্তি এই কৌতুকনাট্য দেখছিল আর বলাবলি করছিল।

সুদর্শন বলছিল, একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছ শ্রুতকীর্তি? মেয়েরা প্রথম লাঙল চালাল, তারপর একটা পাক দিতেই পুরুষেরা ওদের হাত থেকে লাঙলটা কেড়ে নিয়ে ওদের জোর করে ক্ষেতের সীমারেখার বাইরে রেখে এল। এ যেন একটা অভিনয়ের মত, কিন্তু এর ভিতরকার অর্থ কি আমি কেবল সেই কথাই ভেবে মরছি।

শ্রুতকীর্তি অবজ্ঞার সুরে হেসে উঠল, ওদের কাজকর্ম, তার আবার অর্থ, আর তাই নিয়ে ভেবে মরছ তুমি! এদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পশুযোনিতে জন্ম নিতে হয়।

তুমি মানুষ, তুমি কেমন করে বুঝবে? আর এই অসাধ্য সাধনের প্রয়াস কেনই বা তোমার?

পশু! ছিঃ, বলছ কি তুমি? তুমি এদের মানুষ আখ্যাই দিতে চাও না? কেন, এরা কি একই বিধাতার সৃষ্ট নয়?

সে তো বটেই, কিন্তু যে-বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, পশুও তাঁরই হাতের সৃষ্টি। সেজন্য কোন স্বতন্ত্র বিধাতার প্রয়োজন হয় না। মানুষের আকৃতি হলেই তাকে মানুষ বলা চলে না। বিচারবুদ্ধিহীন বর্বর মানুষ আর পশুর মধ্যে প্রভেদটা কোথায়?

বর্বর? হ্যাঁ, কিছুটা বর্বর তো বটেই। সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলে পশু? ছি ছি, শ্রুতকীর্তি এ তুমি কি বলছ? এমন শিশুর মত সরলচিত্ত আর সৎস্বভাব মানুষগুলি, তাদের সম্পর্কে এমন করে কথা বল তুমি? আমার কিন্তু এদের বড় ভাল লাগে।

সেটা কিছু বিচিত্র কথা নয়। ভাল লাগা না লাগা, সে হচ্ছে আলাদা কথা। এই দেখ না তোমার বন্ধু সাত্যকি, এই লোকটাকে মোটেই দেখতে পারি না আমি। কিন্তু তাই বলে সে যে মানুষ নয়, এমন কথা আমি কখনোই বলব না। আর আমার পোষা কুকুরটাকে দেখেছ তুমি? যেমন সরল, তেমনি সৎস্বভাব। ওর ভিতর এতটুকু কাপট্য বা কুটিলতা নেই, আর এমন নির্দোষ আর বিশ্বাসী প্রাণী তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। আমার ওকে ভালও লাগে খুব। কিন্তু তাই বলে আমি কি ওকে মানুষ বলতে পারব, না তুমিই পারবে? সুদর্শন, অদ্ভুত তোমার যুক্তি! আমরা যেটুকু বিদ্যা না শিখলে নয়, ততটুকুই শিখি, কিন্তু তুমি এত গুরুর কাছ থেকে এত বিদ্যা আদায় করে নিলে, সে কি এই-রকম যুক্তি প্রয়োগ করবার জন্যই?

সুদর্শন একটু থমকে গেল। এর উত্তরে কী-যে বলা যায় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। অথচ তার মন এই কথায় কোনমতেই সায় দেয় না। শ্রুতকীর্তি চিরদিনই এই ধরনের মানুষ। কোন কথা বলতে বা কোন কাজ করতে কোন দিনই তার কোন রকম দ্বিধা বা

ইতস্তত নেই। আর যে-কথা বলে, গায়ের জোরে সে কথাটা বলেই চলে, তখন যুক্তি দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা বড় কঠিন। শেষ-পর্যন্ত সে নিজের গোঁ ধরেই চলবে। কিন্তু তা হলেও এ-রকম একটা কথা সে চুপ করে মেনে নিতে রাজী হ'ল না।

একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, আচ্ছা, শ্রুতকীর্তি, এই সমস্ত ক্ষেতে ফসল ফলায় কারা?

শ্রুতকীর্তি উত্তর দিল—শূদ্রেরা।

আমাদের জন্য বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসে কারা?

শূদ্রেরা।

আমাদের জন্য নদী, বাপী আর কূপ থেকে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল বহন করে নিয়ে আসে কারা?

শূদ্রেরা।

আমাদের জন্য বস্ত্র বয়ন করে কারা?

শূদ্রেরা।

তুমি আমি এ সব কাজ করতে পারি? সে শক্তি আমাদের আছে?

না।

তবে?

তবে কি?

তবু আমরাই শুধু মানুষ, আর এরা সব অমানুষ?

হাসালে তুমি সুদর্শন। এরই জন্য এত প্রশ্নের তীর বর্ষণ? এ-যে বহ্বারম্ভের পর অশ্বের ডিম্ব প্রসব। আমরা মানুষ বলেই এসব কাজ করতে পারি না বা করি না, আর এরা অমানুষ বলেই এদের এ সমস্ত কাজ করতে হয়।

কি রকম?

কি রকম? শোন, বলি তবে! আমরা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য গো, অশ্ব, হস্তী, গর্দভ, মেষ, প্রভৃতি বন্য পশুকে

গৃহপালিত পশুতে পরিণত করেছি। এদের ছাড়া আমাদের চলে না, কিন্তু আমাদের ছাড়া এদের দিন স্বচ্ছন্দে চলত। আমরা শক্তি ও বুদ্ধির জোরে এদের করায়ত্ত করে আমাদের স্বার্থ সাধন করে নিচ্ছি। এদের মধ্যে কেউ আমাদের দুধ যোগায়, কেউ মাংস যোগায়, কেউ শীতবস্ত্র যোগায়, কেউ বা আমাদের চাষের কাজে বা ভার বহনের কাজে লাগে। আমাদের মেয়েরা দুগ্ধবতী গাভীর মত অপর্যাপ্ত পরিমাণে এমন সুস্বাদু দুধ যোগাতে পারে না মেদযুক্ত বৃষের মত এমন রুচিকর মাংস কোন মানুষ থেকে আমরা পাই না, আমরা বলদের মত লাঙল টানতে পারি না. গর্দভের মত ভারবহনও করতে পারি না। তবুও দেখ আমরাই মানুষ. আর এই পরিশ্রমী ও প্রয়োজনীয় জীবগুলি অমানুষ। একথা তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না। অবিকল এই যুক্তিতেই এই পরিশ্রমী ও পরম প্রয়োজনীয় শূদ্রেরা অমানুষ, আর আমরা মানুষ। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছ।

সুদর্শন এ কথাতেও হার মানল না। সে প্রশ্ন করল, তাই যদি হবে, তবে এই সমস্ত অমানুষদের আর্যসমাজে স্থান দেওয়া হয়েছে কেন ?

নিতান্ত বালকের মত কথা বলছ সুদর্শন। প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমরা বন্য পশুদের গৃহে স্থান দিয়েছি। সেই একই কারণে এই বন্য বর্বরদের জন্য আমাদের সমাজের প্রান্তদেশে কি একটু স্থান করে দিতে পারি না ? এইটুকু স্থান দিতে পেরেছি বলেই ওরা এমনি ভাবে আমাদের বশংবদ হয়ে আছে, আর চিরদিন এমনি ভাবেই থাকবে। পশু পোষ মানলেও আমরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি, যাতে হঠাৎ পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু এদের সম্পর্কে সে ভয়টুকুও নেই।

এর উপযুক্ত উত্তর খুঁজে না পেয়ে সুদর্শন বলল, বড় কঠিন আর নির্মম তোমার এই উক্তি। কিন্তু আমাকে একটা কথা বল শ্রুতকীর্তি, আমাদের সমাজের সবাই কি এই দৃষ্টি নিয়েই এদের দেখে থাকে ?

শ্রুতকীর্তি হেসে বলল, সকলের মনের কথা আর কেমন করে বলব? তবে এক জনের মনের কথা কিছু কিছু বুঝি, যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার কথা আর তোমার কাছে বলে কি হবে? তবে এ কথাটাও ঠিক, এক রকমের মানুষ আছে যারা সহজ জিনিসটাকে আমার মত সহজ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারে না। তারা সরল ও স্বচ্ছ বস্তুকে অকারণে জটিল করে তোলে। বুদ্ধির ভুলেই হোক বা অতিরিক্ত বুদ্ধির জন্যই হোক, তারা অনর্থক সাধ করে কতকগুলি দুঃখ ডেকে আনে। সুদর্শন, আমি লক্ষ করে আসছি, তোমার মধ্যে তার কিছু কিছু লক্ষণ আছে।

সুদর্শন চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বলল, বোধ হয় ঠিকই বলেছ। কেন জানি না, আমার মনে মনে একটা ধারণা দিন দিনই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

আরে না না, পাগল নাকি, অমন একটা অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী আমি কিন্তু করছি না। আসল কথা কি জান, যাদের সম্পর্কে তুমি এত দরদ নিয়ে বলছ, তারা সত্যসত্যই এই দরদের যোগ্য নয়। বিধাতা এদের যে-ধাতু দিয়ে তৈরী করেছেন, তার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। এদের তো তুমি চেন না, তাই এদের সম্পর্কে এমন করে ভাবছ। আমি এদের হাড়ে হাড়ে চিনি। এরা কি রকম বর্বর তা শোন। পশুর মতই অজ্ঞান এরা। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত জানে যে, বৃষ্টি না হলে ইন্দ্রদেবের যজ্ঞ করতে হয়। সমস্ত মেঘের উপর তাঁরই তো একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। সেখানে তাঁর ভাগীদার আর কেউ নেই। সেই শক্তি হাতে থাকার ফলে তিনি মানুষের কাছ থেকে দগ্ধমাংস আর হবির কর সংগ্রহের জন্য মেঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই জল সরবরাহের জন্য পার্থিব রাজার প্রাপ্য উদক ভাগের মত এই দগ্ধমাংস ও হবি ইন্দ্রদেবের ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু রাজাদের মত ইন্দ্রদেব কর-সংগ্রাহক পাঠিয়ে ঘন ঘন তাগিদ পাঠান না। আর এই চাপ না থাকার ফলে অবহেলা করে মানুষ তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে

তাঁকে বঞ্চিত করে চলে। এটা মানুষের স্বভাব। ইন্দ্রদেব প্রথমে কিছু বলেন না, কিন্তু বাকী করের বোঝা যখন অন্যায় রকমে বেড়ে ওঠে তখন ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে একদম বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। বলেন, ভাল কথার মানুষ নও তো তোমরা। এইবার বোঝ মজাটা। তখন চারদিকে হৈ চৈ আর কান্নাকাটি পড়ে যায়। তখন শুরু হয় যাগযজ্ঞ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে। গণ্ডায় গণ্ডায় বৃষ, মেষ আর ছাগ বলি পড়ে, আর মণে মণে ঘি পোড়ে। এ ভাবে ইন্দ্রদেবকে প্রসন্ন করতে না পারলে বাঁচবাব আর কোন পথ থাকে না। মানুষ জাতটা যেমন বেইমান তেমনি নির্বোধ। এই অবহেলার ফলে ইন্দ্রদেবের রোষে কত কত জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু আজকের কথা নয় তো, চিরকালই এই ভাবে চলে আসছে। কিন্তু কেমন বোকার বোকা দেখ, চাষ করবি তোরা, বৃষ্টির দরকার তোদেরই, কিন্তু কেন-যে অনাবৃষ্টি হয়, আর কেমন করেই বা তার প্রতিকার করতে হয়, সে কথাটুকু পর্যন্ত জানবি না তোরা! ইন্দ্রদেবের কোনই ধার ধারে না এরা, বিশ্বাস করবে এ কথা শুনলে?

বল কি! তাহলে অনাবৃষ্টি হলে কি করে এরা?

কি করে? সে এক হাসিব কথা। ওদের মেয়েগুলি তখন আঁচল উড়িয়ে নাচ গান করতে থাকে।

কেন, নাচ গান করে কেন?

নেচে নেচে মেঘকে ডাকে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসবার জন্য। আরে বাবা, আসা না আসা কি আর মেঘের হাতে? ওদের গলায় বাঁধা বশি যে স্বয়ং ইন্দ্রদেবের জিম্মায়। কিন্তু সে কথা ওদের বোঝায় কে! এতেও যদি বৃষ্টি না হয়, তবে কি করে জান? একটা যুবতী মেয়েকে ন্যাংটা করে চিৎ করে শোয়ায়, তার পর উপর থেকে ওর উপর জল ঢালে আর যত রাজ্যের মেয়ে সব একত্র হয়ে রং মেখে পেত্নী সেজে নাচানাচি মাতামাতি করতে থাকে। এতেই নাকি বৃষ্টি হবে।

কী-যে সব আজে-বাজে বকছ। এমন কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে।

বরুণ দেবের দিব্যি, এর একটি কথাও মিছে নয়। আমি খুব ভাল সূত্রে এ খবর পেয়েছি। এবার বুঝলে তো এদের সম্পর্কে আমি যে-কথা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা। আচ্ছা, এক কথা, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কোন্ দিকে মুখ করে বসে মল-মূত্র ত্যাগ কর?

কেন, পূর্ব দিকে।

আর ওরা বসবে সোজা পশ্চিম দিকে মুখ করে।

সর্বনাশ, সূর্য দেবের দিকে—

তবে আর বলছি কি, এই হচ্ছে এদের আচার। তবুও মানুষ বলবে এদের? আচ্ছা, প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করবার পর তোমার প্রথম কাজ কি হবে?

কেন, গৃহদেবতা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করব। তারপর অগ্নিকে বন্দনা করে বলব, হে দেব, দেব অগ্নি, তুমি আমাদের গৃহে চির প্রতিষ্ঠিত থাক। তুমি আমাদের মাতাপিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, কলত্র সন্তানসন্ততি, আমাদের গোশালার গাভীগুলি আর আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলি রক্ষা কর। যে-সব ভূত-প্রেত, পিশাচ, দৈত্য-দানব, ঋভু, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা নিয়ত আমাদের অনিষ্ট সাধনে তৎপর, তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত কর। তোমার প্রসাদে আমাদের মিত্রদের শ্রীবৃদ্ধি আর শত্রুদের নিপাত হোক।

আর এরা? এদের ঘরের কথা জান? এদের ঘরে অগ্নি বিরাজ করেন না। এরা যখন প্রয়োজন হয় গৃহদেবতা আগুন জ্বালায়, আবার প্রয়োজন মিটে গেলে নিবিয়ে ফেলে।

বলছ কি তুমি? তাহলে এরা বেঁচে আছে কেমন করে? গৃহদেবতা নেই, অথচ গৃহ আর গৃহস্থ রয়েছে?

কেমন করে বেঁচে আছে, একমাত্র এরাই তা বলতে পারে। আমাদের মত মানুষ যদি হ'ত, তাহলে কি এভাবে বেঁচে থাকতে পারত? শোন তবে আর এক কথা।

না না, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। কিন্তু শ্রুতকীর্তি একটা কথা তুমি আমায় বল, এদের কেউ শিক্ষা দেয় না কেন? এদের প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান দিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই?

শ্রুতকীর্তি আশ্চর্য হয়ে বলল, কি বলছ তুমি! এদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে এরা যা আছে, তাই থাকাই তো ভালো। এদের চোখ যদি ফুটে যায়, তখন কি আর আমাদের এমন করে মান্য করে চলবে?

সুদর্শন এবার অধৈর্যের সুরে বলে উঠল, না, শ্রুতকীর্তি না, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। যদি কেউ না থাকে, আমি আছি, আমি এদের সত্যপথের সন্ধান দেব।

তোমার কি মতিভ্রম হয়েছে সুদর্শন? তুমি এমন শাস্ত্রবিরোধী কথা কেমন করে বলছ?

কেন, এ কথা বলছ কেন?

আগে বল, তুমি শাস্ত্রবাক্য মান তো?

শ্রুতকীর্তি, তোমার ধৃষ্টতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি শাস্ত্র বাক্য মানি না! শ্রুতকীর্তির মুখে উত্তেজনার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। সে ধীর স্থির কণ্ঠে বলল, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রুতি আর স্মৃতি উভয়ে পারদর্শী। কিন্তু তবু তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, শাস্ত্রমতে শূদ্র দাস মাত্র, তার একমাত্র ধর্ম ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকদের সেবা করা। শূদ্রের পক্ষে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যে-শূদ্র অধ্যয়ন করে অথবা যে শূদ্রকে অধ্যাপনা করে উভয়কেই অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে। সুদর্শন, আমি জানি, তুমি সত্যনিষ্ঠ। তুমি নিজেই বিচার করে বল, আমি কি অসত্য কথা বলেছি?

সুদর্শন স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার তার মনে পড়েছে! শ্রুতকীর্তি সত্য কথাই বলেছে। শাস্ত্রের এই কথাগুলি কত বারই তো সে পড়েছে, কিন্তু কোনদিনই তো ভাল করে তলিয়ে দেখে নি। কেন,

এমন বিধি কেন, এ প্রশ্ন একবারও তার মনে জাগে নি। সুদর্শন নিঃশব্দ হয়ে ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল। তার কপালে চিন্তার কুটিল রেখা ভেসে উঠেছে। শ্রুতকীর্তির মুখেও কোন কথা নেই। সে সুদর্শনের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল।

ওদিকে কর্ষকেরা কাজে বিরতি দিয়ে বিশ্রাম করতে বসল। তাদের বউরা আসবার সময় সঙ্গে করে খাবার নিয়ে এসেছিল। এখন তাই ওরা খাবে। পাশাপাশি ক্ষেতের সমস্ত কর্ষকেরা এক জায়গায় এসে গোল হয়ে বসল। মেয়েরা সবাইকে খাবার বেঁটে দিয়ে নিজের নিজের ভাগ নিয়ে বসে গেল। খেতে খেতে চলল গল্প-গুজব আর হাসি-ঠাট্টা। মেয়েগুলি বিষম চঞ্চল, মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকতে পারে না। ওদের অনর্গল কলকলানি আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের মত হাসির ঝংকারে পুরুষদের গলা চাপা পড়ে যায়।

মেয়ে আর পুরুষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসেছে। যে যেখানে পেরেছে বসে গেছে। ওদের সাদা মন, এতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু শ্রুতকীর্তির দৃষ্টি এড়াল না। সে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল—দেখছ ?

কি ?

কেমন মেয়েমরদে একসাথে মিলে গেছে। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী ঠিক আছে কিছু ? ওদের পক্ষ হয়ে একটু সমর্থনের ভঙ্গিতে সুদর্শন বলল, ওদের মধ্যে এই রীতিই তো চলে আসছে।

আহা, আমিও তো সেই কথাই বলছি। কিন্তু আগুনের পাশে ঘি কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারে! ওদের কি ধর্মাধর্ম জ্ঞান কিছু আছে? পশু-পাখির মতই ওদের কোন বাছ-বিচার নেই। যে যাকে পায়, তার সঙ্গেই ভিড়ে যায়। কি বল ?

সুদর্শন অনিচ্ছার সঙ্গে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, হুঁ।

শ্রুতকীর্তি এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুশী হ'ল না। সে বলল,

আমাদের শাস্ত্র তৈরী করেছেন স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা। আর পশুরা ও শূদ্ররা নিজেরাই নিজেদের শাস্ত্র তৈরী করে। এদের তুমি কি শাস্ত্র শেখাবে?

সুদর্শন এ কথায় কোন সাড়া দিল না।

ওদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। কি না খাওয়া! তবে খাওয়ার চেয়ে গল্পই চলেছে বেশী! তাতেই এতটা দেরী হয়ে গেছে। আবার সবাই উঠে কাজে লাগবে লাগবে করছে, এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল, ওই-রে মহৎ আসছে। সবাই চোখ তুলে দেখল, তাই বটে, মহৎই আসছে।

একটা মেয়ে বলল, কাণ্ডখানা দেখছ বুড়োর? আজ উৎসবের দিনে মুখখানা এমন করেছে যেন সর্বস্ব হারিয়ে ফতুর হয়ে গেছে।

আর একজন ফোড়ন কাটল, বুড়ো বোধ হয় বুড়ীর কাছে আচ্ছা দাবড়ানি খেয়ে এসেছে। যাই বল, বুড়ীর কিন্তু এটা নেহাৎ অন্যায়। দশ গাঁয়ের লোক মহৎকে মেনে চলে, কিন্তু বুড়ীর একটু মান্যি-গণ্যি নেই। একটা কথা বললে উলটে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। ওপাশ থেকে আর একজন ঝংকার দিয়ে উঠল, ওঃ, বুড়োর জন্য ভারী দরদ দেখছি। বুড়ীর সঙ্গে বদল করবি নাকি লো? না হয় কয়েকটা দিন একটু মুখ বদলে নে।

যতগুলি মেয়ে কাছে ছিল, সবাই একসঙ্গে কলহাস্যের ঝংকার তুলল। এর মধ্যে মহৎ এসে পড়েছে। সে ডেকে বলল, এই রঙ্গীর ঝি রঙ্গীরা! তোদের হাসি একটু থামা তো, কাজের কথা আছে।

এমন দিনে কি এমন কাজের কথা থাকতে পারে। মহৎ-এর মুখের ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে, কথাটা সুবিধার নয়, গুরুতর রকমেরই কিছু একটা হবে। ওরা মহৎকে বসবার জায়গা করে দিয়ে সবাই তার চার দিকে ঘিরে বসল।

স্থানিক আমাকে ডাকিয়েছিল, মহৎ কথাটা তুলল।

লম্বোদর কাউকে কথা শেষ করবার মত সময় দিতে চায় না। কথাটা কানে আসতে না আসতেই তার জিভটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, বাঃ, স্থানিক নিজেই ডাকিয়েছে! বেশ তো, ভালই তো, তা যাচ্ছ যখন, বেশ ভাল করে গুছিয়ে বোলো আমাদের কথাটা। গতবার ফসল ভাল হয় নি। রাজার পাওনা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ বলি হিসেবে রাজার লোকেরা এসে মেপে জুকে নিয়ে গেল। যা বাকী রইল, তাতে কি আর বছর যায়? সারা বছর আধপেটা খেয়ে আছি। স্থানিক মশাইকে বুঝিয়ে বোলো, এ বছরটা আমাদের বলি যেন কিছুটা কম-সম করে নেয়। আট ভাগের এক ভাগ যদি নাও হয়, অন্ততঃ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশী না।

এক বুড়ো তার কথা সমর্থন করে বলল, ঠিক ঠিক, তুমি কিন্তু ওই আট ভাগের এক ভাগকেই শক্ত করে ধরে রাখবে। এর উপরে কিছুতেই উঠতে চাইবে না। তারপর নেহাৎ নাই যদি হয় তখন ওই সাত ভাগের এক ভাগেই রাজী হয়ে যেও।

সুদাস বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ক'মাস বাদে আমার সংসারে একটা খাওয়ার মুখ বাড়বে। এমনিতেই আমাদের খাওয়া জোটে না।

আঃ, কেমন ছিরির কথা! ওইটুকুন মানুষ, ও আবার কত খাবে। ইদা রাগ করে উঠল।

কিন্তু সুদাস বা ইদার কথা একমাত্র ওরা দু'জন ছাড়া আর কারু কানে গেল না। কেননা সবাই তখন যার যার সংসারের অভাব আর টানাটানির সমস্যা নিয়ে এক সঙ্গে কথা বলে চলেছে।

মহৎ হতাশ ভাবে কপালে করাঘাত করে বলল, তোমরা সবাই কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? আমাকে কথাটাই শেষ করতে দাও না আগে। আমি তো সেখান থেকেই এখন এলাম।

আরে, সে কথাটা বলতে হয় আগে। বলেছিলে তো আমাদের কথাটা? কি বলে, সাত না আট?

আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমরা কি আমাকে কোন কথা বলতে দেবে, না তোমরা নিজেরাই যা বলার বলে চলবে।

বাঃ, আমরা তো তোমার কথাই শুনতে চাই। এই, তোমরা থাম থাম, অমন গোল করছ কেন? মহৎ যা বলে শোন।

ওরা থামলে পর মহৎ বলল, তোমরা তো আছ তোমাদের সাত-ভাগ আর আট ভাগ নিয়ে। ওদিকে কী-যে সব হচ্ছে, খবর তো রাখো না। আমি তো গেলাম; গিয়ে দেখি স্থানিক তার দলবল নিয়ে বসে আছে। আমি মনে করেছিলাম একা আমাকেই ডেকেছে বুঝি। তা নয়, অন্যান্য অঞ্চলের মহৎরাও সব এসেছে। তখনই বুঝলাম, লক্ষণটা বড় সুবিধের নয়। আগে ভেবেছিলাম আমাদের এখানকার কোন কিছু ব্যাপার হবে। তা তো নয়, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর। তা নইলে দেশ শুদ্ধ লোকের ডাক পড়বে কেন? হয় বলি, নয় হিরণ্য, নয় কর, এই সব নিয়েই কিছু বলবে। ওর তো ওদের পাওনাটা কোন দিন কমায় না শুধু বাড়িয়ে বাড়িয়েই চলে। আমার এতখানি বয়স হ'ল, দেখতে তো আর কম দেখলাম না।

কি বলল স্থানিক, সেই কথাটাই বল না, চেঁচিয়ে উঠল লম্বোদর।

আঃ, থাম্ না বাপু, সেই কথাই তো বলছি। স্থানিক বলল, রাজার আদেশ, তোমরা সবাই শোন, বলির নিয়ম এবার বদল করে দেওয়া হয়েছে। এ বছর যা ফসল হবে তার ছ'ভাগের একভাগ নয়, চার ভাগের এক ভাগ রাজভাণ্ডারে জমা দিতে হবে।

সর্বনাশ! এ কি বলছ গো! মহৎকে ঘিরে যারা বসেছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সবাই।

মহৎ বলে চলল, আমরা বললাম, সে কি কর্তা, এ কেমন কথা? যেদিন থেকে জমি আছে আর মানুষ আছে, রাজা আছে আর প্রজা আছে, সেই দিন থেকে বলির নিয়ম ছ'ভাগের এক ভাগ। তখন

সুদিন ছিল, রাজাকে ছ'ভাগের একভাগ দিয়েও প্রজা সুখে শান্তিতে ছিল। কিন্তু এখন কি আর সেই দিন আছে? জমি বুড়ো গাইয়ের মত এখন আর বেশী দুধ দিতে চায় না। এখন যা অবস্থা ছ'ভাগের একভাগ দেবার সামর্থ্যও কারু নেই। আর এখন চার ভাগের এক ভাগের ব্যবস্থা যদি হয়, তবে আর একটা মানুষও বাঁচবে না।

এর উপর স্থানিক কি বলল?

বলল, তোরা এমন অবুঝের মত কথা বলিস্ না। কেবল নিজের সুবিধের দিকে তাকালেই হয় না। রাজার ভালমন্দের দিকেও তাকাতে হয়। আর রাজা না থাকলে প্রজার মূল্য কি? সে থেকেও নেই। কিন্তু রাজা তো আর তোদের মত নয়। তার চিন্তা শুধু তোদের জন্য। আচ্ছা, কাল যে ধুম বৃষ্টিটা হয়ে গেল, এ যদি না হ'ত, তবে, কেমন হ'ত বল দেখি?

মাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে যেত, ফসলের একটা দানাও ফলত না!

আর তোদের গতি কি হ'ত? একটা মানুষও বাঁচত?

না বাঁচত না।

তবে? রাজা বললেন, না, আমার রাজ্যের একটি প্রজাকেও আমি মরতে দেব না। এই বলে তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে এনে বললেন, তোমরা ইন্দ্রদেবের যজ্ঞ কর। তিনিই তো মেঘদের অধিপতি। তখন তিন দিন তিন রাত্রি ধরে যজ্ঞ চলল। কত পশু বলি হ'ল আর কত ঘি-ই না পুড়ল! তবে তো ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হলেন. তবে তো বৃষ্টি নামল। আর তার ফলে রক্ষে পেলি তোরা, আর রক্ষে পেল সারা দেশ। কিন্তু এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করতে রাজার রাজভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন সেই ভাণ্ডার তোদেরই আবার পূর্ণ করে তুলতে হবে। রাজার শান্তিতে প্রজার শান্তি। সেইজন্যই তো রাজা আদেশ দিয়েছে, ছয় ভাগের এক ভাগের জায়গায় চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।

এই কথার উপর কেউ আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না, সবাই এক সঙ্গে শোরগোল করে উঠল।

তারা বলল, বৃষ্টি নামাল তো মাতঙ্গী বুড়ী, এ আমাদের স্বচক্ষে দেখা। ইন্দ্রদেবের যজ্ঞ করতে কে বলেছিল ওদের?

মহৎ বলে চলল, আমরাও সেই কথাই বললাম। কিন্তু আমাদের কথা শোনে কে। ওরা কেউ হাসল, কেউ বা বিদ্রূপ করল। স্থানিক বলল, তোরা নিতান্ত বর্বর, কি থেকে কি হয়, কিছুই জানিস্ না। ইন্দ্রদেবের আদেশ না হ'লে মেঘকে টেনে আনবে, এমন সাধ্য আছে কারু? ও সব বুড়ী-ফুড়ীর কর্ম নয়। দেবতাকে তাঁর ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় গুণে দিতেই হয়। তা না হ'লে দেবতাই বা দেবেন কেন? এমনিতে কে কাকে কি দেয়? তোরা যখন গরু, মেষ বা ছাগ কিনতে যাস, তখন তোরা কি নিয়ে যাস হাতে করে?

আমরা উত্তর দিলাম, আমরা গম বা যব বা ধান্য হাতে করে নিয়ে যাই।

ঠিক কাজই করিস্। কিন্তু তোরা যদি কিছুই সঙ্গে না নিয়ে সেখানে গিয়ে শুধু নাচানাচি করিস্ বা তোদের বুড়ী বুনো শেয়ালীর মত চেঁচায়, তাহলে গরুর মালিকেরা তোদের গরু বা মেষ বা ছাগ দিয়ে দেবে?

আমরা বললাম, না, তা দেবে না।

তবে? তোরা কি মনে করিস্ দেবতারা মানুষের চেয়েও নির্বোধ যে, তোরা তাদের কথায় ভুলিয়ে ফাঁকি দিতে পারবি? সে চেষ্টা বৃথা। তাই রাজা বললেন, এখন থেকে প্রতি বছর সময়মত ইন্দ্র-দেবকে তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। তাহলে সময়মত বর্ষণ হবে, অপর্যাপ্ত ফসল ফলবে, মানুষের অভাব বলতে কোন কিছুই আর থাকবে না। কিন্তু তোরা শূদ্র, তোদের যজ্ঞ করবার অধিকার নেই। ইন্দ্রদেব তোদের আহুতি গ্রহণ করবেন না। তাই রাজা তোদের সকলের পক্ষ হয়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। এই উদ্দেশ্যেই যজ্ঞের

কারণে অর্থাগমের জন্য রাজার প্রাপ্য বলি-সম্পর্কে এই নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। যেখানে তোরা ছয় ভাগের এক ভাগ ফসল দিতিস্ সেখানে চার ভাগের এক ভাগ দিবি। এই তো ব্যাপার, আর কিছু না:

তোমরা কি বললে? কয়েকজন এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

আমরা বললাম, কর্তা, রাজা কি আমাদের মেরে ফেলতে চান? আমরা যদি মরে যাই, তবে রাজা কাকে নিয়ে তাঁর রাজত্ব চালাবেন? এমনিতেই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই, তার উপর যজ্ঞের নাম করে আমাদের উপর এ রকম চাপ যদি দেন, তবে সময়মত বর্ষণ যদি হয়ও বা, জমি চাষ করবার মত লোক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্থানিক এ পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই কথা বলছিলেন, এই বার যেমন তাঁর স্বভাব হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন, ব্যাটারা তোদের সাহস তো কম নয়। রাজার বিরুদ্ধে এই সমস্ত কথা বলিস্।

আমরা বললাম, সে কি, আমরা রাজার বিরুদ্ধে কথা বলতে যাব কেন? আমরা রাজার কাছে আমাদের দুঃখের কথা জানাতে চাই। আপনি এত রাগ করছেন কেন?

স্থানিক এবার সুরটা একটু নামিয়ে বললেন, দেখ, আমাকে শেখাতে আসিস্ নে। এখানকার কোন্ খবর আমি না জানি। একটানা পঁচিশ বছর ধরে আমি স্থানিকের পদে কাজ করে আসছি। আমার অধীনে পাচজন গোপ কাজ করে। তারা তোদের গ্রামগুলির সীমানা, ক্ষেতের সীমানা মাপজোক করে। কার ক্ষেতে কি পরিমাণ ফসল হয় সে সমস্ত হিসেব ওদের নখদর্পণে। তোদের বাড়ির সমস্ত খবরই ওরা আমার কাছে এনে পৌছে দেয়। কে কেমন আছে না আছে আমি ভাল করেই জানি। এ রাজ্যে তোরা যত সুখে আছিস্, কোন রাজ্যের প্রজা এত সুখে থাকে না।

ওঃ, বড় সুখেই আছি! ব্যাটাদের কথা শুনলে গা জ্বালা করে। দিলে না কেন আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে। আমি হলে—লম্বোদর হাঁপাতে লাগল।

তুই থাম্ তো লম্বোদর। আমাকে বলতে দে। স্থানিক তাঁর কথা বলেই চলেছেন ; এ পাশে ও পাশে যে-ক'টা রাজ্য আছে সব ক'টার খবরই আমি রাখি। সে সব রাজ্যের খবর জানলে আর টুঁ টা শব্দ করতিস্ না। তোরা যা কষ্ট পাস্ সে তো তোদের নিজেদের কুঁড়েমির জন্য। খাটা-খাটনি না করলে জমি কি আর আপনা থেকে ফসল দেবে! অলস মানুষের অশেষ দুঃখ। কাজে ফাঁকি দিয়ে তোরা নিজেরাও কষ্ট পাস্ রাজাকেও তাঁর প্রাপ্য থেকে ঠকাস্। আমাদের রাজা ভাল মানুষ। কোন কিছু বলেন না। কিন্তু অন্য অন্য রাজ্যে দেখ গিয়ে কি ব্যবস্থা। কর্ষকের অবহেলার ফলে ফসলের যদি ক্ষতি হয়, রাজা তার কাছ থেকে সেই ক্ষতির পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করে নেন। আর তাতেও যদি শিক্ষা না হয়, তার হাত থেকে জমি ছুটিয়ে নেওয়া হয়। তা ছাড়া এটার উপরে, ওটার উপরে কত রকম কর ধরা হয়। এখানে তো ওসব কিছুই নেই।

এর পর আর কি কথাবার্তা হ'ল ? প্রশ্ন করল একজন।

এ-কথার উপর কী-যে কথা বলব আমি তা খুঁজে পেলাম না।

আহা, তবু শেষ কথাটা কি বলে এলে ?

কি আর বলব, বললাম দেখি সবার সঙ্গে বুঝ-পরামর্শ করে কিন্তু স্থানিক বললেন, এর মধ্যে বুঝ-পরামর্শের কোন কথা নেই রাজা কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ এ কথা প্রজাদের চেয়ে অনেক বেশী ভাল করে বোঝেন। কাজেই তিনি যা বলেছেন, সেটাই হবে। রাজা তোমার আমার মত লোক নন। তাঁর মুখ দিয়ে যে-কথা বেরোয়, সেইটাই নিয়ম। তাঁর কথাই শেষ কথা।

এক প্রান্তে বসে কয়েকজন গুন গুন করে কথা বলছিল। তাদের গুঞ্জনধ্বনি ক্রমেই উচুতে উঠতে লাগল। এতক্ষণ সকলের দৃষ্টি মহৎ-এর মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এবার যারা গুঞ্জন করছিল সবাই কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকাল। মহৎ দেখল তার দিকে

কেউ তাকিয়ে নেই. কাজেই তার দৃষ্টিও আর সকলের দৃষ্টিকে অনুসরণ করল।

যারা গুঞ্জন করছিল, তারাও এবার বুঝতে পারল যে, সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তাদের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়াল সুদাস। তার বক্তব্যটা সে তার স্বভাব অনুযায়ী অল্প কথায় ব্যক্ত করল, না, এই চার ভাগে এক ভাগ বলি, এ আমরা দিতে পারব না। বোধ হয় কথাটাকে জোর দেবার জন্যই সে পর পর দুবার এই কথাটা উচ্চারণ করল।

দশের সভায় সুদাস কোন দিনই দাঁড়িয়ে কোন কথা বলে না। বেশী কথা বলবার অভ্যাস ওর কোন দিনই নেই। আজও বেশী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ওইটুকু কথাই একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ওই কথাই-যে সকলের মনের কথা। যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই এই কথার অনুমোদন জানাল। মেয়েদেব মধ্যে উত্তেজনা সব চেয়ে.বেশী। এতক্ষণ মহৎ-এর কথা শুনে ওরা ভেতরে ভেতরে গর্জাচ্ছিল। সুদাস মুখ খুলতেই ওরাও মুখ খুলল। পুরুষ-মেয়ে সবাই এক সঙ্গে কলরব করতে লাগল। সেই গোলমালে কারু কথাই ভাল করে বোঝা গেল না। তবে তাদের মুখের কথা বোঝা না গেলেও মনের কথাটা বুঝতে বাকী রইল না।

মহৎ একজন একজন করে সকলের মুখের দিকে তাকাল। ওদের মুখের ভাব দেখে সে বেশ একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল। সে যে শেষপর্যন্ত স্থানিক আর তার দলবলের শাসানির চোটে ওদের কথাতেই সম্মতি জানিয়ে এসেছে, এ কথাটা ভেঙে বলতে সে ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু কি করবে সে? আপত্তি জানাতে তারা তো আর কম জানায় নি, কিন্তু শেষপর্যন্ত স্থানিক তো স্পষ্ট করেই বলে ফেলল, কথা না দিয়ে এখান থেকে এক পা নড়তে পারবে না কেউ। স্থানিকের কথার সুরটা মোটেও ভাল নয়। চোখের দৃষ্টিটাও বড় খারাপ। একটু ঘাবড়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, ওরে

বাবা, জনকয়েক পালোয়ান গোছের লোক লাঠি নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একবার হুকুম দিলেই হয়। তখন সে বুঝতে পারল, স্থানিকের কথাটা শুধু কথার কথাই নয়, সে মুখে যা বলেছে, কাজেও তাই করবে। রাজী না হয়ে কি করতে পারত সে!

আসল কথা, এই উৎসবের দিনে এই চষা ক্ষেতের মাঝখানে হঠাৎ করে এমন একটা কথা বলা মোটেই ঠিক হয় নি। এখানে সব জোয়ান জোয়ান ছেলেমেয়ের কারবার। এদের গায়ের রক্ত এখনও গরম, এরা এ-সমস্ত কথা সইবে কেন? ছেলে ছোকরাগুলিকে সামলে রাখা কঠিন। মেয়েগুলির তেজ যেন আরও বেশী। কিন্তু এখানে তেজ দেখিয়ে তো কোন ফল হবে না। একটু মাথা তুলতে গেলে ডাং .মেরে মাথাটা ছেঁচে দেবে। অনেক দেখে শুনে বুড়োদের শিক্ষা হয়েছে। আর ওরা কিই-বা দেখেছে, কিই-বা জানে! কিন্তু এখনই এখানে এমন করে কথাটা না তোলাই ছিল ভাল। আগে বুড়োরা পাঁচ মাথায় মিলে যুক্তি ঠিক করে নিয়ে শেষে আস্তে আস্তে এগোলেই চলত।

মহৎ আর কথা বাড়াল না। কি একটা জরুরী কাজের ছুতো করে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ল। মহৎ চলে গেল। কিন্তু পেছনে রেখে গেল একটা কালো ছায়া। একটু আগেই সবাই হাসছিল। আমোদ করছিল। আগামী ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে কত রকম জল্পনা কল্পনা করছিল। কিন্তু—সবই যেন কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। এই বয়সের এতগুলি ছেলে-মেয়ে এমন পাশাপাশি বসে কেমন করে কথা না বলে থাকতে পারে।

আজ সকালে কত আশা নিয়ে ওরা মাঠে নেমেছে। জাঙ্গালী বুড়ী প্রসন্ন হয়েছে। অসুরের দর্প ভেঙেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। এখন ফলবে ফসল—সোনার ফসল। কিন্তু হঠাৎ এ কেমন কথা! ফসলের চার ভাগের এক ভাগ ওদের হাতে তুলে দিতে হবে? তবে কি হবে আর চাষ বাস করে? ওদের খাওয়াবার জন্য?

আর সারা বছর তারা নিজেরা খাবে কি? ছেলেপিলেদের কেমন করে বাঁচাবে? কিন্তু এ কি কখনও সত্য হতে পারে? কিন্তু তা যদি নাই হবে, মহৎ-এর মুখের ভাব এমন কেন? আর কথা বলতে বলতে হঠাৎ এমন করে চলেই বা গেল কেন? মনে হ'ল যেন পালিয়ে বাঁচল।

সেদিন কাজে আর কারু মন বসল না। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার ঘরে ফিরে চলল।

সুদাস আর ইদা হাতে হাত ধরে চলছিল। ইদা বলছিল, সুদাস, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। ওরা যা বলছে, সত্যিই-কি তাই করবে নাকি? তাই যদি হয়, তবে আমাদের কি উপায় হবে?

সুদাস তাকে একটু সাহস দিল, না, না, এ কি সত্যিই হতে পারে, কোন দিন কেউ শুনেছে এমন কথা? ইদাকে সাহস দেবার নাম করে, সুদাস নিজেকে কিছুটা আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল।

ইদা কি যেন একটা কথা বলি-বলি করল, শেষে বলেই ফেলল। দেখ, আমার কিন্তু সত্যিই বড় ভয়-ভয় করছে। তোমাকে তো বলি নি, শোন তবে সে কথা। আজ শেষ রাত্রিতে খুটখাট্ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। এয়া বড় এক কালো কুটকুটে জংলী বেরাল। ওমা খাবারের ঢাকনাটা তুলে ফেলে কপ্ কপ্ করে খাচ্চে। তাড়া দিতে ভয় পেল না মোটে, খ্যাঁচ্ করে আমার দিকে রুখে দাঁড়াল। ওরে বাবা, সে কি চেহারা! এমন কালো কুৎসিত বেরাল আমি আর কখনো দেখি নি। আর চোখ দুটো কী যেন আগুনের মত জ্বলছে। লাঠিটা তুলতেই, বিশ্বাস করবে না, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। তার পর আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দেখতে না দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমার হাতের লাঠি হাতেই রইল, কিছুই করতে পারলাম না। আজ উচ্ছবের দিন, ভোর হতে না হতেই এমন কাণ্ড। সেই থেকেই আমার বুকটা গুর গুর করে কাঁপছে, কোন কাজেই মন লাগাতে

পারছি না। তুই একটা পাগলী, সুদাস হেসে উঠল, একটা বেরাল দেখেই এত ভয়! বেরাল কি করতে পারে?

বেরাল নয় গো বেরাল নয়। আমি যেন আর বেরাল চিনি না। বেরাল কখনও এমন হয়? ওরে বাপ রে বাপ! কেমন চোখ ছুটো। আঙরার মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। ওদের কথা কে না জানে, যখন যেমন খুশি, সেই রকম মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়। ওরা যে-সংসারে একবার মুখ ঢোকাবে, তার আর রক্ষা নেই। আর দেখ না কেন, ঘরের দরজা বন্ধ, অথচ কেমন করে কোথায় চলে গেল! বেরাল কি করে অমন হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

সুদাস এবার আর কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। এ সংসারে অসম্ভব কি, আকাশে বাতাসে ওরা তো সব কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। কোথাও একটা ফাঁক খুঁজে পেলেই হ'ল, অমনি সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বে। এ বেরাল, সত্যিকারের বেরাল না হয়ে কত কিছুই তো হতে পারে! এ কোন নতুন কথা নয়। সুদাস অনেক ভাল ভাল লোকের মুখে শুনেছে, ওরা সব সময় সব দেহের খোঁজে থাকে। গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, মানুষ—যার শবদেহ পায় তারই ভেতর ঢুকে পড়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলে! তারপর সেই দেহ নিয়ে লোকসমাজে উৎপাত করে বেড়ায়। আর লোকের মুখে শোনা কেন, সে তো স্বচক্ষেই দেখেছে। একবার, বয়স তখন বেশী নয়, একটা কুকুরকে সে মেরে ফেলেছিল। ওটাকে তার খেয়ে ফেলাই উচিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা কুকুর-বিড়াল খেতে নিষেধ করে। ও-সব নাকি জংলী লোকেরাই খায়। তা নাই বা খেল, ওটাকে পুড়িয়ে ফেললেই আপদ চুকে যেত। কিন্তু ওই বয়সে এত সব কথা তো আর তার জানা ছিল না। তেরাত্তির যেতে না যেতেই উৎপাত শুরু হয়ে গেল। যেখানে যায় সেখানেই দেখে ওর পেছন পেছন একটা কুকুর আসছে। অবিকল সেই কুকুরটা। আর কি যে হ'ল, রাত্তিরে আর ঘুমোতে পারে না, কানের কাছে কেবলই কুকুরের ডাক আর গোঁ

গোঁ শব্দ শোনে। ওকে যেন পাগল করে তুলল। তখন যেখানে সেই মরা কুকুরটাকে ফেলে দিয়েছিল, সেখানে খোঁজ করে দেখতে গেল। ওমা, কোথায় কি, কুকুরটার চিহ্নমাত্রও নেই। মাংসাশী পশুপাখিরা খেয়ে ফেলে থাকলে হাড়টুকু পড়ে থাকবে তো! তাও নেই। তখন আর ওর বুঝতে বাকী রইল না। বাপ-মার কাছে সব কথা খুলে বলতেই তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমাজে খবর দিল। তখন ডাক পড়ল মন্ত্রসিদ্ধ গুণীর। তারপর কত মন্ত্র আর ঝাড়-ফুঁকের পর সে-যাত্রা সে রেহাই পেল। এখনও সে-কথা মনে পড়লে ভয় হয়।

সুদাসের চিন্তাগ্রস্ত মুখের ভাবখানা দেখে ইদা বুঝল কথাটা ওর মনে লেগেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল :

ওদের কি বিশ্বাস আছে? শুধু পশুপাখি নয়, মানুষের মূর্তি ধরেও ওরা আসে। মানুষ হয়ে দিব্যি মানুষের মতই থাকে। মানুষের মতই ঘর-সংসার করে, বিয়েথাওয়া করে, ছেলে-মেয়ে হয়, সমাজে সবার সঙ্গে সমান ভাবে ওঠাবসা চলাফেরা করে। দেখে বুঝবে, এমন সাধ্য কারু নেই, দিব্যি ভাল মানুষ। তবে যার পেছনে লাগবে, তার আর রক্ষা নেই। ওদের চোখের দৃষ্টি বড় খারাপ। ওদের দৃষ্টি পড়লে দুধাল গাইয়ের দুধ বন্ধ হয়ে যাবে, ফলন্ত গাছে আর ফল ফলবে না, পুরুষ পুরুষত্ব হারাবে আর মেয়েরা বাঁজা হয়ে থাকবে। বললে বিশ্বাস করবে না, এমন মানুষ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদের গাঁয়েই ছিল। আমরা কাকা বলে ডাকতাম। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল।

ইদার কথা বলবার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। গল্প বলে লোকের মন টানতে পারে। সুদাস কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল :

কেমন করে ধরা পড়ল?

সেবার গাঁয়ে লাগল মড়ক। গরু-বাছুর ঠাস্ ঠাস্ করে মরে যেতে

লাগল। সারা গাঁময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। গরু ছাড়া মানুষের মূল্য কি? গো-বৈদ্যেরা হার মেনে গেল, কেউ কোন প্রতিকার করতে পারল না। গরু মরেই চলল। শেষকালে অনেক দূরের দেশ থেকে এল এক মন্ত্রসিদ্ধ গুণী। চারদিকে তার নামডাক। সবাই বলল, এবার একটা বিহিত হবে।

বিহিত করতে পারল কিছু?

পারবে না আবার! সে কি যেমন তেমন লোক নাকি? দশ গাঁয়ের লোক তাকে চেনে। সে এসেই সারা গ্রামটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। তিনবার চক্কর মেরে সে ফিরে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে গাল দিতে লাগল, আহাম্মক ব্যাটারা, ঘরের মধ্যে পিশাচ পুষে রেখেছিস্, এই দুর্গতি তোদের হবে না, কার হবে? সে-ই তো এসব করাচ্ছে।

গ্রামের পাঁচ জন হাত জোড় করে বলল, না, গুণী না, অমন কথা বলবেন না। আমাদের এ গাঁয়ে তেমন লোক খুঁজে পাবেন না।

আছে কি নেই, সে আমি বুঝব। আগে তোদের গাঁয়ে যত লোক আছে সব এখানে এনে জমায়েত কর। মেয়ে-পুরুষ ছোট-বড় একটাও যেন বাদ না পড়ে। পাঁচ জনের ডাকে সবাই এসে জমা হোল, বড়-ছোট কেউ বাদ পড়ল না। যারা হাঁটতে শেখে নি তারাও মায়ের কোলে চেপে এল।

সবাই যখন এসে পৌছাল, গুণী ডাকল, তোরা সবাই গোল হয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়া। আমরা সবাই তাই করলাম। আর গুণী মাঝখানে বসে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালাল। আগুনটা জ্বলে উঠতেই সে তার ঝুলির ভেতর থেকে একমুঠো কি যেন বের করে সেই আগুনের উপর ঢালল। ঢালবার সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ রংয়ের ধোঁয়া উঠতে লাগল আর বিষম দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সেই লোকটা, তার নাম ছিল গংগু। সে সবার সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ধোঁয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগতেই গন্ধ সহ্য করতে না

পরে নাকে-মুখে হাত চেপে পেছন ফিরে দাঁড়াল।....আর গুণী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে এসে তার হাতটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল :

তোরা দেখ, এই সেই পিশাচ, মানুষের রূপ ধরে তোদের মাঝে বাস করছে। আর ওর দৃষ্টিতেই সারা গ্রামের গরু-বাছুরগুলি এমন করে দাপিয়ে দাপিয়ে মরছে। আমার এই ওষুধের গন্ধ ভূত, প্রেত, পিশাচ কেউ সহ্য করতে পারে না। দেখ দেখ, ওর অবস্থাটা, গন্ধের ঠেলায় ছুটে পালাতে চাইছিল। কিন্তু কোথায় পালাবে? আমার মন্ত্রের জালে ওকে বেঁধে ফেলেছি।

গুণী দুই হাতে ওকে শক্ত করে চেপে ধরে জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

আর কেউ বুঝি সেই গন্ধ পায় নি?

পাবে না কেন? ততক্ষণে সবাই গন্ধ পেয়ে গেছে। কিন্তু কেউ নাকও চেপে ধরে নি, মুখও ফেরায় নি।

কি করল তখন গংগু?

প্রথমটায় ও বুঝতে পারে নি, শেষে ভয়েই হোক বা মন্ত্রের জোরেই হোক, ওর চোখমুখ বিকট হয়ে আসতে লাগল। চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গংগুর কাছাকাছি যারা ছিল, তারা সবাই ভয়ে ওর কাছ থেকে সরে গেল।

আর ওরা সবাই কি করল?

সবাই থ' খেয়ে চুপ করে আছে। কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। এমন সময় ওপাশ থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে বলে উঠল, ঠিক কথা। গুণী ঠিক কথাই বলেছে। গংগু সেদিন বিকালে আমাদের বাড়ি গিয়েছিল বটে। ঘুরতে ঘুরতে কে জানে কি মনে করে আমাদের গরুটা যেখানে ঘাস খাচ্ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর বলল, তোমার গরুটা তো ভালই আছে হে। আহা, দিব্যি সুন্দর তাজা গরু! কথাটা শুনেই আমার কেমন খট্ করে লাগল, ও কেমন কথা! বলব কি, গংগু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার দু'দিন

বাদেই গরুটা চিৎপাত হয়ে পড়ে পা ছুঁড়তে লাগল। তারপর সেই রাত্রিতেই শেষ।

গুণীন সবাইকে ডেকে বলল, এবার তোমরা সব বুঝতে পারছ তো?

এবার আর কারু বুঝতে বাকী নেই। যারা ভয়ে পিছিয়ে, গিয়েছিল, তারা আরও পেছনে সরে গেল। আর যাদের গরু মারা গিয়েছে তারা চেঁচিয়ে উঠল, মারো মারো!

আর গংগু তখন কি করল?

গংগু? গংগু আর কি করবে? সে তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। গুণী তার হাতের মোটা লাঠিটা উঁচিয়ে তুলে ডেকে বলল, প্রথম মার আমি মারব। তারপর তোমরা সবাই আমার মন্ত্রের জোর থাকতে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেল। মন্ত্রের জাল ছিঁড়ে ও যদি একবার বেরিয়ে যেতে পারে, তখন কিন্তু আর ওকে ধরা যাবে না।

গুণীর হাতের লাঠিটা সাঁ করে গংগুর মাথার উপর পড়ল। এতক্ষণ গংগু কোন কথা বলতে পারে নি, একটু শব্দও করতে পারে নি। এইবার লাঠির ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-ফাটানো এক বিকট চীৎকার করে উঠল। এমন শব্দ কোন মানুষের গলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। চীৎকার করেই গংগু যেদিকে একটু ফাঁক ছিল, সেখানটা দিয়ে সোঁ করে দৌড় মারল। কিন্তু কোথায় পালাবে! ধর ধর, মার মার করতে করতে লাঠিসোঁটা পাথর যে যা হাতের কাছে পেল, তাই নিয়ে মারতে লাগল। মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ গেল না। এতগুলি মানুষ, কতক্ষণ আর লাগে! দেখতে দেখতে ওকে মাটির সঙ্গে থেঁতলে ফেলল। রক্তে কাদা হয়ে গেল মাটি। আর গংগুর বউ আর ছেলেমেয়েগুলি সেই মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু ওর জন্য আর কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। ও তো মানুষ নয়, ও-যে পিশাচ।

আর ওর শবদেহটাকে নিয়ে কি করল?

গুণী আর দেরী করল না, তখনই ওকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল। তারপর যাবার সময় এক ভাঁড় ছাই সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এ ছাইয়ের নাকি বড় গুণ। এ সঙ্গে থাকলে ভূত, প্রেত, অপদেবতারা কাছে ঘেঁষতে পারে না।

সুদাস অনুমোদনের সুরে বলল, ঠিকই করেছিল গুণী। কোন মড়াই ফেলে রাখতে নেই। শবদেহের উপর ওদের বড় লোভ। সব সময় এ জন্য ওরা ওৎ পেতে বসে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই হ'ল, অমনি ঢুকে পড়বে।

মা রে মা, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি করেছি আমরা ওদের? ওরা আমাদের পিছে এমন করে লাগে কেন?

যার যেমন স্বভাব। তা নইলে ভূত, প্রেত, পিশাচ এসব বলবে কেন? মাতঙ্গী বুড়ীর মুখে শুনেছি, বহুকাল আগে আমাদের জাতের ধারা ছিল, কেউ মরলে পরে তার দেহটা মাটির নীচে পুঁতে রাখা।

ইদা তার কথায় বাধা দিল, ক্ষেপেছ তুমি? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কেউ কখনও শুনেছে? ছিঃ ছিঃ, মাটির নীচে পুঁততে যাবে কেন? মানুষ কি বীজ-যে মাটির নীচে পুঁতলে গাছ উঠবে?

আহা গাছ উঠবে কেন? আসল কথাটা কি জান, মড়া মাটির উপরেই রাখ আর মাটির তলাতেই রাখ, ওরা গিয়ে দখল করে বসে। সেই জন্যই দেহ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হয়।

সে তো ঠিক কথাই। আমিও সেই কথাই বলি। আগেকার দিনের লোকেরাই তা হলে না পুড়িয়ে পুঁতে রাখতে যাবে কেন?

কেন পুঁতে রাখত? মাতঙ্গী বুড়ীর কাছে সে কথাও শুনেছি। আগেকার দিনের মানুষ কত রকম তন্ত্রমন্ত্র জানত। মাটিতে পুঁতে রাখবার সময় ওরা এমন করে মন্ত্র পড়ে দিত যে, অপদেবতার সাধ্য ছিল না যে, তার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। আজকালকার মানুষ সেসব মন্ত্র কি আর জানে! আর জানলেও মন্ত্রেরও সেই গুণ নেই। কাজেই এখন আর কেউ পুঁতে রাখতে সাহস করে না, পুড়িয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়।

কে জানে বাপু, কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে। তখনকাব দিনে কে কি করত তা তো তুমিও দেখতে যাও নি, আমিও দেখতে যাই নি। কিন্তু আমি ভাবছি, কি কবেছি আমরা ওদেব, ওরা কেন আমাদের পিছে এমন করে লাগে? ইদা তাব সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

সুদাস ভাবতে লাগল। ইদাব প্রশ্নটা ওকে ভাবিয়ে তুলছে। তবে আজই প্রথম নয়, এই চিন্তাটা বহু দিন ধরেই ওর মাথায় চেপেছে। কিন্তু ভেবে আর কুল পায় না। অপদেবতাদের যত উৎপাত সব যেন ওদের উপরেই। শুধু কি অপদেবতাবা? মানুষই বা কম কিসে? সুদাসের বয়স বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই অনেক কিছুই সে দেখেছে। ঐ যে উচু বর্ণের মানুষগুলি, তাদের উৎপাতটাই কি কম? এসব কথা বেশী ভাবতে চায় না সুদাস। এ কথা নিয়ে ভাবতে বসলে মনটা কেমন অস্থির করে ওঠে আর মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে। কিন্তু না ভেবেও উপায় নেই। এদিক থেকে, ওদিক থেকে, নানা দিক থেকে এই চিন্তাটা কেবলই ঘুরে ঘুরে আসে। ভাবনাকে কি আর আটকে রাখা যায়?

একটু বাদে ইদার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, শোন ইদা, আমরা শূদ্র, আমরা সমাজে সব চেয়ে নীচ, আর সবচেয়ে দুর্বল। নরম পেলে সবাই তাকে চেপে ধরে। এই জন্যই অপদেবতাদের রোখ আমাদেব উপরেই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু অপদেবতারা তো একা নয়, তার সঙ্গে জুটেছে আবার মানুষ। ওরা দু'পক্ষ মিলে যেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

মানুষ? মানুষ আবার কি করল? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল ইদা।

মানুষ কি করল? জিজ্ঞাসা করছিস্ আবার? কি বলল এসে মহৎ? কি শুনে এলি এতক্ষণ? আমাদের নরম পেয়ে ওরা নিত্যি নতুন নিয়ম আর নিত্যি নতুন জুলুম চালিয়ে আসছে। আমরা কোন কিছু বলি না, চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাই। এ তো আজ নয়, কে

জানে কত যুগ ধরে চলে আসছে। আমার এই জীবনেই কত না দেখলাম!

বলতে বলতে সুদাসের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল। ওর ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। ছন্‌ছন্‌ করে উঠল সারা দেহ। আবার মাথার মধ্যে তেমনি করে আগুন জ্বলতে লাগল, যেমন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

ইদার দৃষ্টি এড়াল না। সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল,

এই দেখ, এই দেখ, আবার তোমার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ওদের কথা উঠলেই তুমি ক্ষেপে যাও আর তোমার চোখ লাল হয়ে ওঠে। তুমি অমন কোরো না। ও দেখলে আমার বড় ভয় করে।

অমন করব না! কেন করব না? আমার বাপকে মেরে ফেলেছে কে?

আহা, থাক থাক, ওসব পুরানো কথা আবার কেন?

পুরানো? কিচ্ছু পুরানো হয় নি। আমার কাছে সবই নতুন হয়ে আছে। আমার সেই বোনটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে কারা?

আঃ, থাক না ওসব কথা।

কথা তো চেপেই আছি। কিন্তু তুই তো জানিস্‌ না, আমার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় সে কথা। আমি আর কতকাল চাপা দিয়ে রাখব? চেপে রেখেছি বলেই তো আমার সারা গায়ের রক্ত চোখ ফেটে বেরোতে চায়। সেই জন্যই তো আমার চোখ এমন হয়ে ওঠে।

কিন্তু কি করবে তুমি? তুমি তো আর ওদের সঙ্গে পারবে না। ওরা-যে রাজার নিজের লোক। আর রাজার কত জোর!

পারব না? ঠিকই বলেছিস্‌, হয়তো পারব না কিছু করতে। ওদের জোর অনেক বেশী। একটু মাথা তুলতে গেলেই ওরা ডাং মেরে আমাদের মাথা থেঁতলে দেবে, যেমন করে তোরা গংগুকে থেঁতলে দিয়েছিলি। সেই জন্যই তো মনের রাগ মনেই পুষে রাখি আর যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন নিজের ঘরে বসেই মাথা কুটে মরি।

একটু সময় চুপ করে থেকে সুদাস হঠাৎ জড়িয়ে ধরল ইদাকে —তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, সত্যি কথা, সত্যি কথা বলছি ইদা, তোর মত আমারও বড় ভয় লাগছে।

ইদা এমন আর কখনও দেখে নি, সুদাসের মুখে একি কথা! সে কতক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বলল, ভয়? তোমার আবার কিসের ভয়?

হ্যাঁ, ভয় হয়। তোর পেটে যে-বাচ্চাটা এসেছে, ও যখন বেরিয়ে আসবে, আমরা ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো? আমাদের শত্রু-যে চারিদিকে,আকাশে-বাতাসে ঝোপে-ঝাড়ে সর্বত্র। আমাদের শত্রু রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাই। এত শত্রুর মধ্যে ও কেমন করে বাঁচবে, কেমন করে বড় হয়ে উঠবে? আমি ওদের হাত থেকে আমার বাপকে বাঁচাতে পারি নি, বোনটাকেও রক্ষা করতে পারি নি, আমার বাচ্চাটাকে কি বাঁচাতে পারব! না রে ইদা, এর চেয়ে ওর না আসাই ছিল ভাল। জন্মাবার আগে ওর মরে যাওয়াই বুঝি ভাল।

ইদা হঠাৎ বিষম ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। পাখির বাসায় হামলা হলে পক্ষিণী মা যেমন ব্যাকুল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি করেই।

চুপ চুপ চুপ, এমন কথা কেউ বলে! তুমি কি পাগল হলে নাকি! না, একটা কথাও বলতে পারবে না তুমি। আগে বাড়ি চলো।

ইদা সুদাসকে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

চার

রাজা বৃষকেতু উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে ছিল। রানী সুদক্ষিণার মুখের সামনে মাঝে মাঝেই তাকে এ অবস্থায় পড়তে হয়। এরকম অভিজ্ঞতা অনেক বারই তার হয়েছে। এই জন্যই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বা বিতর্কে যাওয়াটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু সুদক্ষিণা তার পছন্দ-অপছন্দের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না, যখন সে দরকার বোঝে, নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। তখন কি করা—কথার উত্তরে কথা বলতেই হয়! কিন্তু কিছুক্ষণ বাক্য-বিনিময় করবার পর বাধ্য হয়ে তাকে কথা থামাতে হয়। এরকম মেয়ের সঙ্গে বাক্যব্যয় করবার কোনই অর্থ হয় না। কাজেই রাজা একবারে চুপ করে যায়। সচরাচর এরকমই ঘটে থাকে।

রাজার তিন রানী। বড় রানী সুদক্ষিণা। রাজার যেটুকু সমস্যা তাকে নিয়েই। আর বাকী দুই রানী, মেয়ে নয় তো যেন কোমল মাংস দিয়ে গড়া দু'টি ফুলের তোড়া, রূপে যৌবনে ডগমগ করছে। ওদের নিয়ে রাজার কোনই ঝামেলা পোয়াতে হয় না। আর ওদের নিয়ে খেলা করেও সুখ। বসন দিয়ে, ভূষণ দিয়ে, আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, ওদের সাধ আহ্লাদ সব কিছুই পূরণ করে রাজা। ওরা তাতেই সন্তুষ্ট। তবে রাজার সঙ্গে রাত্রি যাপনের পালা নিয়ে মাঝে মাঝে একটু মন কষাকষি-যে না হয়, তাও নয়। তবে ও কিছু নয়, ও তো সর্বত্রই ঘটে থাকে। পুরুষ মহার্ঘ জিনিস, বিশেষ করে রাজ-রাজড়া। ...একটা মেয়ের জন্য একটা আস্ত পুরুষ, এমন কপাল নিয়ে ক'টা মেয়ে জন্মেছে। এ তো আর নীচ শ্রেণীর শূদ্র বা নিষ্কাঞ্চন সাধারণ মানুষের কথা নয়, এ হচ্ছে বড় ঘরের কথা।

কিন্তু দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া দুই রানীর সম্পর্কে রাজা সমদর্শী, কাউকে

অবহেলা করে না। রাজা বৃষকেতু বৃষের মতই বলিষ্ঠ ও সম্ভোগপ্রিয়, দু'জনকেই তুষ্ট রাখা তার পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু এরাই তো সব নয়। বিয়ের পর রানীদের সঙ্গে পিত্রালয় থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে সখীরা আসে। রাজকন্যাদের পিতারা জামাইদের জন্য সুলক্ষণযুক্তা শত শত গাভী ও সুন্দরী যৌতুক পাঠায়। গাভীগুলি রাজার গোশালায় স্থান পায়, আর এই মেয়েরা রাজ-অন্তঃপুরকে উজ্জ্বল করে রাখে। ওদের এই অন্তঃপুরের অবরোধের মাঝখানেই সখীবৃত্তি নিয়ে যৌবন আর জীবন পাত করতে হবে। নিজেদের স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করবার সুযোগ বা অধিকার ওদের নেই। ওরা শুধু রাজবাড়ির শোভা। রাজার চোখে যখন যাকে ভাল লাগে, রাজা তাকে ভোগ করে। ওরা বিনা বাক্যে আত্মসমর্পণ করে, আর এই টুকুকেই পরম ভাগ্য বলে মেনে নেয়। রানীরা এতে কিছু মনে করে না। কেনই বা করবে? এই রীতি তো চিরদিনই চলে আসছে। পুরুষের ক্ষুধা অতৃপ্ত, তার কি কোন সীমা আছে? এক বৃষ শত গাভীর কামনা পূর্ণ করতে পারে।

কিন্তু রানী সুদক্ষিণার কথা স্বতন্ত্র। প্রধানা রানী হয়ে সে-ই প্রথম এসেছিল, রাজ-শয্যার অর্ধ অংশ সে-ই প্রথম অধিকার করেছিল। কিন্তু তার-যে এ বিষয়ে বিশেষ দাবীদাওয়া আছে, এমন মনে হয় না। মেজো আর সেজো, দুই রানীর হাতে রাজাকে ছেড়ে দিয়ে সে যেন একটু আলগা হয়ে আছে। রাজা নিজেও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এ মেয়ে যেন কেমন, আর সব মেয়েদের মত নয়। রাজার নিজের কাছেও এ কথা গোপন নেই, ভেতরে ভেতরে সুদক্ষিণাকে একটু ভয় করেই চলে। কি আশ্চর্য, সামান্য একটা মেয়ে, মানুষ তো নয়, মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র, তাকে আবার ভয় কিসের?

আগে জানলে সে কি কখনও এই মেয়েকে রানী করে ঘরে আনত? বিয়ের আগে কেউ ঘুণাক্ষরেও এমন কথা বলে নি। সে কেমন করে জানবে এই মেয়ে ওইটুকুন বয়সে এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বসে আছে। মেয়েমানুষের মাথা, সেই মাথায় এত বিদ্যা আর এত

বুদ্ধি কেমন করে ধরে? ওর সঙ্গে কথা বলবার জো নেই, একটা কথা বলতে গেলে পাঁচটা ভুল ধরে বসে। আর পদে পদে নাকাল হতে হয়। ও যতক্ষণ কাছে থাকে, সশংক হয়ে থাকতে হয়, কোন্ কথায় কোন্ কথা টেনে আনে। আর যেমন করে লোকে বঁড়শি দিয়ে জল থেকে মাছ টেনে তোলে, তেমনি করে ও যেন পেটের কথা বার করে নিয়ে আসে। আর কি ধারালো চাউনি, চোখের দিকে তাকালে মনটা আপনা থেকেই সংকুচিত হয়ে আসে। অথচ প্রথম যখন এসেছিল, কি নরম-সরম মেয়ে, একটু ছুঁতে গেলেই ফুলের পাঁপড়ির মতই কেঁপে উঠত। সেই মেয়ে আজ এমন হয়ে উঠেছে।

সবাই ধন্য ধন্য করে, রানীর মত রানী। প্রাসাদের এতগুলি লোক সব তার বাধ্য। তার নিয়ম মেনে সবাই কাজ করে চলে, কোন অশান্তি, কোন বিশৃঙ্খলা নেই। রাজা নিজেও প্রশংসা না করে পারে না। বিয়ের আগেকার দিনগুলির কথা এখনও ভুলে যায় নি সে। রাজমাতা মারা গেল, আর তার পরই রাজপুরীতে চলল ভূতের রাজত্ব। যে যার মতে চলে, কেউ কারু কথা মানে না, একজন আর একজনের নামে কান ভাঙানি দেয়, একদল আর এক দলের বিরুদ্ধে গোপন ষড়্যন্ত্র করে—রাজপ্রাসাদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। এখন সে-সব দিনের কথা ভাবলেও ভয় হয়। তারপর এল সুদক্ষিণা -সে আসবার সাথে সাথেই প্রাসাদের শ্রী একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল। সবাই বলল রাজলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন, আমাদের পরম ভাগ্য, আবার তিনি ফিরে এসেছেন। সেই থেকে প্রাসাদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব রানী নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাজা বৃষকেতু তার রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হতে পারে কিন্তু রাজপ্রাসাদের অবিসংবাদিত নেত্রী রানী সুদক্ষিণা, একথা সবাই স্বীকার করে।

রাজা নিজেও একথা জানে। কিন্তু সেজন্য কোন অভিযোগ বা আপত্তি নেই তার। রাজরানী রাজপ্রাসাদের সুব্যবস্থার ভার নেবেন, এ তো ভাল কথাই। আর তাতে শান্তিতেও থাকা যায়। কিন্তু যার

কাজ যেখানে সেখানেই তাকে মানায়। মেয়েমানুষের মত থাকাই ভাল। প্রজাপতি যখন প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন, আর যার যার কর্মবিভাগও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুদক্ষিণা নিজের সীমানা ডিঙিয়ে সব কথায় কথা কইবে, আর সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে। সমস্ত রাজ্যটাকে যেন সে তার রাজপ্রাসাদের মতই মনে করে। রাজ্য-শাসন-ব্যাপারেও তার মতামত প্রকাশ করা চাই, উপদেশ দেওয়া চাই, আর কথায় কথায় কৈফিয়ৎ চাওয়া চাই। এইসব নিয়েই যত খিটিমিটি বাধে।

আজও সেই কথা দিয়েই শুরু হয়েছিল।

সুদক্ষিণা বলল, রাজা, রাজা বলেই যা খুশি তা করতে পারে না। কৃষিজীবী প্রজাদের বলি বৃদ্ধি করিবার এই দুর্বুদ্ধি কেমন করে তোমাদের হ'ল? ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ, এই বিধি তো আজকের নয়। যেদিন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই এই বিধি চলে আসছে। এই বিধি ভঙ্গ করিবার দুঃসাহস কে তোমাদের দিয়েছে? মা পৃথিবী কি এই অনাচার সইবেন? এর ফল কখনোই ভাল হতে পারে না।

বৃষকেতু চমকে উঠে বলল, আরে, তুমি কেমন করে একথা জানলে?

সুদক্ষিণা হাসল, দৃষ্টিশক্তি সবার সমান নয়। কেউ কেউ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে দিনের আকাশেও তারা দেখতে পায়, আবার কেউ বা দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পায় না। আমি তো অনেক বারই তোমাকে বলেছি, আমার দৃষ্টি অনেকের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ। সেই জন্যই তোমরা অনেকে যা দেখতে পাও না, আমি এখানে বসেও তা দেখি। কেন, তার প্রমাণ পাও নি আগে কখনও? কিন্তু কেমন করে দেখি সে কথা থাক, আগে বল, এসব তোমরা কি করছ? রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাও?

এসব কথায় তোমার দরকার কি? বৃষকেতু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল,

কিসে ভাল হয় আর কিসে মন্দ হয়, সে কথা ভাববার জন্য রাজাই তো আছে।

রাজা যদি বুঝতই, তবে আর আমাকে অনর্থক ভেবে মরতে হোত না। এসব কথায় আমার দরকার কি? কেন নয়? রাজা-রানী প্রজাদের পিতামাতা। আমার সন্তানের মত প্রজারা, তাদের কথা আমার ভাবতে হবে না? আর প্রজাদের যদি অমঙ্গল হয়, তারা যদি মনের দুঃখে অভিসম্পাত দেয়, তবে কি রাজা আর রাজ্যের অকল্যাণ ঘটবে না?

কে বলল, প্রজারা অভিসম্পাত দেয়, গর্জে উঠল বৃষকেতু, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তো বলির ভাগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে ইন্দ্রদেবকে যদি প্রসন্ন না করা যায় তবে বর্ষণ কেমন করে হবে? আর বর্ষণ ছাড়া ফসল ফলবে? আর ফসল যদি না ফলে, ওদের গতি কি হবে?

সুদক্ষিণা কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বৃষকেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বলল, সত্য করে বল, ওদের ভালোর জন্যই কি বলির বৃদ্ধি করা হচ্ছে?

সুদক্ষিণার এই দৃষ্টিটাই বৃষকেতু সহ্য করতে পারে না। অস্বস্তিতে তার চোখের পাতা নেমে এল। তবু কোনমতে সে বলে ফেলল, হ্যাঁ। কিন্তু গলাটা একটু কেঁপে গেল। ছিঃ স্বামী, কার কাছে দাঁড়িয়ে তুমি এই কথা বলছ? দেখছ না, সম্মুখে গৃহদেবতা অগ্নি বিরাজ করছেন। তোমার ভয় নেই?

বৃষকেতু চমকে উঠে আতঙ্কভরা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, অগ্নিদেবতার ক্রুদ্ধ শিখাগুলি লক্ লক্ করে উঠছে। তার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

এটা কি ঠিক নয়, বৃদ্ধ মন্ত্রী এই বলির বৃদ্ধি সমর্থন করেন না?

উত্তর নেই।

এটা কি ঠিক নয়, রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ণ তোমাকে এই পথে পরিচালিত করছেন?

উত্তর নেই।

এটা কি ঠিক নয়, বলিবৃদ্ধিজাত এই অতিরিক্ত ধন ব্রাহ্মণদের দান করা হবে?

বৃষকেতু এবার উত্তর দিল, ব্রাহ্মণদের দান করা রাজার ধর্ম। সে ধর্ম অবশ্যই পালনীয়।

দরিদ্র কর্ষকদের প্রবঞ্চিত করে? তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে

বৃষকেতু কোন উত্তর দিল না।

স্বামী, তুমি ভুলে গেছ, তোমার পিতা, আমার শ্বশুর, তাঁর মৃত্যুশয্যায় তোমাকে কি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর ঠিক তারই বিপরীত পথে তুমি আজ পা বাড়িয়েছ।

আমার পিতা? মৃত্যুশয্যায়? কি জান, তুমি কি জান তার?

আমি সব জানি। তুমি স্মরণ করে দেখ। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। তিনি তোমাকে ডাকিয়ে এনে একান্তে বললেন, তোমার কাছে আর কোনদিন কোন কথা বলবার সুযোগ পাব না। আমার এই শেষ উপদেশ শুনে রাখ। কোন দিন কোন অবস্থাতেই কর্ষকদের বলির ভাগ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কোরো না। এর পরিণতি বড় মারাত্মক। আমার এই কথা মান্য করে চলো। ভগবান বরুণ, তোমাকে সকল বিঘ্ন থেকে রক্ষা করবেন।

তুমি একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলে, মারাত্মক? এ কথা বলছেন কেন? গৃহপালিত পশুর মত এই নিরীহ প্রাণীগুলি কি করতে পারে আমাদের?

তিনি একটু হেসে বললেন, নিরীহ এরা, সে কথা ঠিকই, কিন্তু একবার যদি মরীয়া হয়ে ক্ষেপে ওঠে, তখন এদের সামলানো বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বড় কঠিন ও তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথা বলছি। তোমার প্রপিতামহ একবার এই বলি বৃদ্ধির নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। কর্ষকেরা কেউ এতে রাজী হ'ল না। একটু চাপ দিতেই ওরা আরও বিগড়ে গেল।

অল্প কয়েকজন ছাড়া বাদবাকী সবাই পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল :

এই নতুন নিয়ম পালটানো না হলে ওরা কেউ বলি দেবে না। দিল না, দিলই না। তখন এই নিয়ে বাধল সংঘর্ষ। গৃহপালিত প্রাণীর মত নিরীহ এই মানুষগুলিও-যে এমন করে রুখে দাঁড়াতে পারে, আমার পিতামহ এমন কথা ভাবতেও পারেন নি। আমাদের নিজেদের লোক যারা, তারা ছিল সবাই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত। আর ওদের নিরস্ত্র বললেই চলে। তবু আমাদের পক্ষের বেশ কিছু লোক মারা পড়ল। আর ওদের লোক কত যে মরল, তার তো লেখাজোকা নেই। একচোট মারামারি কাটাকাটির পর ওরা ক্রমে ক্রমে বশ মানল। কিন্তু সবাইকে বশ মানানো গেল না। এদের মধ্যে বেশী রকম মারমুখো যারা, তারা মনের আক্রোশে যেখানে যা পেল ভেঙে চুরে শেষ করল আর ক্ষেতভরা ফসল পুড়িয়ে ছাই করল। তারপর মারতে মারতে আর মরতে মরতে ওরা নিজেদের ঘরবাড়ির মায়া ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে গেল। কেউ গেল দক্ষিণ দেশে, কেউ গেল পূর্ব দেশে বা বনে জঙ্গলে আর পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর সে কি দুর্দিন! যারা চলে গেল, তাদের জমি সব পতিত পড়ে রইল, সেখানে ফসল ফলাবে কে? শূদ্রেরা ছাড়া চাষের কর্ম আর কেউ তো জানে না। তা'ছাড়া এই হীন কর্ম করবেই বা কে? ফলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। তখন উপায়ান্তর না দেখে তোমার প্রপিতামহকে ফিরিয়ে নিতে হোল সেই নিয়ম। আবার ফিরে এল সেই সনাতন প্রথা—ছয় ভাগের এক ভাগ।

বৃষকেতু মূঢ়ের মত স্তব্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, এত সব কথা, কেমন করে জানলে তুমি? তুমি কি বেতাল-সিদ্ধ? তোমাকে কে এ সমস্ত বার্তা এনে দেয়?

সুদক্ষিণা হেসে উঠল, হ্যাঁ, আমি বেতাল-সিদ্ধ, জান না, তুমি সে

কথা ? আমার কাছে কোন কথা চাপা থাকে না। তারপর শোন, তোমার পিতা তোমাকে শেষবারকার মত বললেন, প্রজার শান্তিতে রাজার শান্তি—রাজ্যের শান্তি। তোমাকে এই শিক্ষাই আমি দিয়ে গেলাম।

এখন বল, তুমি কি তোমার পিতার সেই শেষ আদেশ পালন করে চলেছ ?

পিতার মৃত্যুশয্যার সেই দৃশ্যটি এতদিনে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। এক নিমেষে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই ছবি। সুদক্ষিণার কথার কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

সুদক্ষিণাও আর কোন কথা বলল না, নিঃশব্দে তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বৃষকেতুর ভাগ্য ভাল। ঠিক সেই সময়ই ঘণ্টা বেজে উঠল। রাজসভার সময় হয়েছে, এটা তারই সঙ্কেত। বৃষকেতু হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বৃষকেতু চলে যাবার পর সুদক্ষিণা যে-ভাবে বসেছিল অনেকক্ষণ ধরে সেই একই ভাবে বসে রইল। নির্জনতার সুযোগ পেয়ে কত রকমের কত চিন্তা তার মাথায় এসে ভীড় জমাতে লাগল। হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠল সে। এ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল, এখানকার প্রজাদের সুখ-দুঃখ, কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে! তার সঙ্গে এ সবের সম্পর্কটা কি ? সে কি সত্য-সত্যই এ রাজ্যের কেউ ?

···প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন আপন জেনেই এসেছিল। পিতা বিদায়ের সময় অশ্রুভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, যেখানে যাচ্ছ, সেটাই তোমার আপন নিবাস। স্বামী আর শ্বশুরকুলের যারা তারাই তোমার সবচেয়ে আপন জন। আমরা তোমাকে পালন করেছিলাম মাত্র, তুমি এখন তোমার স্বস্থানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হও।

সে জানত পিতার এই কথাগুলি পুরোপুরি তাঁর অন্তরের কথা নয়। এ সমস্তই আনুষ্ঠানিক কথা। এ অবস্থায় সবাইকেই এই প্রচলিত কথাগুলি এমনি করেই বলতে হয়। স্নেহময় পিতার মনের

ভিতরকার আসল কথাটা সে নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছিল। সে জানত চোখের আড়াল হলেই পিতা কান্নায় ভেঙে পড়বেন। তার এই কোমলচিত্ত পিতার কথা মনে করে সেও আপনাকে কঠিন ভাবে সংযত করে রেখেছিল। যতক্ষণ কাছে ছিল, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না।

জন্মভূমির টান, সে যে কি টান, বুকের শিরাগুলি যেন ছিঁড়ে আসতে চায়। তবু সে মুখের হাসি নিয়েই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার ভিতরকার কান্নাটা কারু কাছে প্রকাশ করে নি। নিজের মনকে বুঝিয়েছিল, এ তো আমার একলার দুঃখ নয়, এ ব্যথা সব মেয়েকেই পেতে হয়। ভেবেছিল, আদর্শ আর্যকন্যাদের মত স্বামীর পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করবে, আর তাঁকেই সেবা করে আপনার জীবনকে চরিতার্থ করবে। মনে হয়েছিল, এই পথেই আসবে তার শান্তি।

কিন্তু কি দেখল এখানে এসে? কিছুদিন যেতে না যেতেই এখানকার রূপটা তার চোখে পড়ল। যে-দেশে সে জন্মেছিল আর যে-দেশ এখন তার আপন নিবাস, এ দু'য়ের মধ্যে যে বহু প্রভেদ। ও দেশ আর এ দেশের মানুষ, একই ধর্ম আচরণ করে, একই আর্য ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তবু এদের মধ্যে এত তফাৎ কেন? এই নতুন পরিবেশের মাঝখানে পড়ে মুক্ত বায়ুর অভাবে সে যেন ছটফট করে মরছিল! এখানে ভাল ঘরের মেয়েরা মুক্ত ভাবে ইচ্ছামত পথে বেরুতে পারে না। যাদের কোথাও যেতে হয়, তাদের জন্য শকটের ব্যবস্থা করতে হয়। আর সে ব্যবস্থা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তারা পথে বেরোয় না। নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা আর নষ্ট চরিত্রের মেয়েরাই স্বচ্ছন্দে পথে চলাচল করে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, রাজপ্রাসাদের মেয়েদের মনে এজন্য কোন দুঃখ বা বিক্ষোভ নেই। তারা নির্বিকার চিত্তে বলে, এইটাই তো রীতি। আমরা কি ইতর মেয়েদের মত পথে বেরোতে পারি?

সুদক্ষিণা যে-দেশের মাটিতে জন্মেছিল, সেখানে পুরুষ ও নারী অবাধে পথে চলাচল করে। সেজন্য কেউ তো কিছু বলে না। পুরুষ নারীকে বলে না, তুমি পথে বেরোতে পারবে না। নারীও পুরুষকে পথে চলতে বাধা দেয় না। পথ তো আর পরবার কাপড় নয় যে, পুরুষ এক রকম পথে চলবে আর মেয়ে আর এক পথে চলবে। পথ, কি পুরুষ কি নারী, সবার চলবার জন্যই, তার মধ্যে আবার ভেদ কিসের ?

তারা সখীরা দল বেঁধে উপবনে বিচরণ করত, সরোবরে জলকেলি করত, তাদের কলঝংকারে বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কেউ তাদের কণ্ঠরোধ করতে চাইত না। উৎসবের দিনে সবার সঙ্গে খোলা-খুলি মেলামেশা করত, কিন্তু সেজন্য কেউ কোনদিন প্রশ্ন তুলত না। মুক্ত আকাশের নীচে পথে চলার সহজ আনন্দ, সে আজ অতীতের স্বপ্ন। সে-সব কথা যখন মনে পড়ে, তখন এই রাজ-প্রাসাদকে একটা বিরাট গোশালার মতই মনে হয়। এখানকার মেয়েরা এক দল রজ্জুবদ্ধ গাভীর মত রোমন্থন করে চলেছে। সেই সোনার রজ্জুতে তাদের হাত, পা, কোমর আর গলা বাঁধা পড়েছে। অসহ্য মনে হয় সুদক্ষিণার।

কেন, এমন কেন ?

একদিন সে প্রশ্ন তুলেছিল বৃষকেতুর কাছে, কেন, এমন কেন ?

প্রশ্ন শুনে বৃষকেতু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। শেষে বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি ? আমাদের স্ত্রী, আমাদের কন্যা তারা বেরোবে পথে, সাধারণের দৃষ্টির সামনে ! আমাদের মান-মর্যাদা নেই ?

এ দেশের ভাষাই যেন আলাদা। এরা কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ করে, কিছুই বুঝবার জো নেই। সকলে যে-পথ দিয়ে চলে, মেয়েরা যদি সেই পথে যায়, তবে তাতে মান-মর্যাদার হানি কেমন করে ঘটতে পারে, সুদক্ষিণা অনেক ভেবেও এ কথা বুঝে উঠতে পারে না। এমন

কথা কারু মুখে সে কোনদিন শোনে নি। শাস্ত্রেও তো এমন কথা কোথাও বলা হয় নি।

আমাদের দেশে মেয়েরা তো আর সবার মতই পথে চলাচল করে। কই, তাদের মান-মর্যাদা তো খোয়া যায় না।

স্ত্রীলোকের মুখে যুক্তি-তর্ক বৃষকেতুর কোনদিনই ভাল লাগে না। সে একটু বিরক্ত হয়েই বলল, তোমরা হচ্ছ পূর্বদেশের লোক। তোমাদের চার দিকেই বর্বর জাতিসমূহের বাস। তাদের সঙ্গেই তোমাদের ব্যবহার। সেজন্যই সুসভ্য আর্য জাতির আচার-আচরণ ত্যাগ করে তোমরা তাদেরটা গ্রহণ করছ।

অপমানে সুদক্ষিণার রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা বর্বর। তারা আচারভ্রষ্ট। এমন কথাটা এত সহজে বলতে পারল বৃষকেতু! সঙ্গে সঙ্গেই একটা কঠিন উত্তর তার ঠোঁটের আগায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে সংযত করে নিল আপনাকে। না. স্বামী দেবতার মতই পূজ্য। তাকে কোন অবস্থাতেই এমন কথা বলা চলে না।

বিবাহের কিছু দিন বাদেই এই প্রথম একটু সংঘাত। সুদক্ষিণা কিছু দিন আপনাকে সামলে রাখল। তর্ক-বির্তকটা এড়িয়ে চলতেই চাইত। কিন্তু সেটা ওর ধাতে সয় না। ওর পিতা ওকে তেমন ভাবে তৈরি করে তোলেন নি। তিনি নিজে একজন বেদজ্ঞ লোক, কিন্তু পরমতঅসহিষ্ণু নন। তাঁর সভা ছিল বহু মত ও সম্প্রদায়ের লোকদের মিলন কেন্দ্র। তাঁর সভায় বেদজ্ঞেরা তো ছিলেনই, তা'ছাড়া লোকায়তিক, কাপালিক, গাণপত্য, শাক্ত, যোগপন্থী ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসত। তারা যার যার মত প্রতিষ্ঠার জন্য তর্কযুদ্ধে উদ্দাম হয়ে উঠত। রাজা এ বিষয়ে পরম উৎসাহী। তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সকল পক্ষের বক্তব্য শুনতেন। কিন্তু তিনি একাই নন। তাঁর কোল অধিকার করে বসে থাকত ছোট্ট মেয়ে সুদক্ষিণা। সবাই অবাক হয়ে দেখত, এইটুকুন মেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ঘাড় কাত করে তাদের কথা শুনছে।

এই সব শুনতে শুনতে সুদক্ষিণা বড় হয়ে উঠল। ওর আগ্রহ লক্ষ করে খুশি হয়ে রাজা ওকে শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। এর পর সুদক্ষিণা বেশী দিন নীরব শ্রোতা হয়ে রইল না, বিতর্কের মধ্যে সে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করল। আর এর মধ্য দিয়েই ওর শাস্ত্রজ্ঞান মার্জিত হয়ে উঠতে লাগল।

সেই মেয়ে আজ আটকা পড়েছে গোকর্ণ প্রদেশের রাজপ্রাসাদে। কিন্তু এখানে জ্ঞান-চর্চার সুযোগ নেই, তর্কযুদ্ধের আনন্দ নেই, এসব কথা বলতে গেলে প্রাসাদবাসিনী মেয়েরা নির্বোধের মত ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে থাকে। এখানে আছে শুধু স্থূল সম্ভোগের একঘেয়ে রোমন্থন। অরুচিতে মুখ ফিরে আসে তার। এমনি করেই কি তার জীবন কাটবে! কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! এই অবরুদ্ধ জীবনের মাঝখানেও সে নিজের একটা জগৎ গড়ে তুলতে চাইল। এই জগতের মাঝখানে সে তার স্বামীকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু দু'-একটি প্রশ্নোত্তর আর বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, বৃষকেতুর বিদ্যার ঘরে শূন্য, শাস্ত্র-বিচারের কোন জ্ঞানই তার নেই। একেবারেই শূন্য পাত্র। যেন প্রচণ্ড একটা ঘা পড়ল সুদক্ষিণার উপর। এমন স্বামীকে সে কেমন করে শ্রদ্ধা করবে? সে তার উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করে বার বার বলে চলল, হে দেবতা, আমি যেন আমার স্বামীকে অশ্রদ্ধা না করি। তুমি আমাকে এই দুর্গতি থেকে রক্ষা কর।

কিন্তু দেবতা কি করবেন, বৃষকেতু যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে যে, এই অশ্রদ্ধা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সে নিবৃত্ত হবে না। একদিন কথায় কথায় সে বলেই ফেলল, তোমার এটাই আমার ভাল লাগে না।

কোন্‌টা? প্রশ্ন করল সুদক্ষিণা।

স্ত্রীলোকদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম স্বামী-সেবা, মান তো?

কেন, আমি কি স্বামী-সেবা করি না?

হ্যাঁ, কর। কিন্তু যেটাতে তোমার অধিকার নেই, সেই ব্যাপারে হাত দিতে চাও কেন?

কেন, আমি কি করেছি?

শাস্ত্র-চর্চা স্ত্রীলোকের পক্ষে সঙ্গত নয়, এও কি তুমি জান না? স্ত্রীজাতির জন্য শাস্ত্র তৈরি হয় নি। আর তা-ই তোমার দিন রাত্রির জল্পনা। যার যতটুকু সয়, ততটুকুই ভাল। তার বেশী করতে গেলে অনর্থ ঘটে।

সুদক্ষিণার তর্কপ্রবৃত্তি উন্মুখ হয়ে উঠল। এমন একটা কথা সে নির্বিবাদে মেনে নিতে পারল না। নানা রকম শাস্ত্র, ইতিহাস ও জনশ্রুতি আহরণ করে সে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগল, কেমন করে নানা যুগের প্রজ্ঞাবতী আর্য মহিলারা তপস্যা করেছেন, শাস্ত্র-চর্চা করেছেন এবং নর-নারী নির্বিচারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন।

এসব কোন কথাই বৃষকেতুর মনকে স্পর্শ করতে পারে না। তার মুখের ভাব দেখেই সুদক্ষিণা সে কথা বুঝতে পারল। কঙ্করময় কঠিন ভূমিতে বীজ বুনলে সে বীজ কি কখনও অঙ্কুরিত হতে পারে? বৃষকেতুর মন সেই কঠিন অকর্ষিত ভূমির মতই। শাস্ত্রালোচনার হলকর্ষণ কোন দিনই সেখানে হয় নি।

বৃষকেতু বলল, এই সমস্তই বর্বর সমাজের সংস্পর্শের কুফল। বিশুদ্ধ আর্যরীতিকে ওরা দূষিত করে চলেছে। আর এই পবিত্র ঋত লঙ্ঘন করে চলবার ফলে দেবতারাও অপ্রসন্ন। তাই আগেকার দিনের মত প্রকৃতিও তার ঋতরক্ষা করে চলে না। সেজন্যই এত অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অজন্মা আর মহামারী।

এবার সোজাসুজি সুদক্ষিণাকে লক্ষ্য করে সে তার তীর ছুঁড়ল। শাস্ত্রের নাম করে তুমি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে চলেছ। শাস্ত্র-চর্চায় স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নেই।

কোন্ শাস্ত্রে আছে এ কথা? ফোঁস করে উঠল সুদক্ষিণা।

বৃষকেতু বিপদে পড়ে গেল। আন্দাজে কোন্ শাস্ত্রের নাম

করবে সে? তাই গা বাঁচাবার জন্য বলল, তুমি কি সমস্ত শাস্ত্রই জান?

না, জানি না। কিন্তু জানতে চাই। সেজন্যই আমার এই জিজ্ঞাসা।

বৃষকেতু একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যশাসন আর যুদ্ধ আমার বৃত্তি। শাস্ত্র নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করি না, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন মান্য করে চলি। সর্ব শাস্ত্রে যার অধিকার আছে, এমন লোকের কাছেই আমি এই কথা শুনেছি।

কে তিনি?

রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন!

উষস্তি চাক্রায়ন! এবার সুদক্ষিণার মুখে কোন উত্তর যোগাল না। এত বড় বেদজ্ঞ পণ্ডিত ক'জন আছেন? গোকর্ণ প্রদেশের সকলের কাছে তাঁর মুখের প্রতিটি বাক্য শাস্ত্রবাক্যের মতই পালনীয়। শুধু গোকর্ণ প্রদেশেই নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এই রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে তার পিতার রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই উষস্তি চাক্রায়ন এমন কথা বলেছেন! সুদক্ষিণার বিচারবুদ্ধি টলমল করে উঠল। কিন্তু তার পিতার রাজসভায় কত দূর-দূরান্তর থেকে কত শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রের কথা নিয়ে চুলচেরা বিচার চলত। কই, তাঁদের মুখে এমন একটা কথা কোনদিনই তো সে শোনে নি। আর নিজেও তো সে তাঁদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রালাপ করেছে। তাঁরাও তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য প্রশংসা করে তাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আর তার পিতা? তিনি তো তাঁর কন্যার কথা নিয়ে লোকসমাজে গর্ব করে বেড়াতেন।

সুদক্ষিণা উষস্তি চাক্রায়নের এই কথাকে না পারল গ্রহণ করতে, না পারল নিঃসংশয়ে প্রত্যাখ্যান করতে। তার মন দ্বন্দ্বসমাকুল হয়ে রইল। আর তার মনের গভীরে একটা প্রবল বিরুদ্ধতার ভাব দিনে দিনে জমে উঠল। এর পর একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলল, তাদের কেন্দ্র করে সেই জমাট বিক্ষোভটা পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে

লাগল। কোথায় ছিল উষস্তি চাক্রায়ন দূর আকাশের গায়ে এক জ্যোতিষ্কের মত, সুদক্ষিণার জীবনের সঙ্গে তার কোনই যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ঘটনার ঘাতাঘাতে হঠাৎ কেমন করে সে যেন আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে একেবারে তাঁর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ইন্দ্র-যজ্ঞের সময়। সারা রাজ্যের মানুষ হা বৃষ্টি, হা বৃষ্টি করে কেঁদে মরছে। এ দেশ নদীমাতৃক দেশ নয়, একমাত্র আকাশের মেঘের উপরেই নির্ভর। কিন্তু ইন্দ্রদেব অপ্রসন্ন হয়েছেন। রাজপুরোহিত ডেকে বললেন, রাজা, দেখছ কি! ইন্দ্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। নইলে শ্মশান হয়ে যাবে দেশ।

রাজা বলল, ঠিক কথা। মহা আড়ম্বরে যজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

যজ্ঞের আগের দিন রাজপুরোহিত নির্দেশ দিলেন, রাজা, রানীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো।

কিসের অনুমতি? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল রাজা।

রানীর অনুমতি। মুখ্যা পত্নীর অনুমতি ছাড়া যজ্ঞক্রিয়া সুসিদ্ধ হয় না।

রানীর অনুমতি? এ কেমন কথা? স্বামী হয়ে আমার স্ত্রীর কাছে আমি অনুমতি চাইতে যাব? আপনি আমাকে এমন আদেশ করবেন না।

রাজপুরোহিত হেসে বললেন, এ তোমার-আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা নয় রাজা। এ শাস্ত্রের বিধান। মানতেই হবে।

শাস্ত্রের বিধান, মানতেই হবে। শাস্ত্র গভীর রহস্যের উৎস, মহা-সমুদ্রের মত তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, হিতাহিত বিবেচনা সবকিছু এখানে অচল। অপৌরুষের শাস্ত্র যুগযুগান্ত ধরে অপ্রতিহত প্রতাপে তার বিধান চালিয়ে আসছে। প্রশ্ন করে সেখানে উত্তর পাওয়া যায় না, মাথা নুয়ে মেনে নিতে হয়। কি করবে রাজা! মুখ্যা পত্নী সুদক্ষিণার কাছে অনুমতি চাইতেই হোল।

সুদক্ষিণা একটু মধুর হাসি হেসে বলল, যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যজ্ঞক্ষেত্রে তোমার পাশেই তো আমার স্থান, আবার পৃথকভাবে অনুমতি চাইবার প্রয়োজন কি? এটা বুঝি এখানকার রীতি? স্বামী আর স্ত্রী-যে অভিন্ন এজন্যই তো স্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী। কিন্তু স্বামী এ রকম ভেদদৃষ্টি নিয়ে অনুমতি চাইতে আসবেন কেন?

সুদক্ষিণার কথা শুনে বৃষকেতু যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে একটু উত্তেজনার সুরে বলে উঠল, এ তুমি বলছ কি? তুমি যাবে যজ্ঞক্ষেত্রে, আর আমার পাশে বসে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করবে, এ কখনও হয় নাকি? কোন দিন হয়েছে?

এবার বিস্মিত হবার পালা সুদক্ষিণার। সে একটু সময় বৃষকেতুর মুখের দিকে চেয়ে তার বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন করবার চেষ্টা করে শেষে বলল, তুমি কি যে বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এ কাদের মধ্যে এসে পড়লাম! যজমান যজ্ঞ করবে আর তার পত্নী তার পাশে উপস্থিত থাকবে না, সে যজ্ঞ কেমন যজ্ঞ? যজ্ঞানুষ্ঠান কি ছেলেখেলা? যা খুশি একটা করলেই হোল? তার কোন বিধি-বিধান নেই? যজ্ঞের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থা থেকে তিলমাত্র ভ্রষ্ট হলে তোমার অকল্যাণ, আমার অকল্যাণ, সমস্ত রাজ্যের অকল্যাণ।

বৃষকেতু সুদক্ষিণার উত্তেজনা দেখে একটু নরম হয়ে বলল, কি হয়েছে, তুমি অনর্থক এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে কেন?

অনর্থক? অনর্থক তুমি বলছ একে? তুমি যজ্ঞ করবে, আর তোমার পাশে যদি আমার স্থান না থাকে, তবে কিসের আমি সহধর্মিণী? স্বামী আর স্ত্রী, এ কি শুধু কথার কথা মাত্র? দাম্পত্য সম্বন্ধ, সে কি শুধু দৈহিক সম্বন্ধ? যেখানে আত্মার মিলন নেই, যে-মিলন হোমাগ্নির পবিত্র শিখায় উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে না, সেই মিলনের মূল্য কি? এ মিলন তো পশুপাখির মধ্যেও দেখা যায়। তবে মানুষ আর পশুপাখিতে প্রভেদ কোথায়?

কি যে বলে সুদক্ষিণা, বৃষকেতু তার অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। এমন উদ্ভট কথা সে আর কারু মুখে কোন দিন শোনে নি। সুদক্ষিণা তো একাই মেয়ে নয়, আরও কত মেয়ে আছে সংসারে, কিন্তু এমন মেয়ে কোথাও সে দেখে নি। কি বলে তার উত্তর দেবে, সে কথা খুঁজে পায় না।

একা পুরুষ সন্তান উৎপাদন করতে পারে? প্রশ্ন করল সুদক্ষিণা।

না।

একা নারী সন্তান উৎপাদন করতে পারে?

না।

তবেই বোঝ, পুরুষ আর নারী উভয়ে সঙ্গত হলে তবেই সন্তানের সৃষ্টি সম্ভব।

ক্ষেত্র ছাড়া বীজ কি কখনও শস্য জন্মাতে পারে? আবার প্রশ্ন করল সুদক্ষিণা।

না।

ক্ষেত্র কি কখনও আপনা থেকে শস্য জন্মাতে পারে?

না।

তবেই বোঝ। ক্ষেত্র আর বীজের অঙ্গাঙ্গী সহযোগের মধ্য দিয়েই শস্যের সৃষ্টি সম্ভব। অরণি কাষ্ঠযুগলের মধ্যে একা পুরুরবা কি কখনও পবিত্র অগ্নিকে জাগ্রত করতে পারে? আবার প্রশ্ন করল সুদক্ষিণা।

না।

একা উর্বশী কি কখনও পবিত্র অগ্নিকে জাগ্রত করতে পারে?

না।

তবেই বোঝ, পুরুরবা আর উর্বশী এই অরণি কাষ্ঠযুগলের সংঘর্ষের ফলেই অগ্নিশিখার সৃষ্টি। এটাই সৃষ্টির বিধান। একা পুরুষ বা একা নারীকে দিয়ে সৃষ্টি সম্ভব নয়। সেজন্যই প্রজাপতি আপনাকে পুরুষ ও নারী এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এটাও

প্রজাপতির বিধান যে, স্বামী আর স্ত্রীকে যুক্তভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হবে। তা না হলে যজ্ঞ হবে নিষ্ফল। শুধু-যে নিষ্ফল হবে তাই নয়, যজ্ঞবিধি ভঙ্গের পাপ বজ্রের মত এসে ভেঙে পড়বে যজমান, তার পোষ্যবর্গ আর স্বজনদের উপর।

বৃষকেতু অবিশ্বাসের সুরে বলল, যত সব মনগড়া কথা তোমার। গোকর্ণ প্রদেশে চিরকাল যজ্ঞ হয়ে আসছে, কোন দিন এমন কথা শুনি নি। এখন তোমার কাছে নতুন কথা শুনতে হবে!

এ কথা আমার কথা নয়, এ কথা শাস্ত্রের কথা। কেন, যজ্ঞের স্বর্গারোহণ অনুষ্ঠানের কথাও কি তোমার জানা নেই? এই অনুষ্ঠানের সময় যজমান ও তার স্ত্রীকে যজ্ঞভূমিতে সংলগ্ন সিঁড়ি দিয়ে ধাপের উপরে উঠতে হয়। যজমান এগিয়ে যায়, তাকে অনুসরণ করে চলে তার স্ত্রী। যজমান সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েই পিছনে ফিরে তার অনুসরণকারিণী পত্নীকে আহ্বান করে: হে পত্নী, এসো, আমরা স্বর্গে আরোহণ করি। তখন তার পত্নী দু'পা এগিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ, স্বামী, চলো আমরা আরোহণ করি। কেন, তারা এ কথা বলে কেন? এই জন্য বলে যে, পত্নী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। যার পত্নী নেই এবং যত দিন পর্যন্ত সে তার আপন পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন না করে, তত দিন সে অসম্পূর্ণ। পত্নীর সাহচর্য ছাড়া তার যজ্ঞ কখনোই সুসিদ্ধ হতে পারে না।

সন্দেহের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বৃষকেতু বলল, কোথায় আছে এমন কথা?

তার এই সন্দিগ্ধ প্রশ্নে উষ্ণ হয়ে সুদাক্ষণা উত্তর দিল, শ্রুতিতে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? কি বলতে চাও তুমি খুলেই বল, শ্রুতিতে নেই?

শ্রুতিতে আছে কি নেই, এমন কথা জোর করে কি করে বলবে বৃষকেতু। সে তার সেই পুরানো কৌশলই আবার ব্যবহার করল। বলল, আমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ আমার বৃত্তি। শাস্ত্র-বিচার

করা আমার কাজ নয়। সেই অনধিকার চর্চা আমি করতেই বা যাব কেন? সেজন্য রাজপুরোহিত আছেন, ঋত্বিকেরা আছেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আছেন। কোন্‌টা শাস্ত্রোচিত, সেটা তাঁরাই বিচার করবেন।

সুদক্ষিণা বলল, বেশ, তোমার যদি কোন কথা বলবার না-ই থাকে, তোমাদের রাজপুরোহিতকে বল, তিনি-ই আমার এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করে দিন।

বৃষকেতু ভেবে দেখল, সুদক্ষিণার এই কথাটা একেবারে অবহেলা করে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। যজ্ঞে সুদক্ষিণার অনুমতি চাই যে। রাজপুরোহিত তো বলেই দিয়েছেন যে, মুখ্যা পত্নীর অনুমতি ছাড়া যজ্ঞক্রিয়া সুসিদ্ধ হয় না। সেজন্যই সে একটু আপোসের সুরে বলল, আচ্ছা, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসব।

না না, জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা নয়, আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, আর তাঁর নিজের মুখ থেকেই এর উত্তর চাই।

আচ্ছা, আচ্ছা, বৃষকেতু তখনকার মত সেখান থেকে সরে পড়ল। সুদক্ষিণার সঙ্গে কথা বাড়ালেই ঝামেলা। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে এখন আর সে তার সামনে এসব বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে কথা তুলতে চায় না। কেন না, ওর মধ্য দিয়ে তার অজ্ঞতা পদে পদেই ধরা পড়ে যায়। আমি ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রালোচনা আমার কাজ নয়, এসব কথা মুখে বললেও এতে ঠিক মুখরক্ষা হয় না, এটুকু সে বোঝে।

কথাটা কেমন করে প্রাসাদময় ছড়িয়ে পড়ল। প্রাসাদবাসিনী মেয়েরা সবাই এই নিয়ে কাণাকাণি করে। কেউ বলে, ও মা, কি দুঃসাহসের কথা গো! মেয়েমানুষ হয়ে যজ্ঞস্থানে গিয়ে মন্ত্র করবে, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনদিন! তা'ছাড়া কত রকমের কত লোক এসে ভিড় করবে সেখানে. রাজরানী তাদের মাঝখানে গিয়ে বসবে, তার একটা মানসম্মান নেই! কেউ বলল, বড শক্ত মেয়ে।

ভয়-ডর নেই, দেখ না, রাজার সঙ্গে কেমন চটাস্ চটাস্ করে কথা বলে। গোঁ যখন একবার ধরেছে, সহজে ছাড়বে না।

কিন্তু যত শক্ত মেয়েই হোক, গোঁ ছাড়তেই হোল। সেই দিনই বৃষকেতু রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়নের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে ফিরল। তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানিয়েছেন, যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপারে পত্নীদের অংশ গ্রহণের বিধান নেই। তাদের মৌখিক অনুমতিটুকুই প্রয়োজন। আর স্ত্রীজাতীয়াদের সঙ্গে তিনি কখনও শাস্ত্রালোচনা করেন না। শাস্ত্রালোচনা স্ত্রীজাতির অধিকার-বহির্ভূত কাজ।

অপমানে সুদক্ষিণার মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু এর কোন প্রতিবিধান নেই। প্রাসাদের মেয়েরা এই নিয়ে হাসাহাসি করছে, এ কথাও তার অজ্ঞাত রইল না। তার নিজের অবস্থাটা আজ তার কাছে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল। রাজপ্রাসাদের বসনে-ভূষণে সাজানো পুতুলগুলির মাঝে সেও একটি পুতুল। রাজা বৃষকেতুর মুখ্যা রানী, ভবিষ্যৎ নৃপতি শিশু চন্দ্রকেতুর মা—এই মহিমার মোহ আজ তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারছে না। স্ত্রীজাতীয়া বলে শাস্ত্রালোচনা তার অধিকার-বহির্ভূত কাজ। এটাই উষস্তি চাক্রায়নের চূড়ান্ত ঘোষণা। এর বিরুদ্ধে একটি কথা বলবার সুযোগ তার নেই। অথচ পিত্রালয়ে থাকতে অবাধে শাস্ত্রালোচনা করেছে সে। কত জায়গা থেকে কত মতের, কত পথের শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানরা এসেছেন। কত সময় সে তাদের সঙ্গে মুখোমুখী তর্ক করেছে, কত সময় বালিকাসুলভ জিদের বশে ভ্রান্ত যুক্তি আঁকড়ে ধরে থেকেছে, তাঁদের যুক্তিতে কান পাতে নি, সময় সময় হয়তো ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাঁরা প্রশ্রয়ের হাসি হেসে তাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। কোন দিন কেউ শাস্ত্রের হুমকি দিয়ে এমন করে তার মুখ বন্ধ করে দিতে চায় নি।

যজ্ঞের অনুমতি সে দিয়ে দিল। কিন্তু এ তো অনুমতি চাওয়া নয়, এ যেন অনুমতি ছিনিয়ে নেওয়া। এ তো অনুমতি দেওয়া নয়, এ যেন তার অধিকার হরণকে মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া।

তাই তাকে নিতে হয়েছে। আজই সে প্রথম বুঝতে পারল, কত অসহায় সে। গোকর্ণ প্রদেশে আসবার পর থেকে ওর পথে চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর এখন ওরা তাকে ধর্মাচরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। এ সম্পর্কে কথাটুকু পর্যন্ত বলতে দেবে না। একটা একটা করে ওর দুটো ডানাই ওরা মুচড়ে ভেঙে দেবে। কিন্তু সুদক্ষিণা নিজের মধ্যেই অনুভব করতে লাগল, সে নির্জিতা হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে নি, করবেও না। ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি নয়, তার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। দু'দিন আগে হোক, পরে হোক উষস্তি চাক্রায়নের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হবেই। এ বোঝাপড়ার রূপটা কেমন, সেই ধারণা তার কাছে স্পষ্ট নয়, কিন্তু কিছু একটা আসছেই। বৃষকেতুর উপর তার কোন অভিযোগ নেই। ঘটনার পর ঘটনার মধ্য দিয়ে এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে যে, উষস্তি চাক্রায়ন বৃষকেতুকে স্বরচিত পথে ইচ্ছামত পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে। সে-যে করুণার পাত্র, তাকে রাজপুরোহিতের হাত থেকে উদ্ধার করাটাই প্রথম কথা। অভিযোগের কথা ওঠেই না।

ইন্দ্র-যজ্ঞের উপলক্ষ করে শূদ্র কর্ষকদের বলির ভাগ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করে নেবার গোপন অভিসন্ধিটা রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে। সেই পথ বেয়ে বেয়ে কথাটা সুদক্ষিণার কাছেও এসে পৌঁছেছে। এর মধ্য দিয়েই রাজপুরোহিতের স্বরূপটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বুড়ো মন্ত্রী এবং আরও কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে মনে এই বলিবৃদ্ধির ঘোর বিরোধী। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও তাঁদের মনে দাগ কেটে আছে। কাজেই শুধু মনে মনে নয়, মৃদু আপত্তিও তাঁরা জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাজপুরো-হিতের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা মাথা তুলতে পারে নি। মন্ত্রী প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোক, তিনি জানেন রাজা আর তার পার্ষদদের উপর রাজপুরোহিতের অসীম প্রভাব। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতিবাদের স্বরটা

বেশী উঁচুতে তুলতে গেলে রাজার অসন্তোষের ভাজন হতে হবে এ আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল। সেজন্যই একটু আপত্তি তুলেই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি থেমে গেলেন।

ইতিমধ্যে সুদক্ষিণার চরিত্রের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। এতদিন প্রাসাদের মধ্যেই সে আপনাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, এবার একটু ভ্রমণ-বিলাসী হয়ে উঠল। আজকাল রাজশকট প্রায়ই তাকে আর তার শিশুপুত্র চন্দ্রকেতুকে নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মহিলারাও আমন্ত্রণ পেয়ে রাজপ্রাসাদে আসে। তার গুণে সবাই মুগ্ধ। কিছুদিনের মধ্যেই তার সুনাম প্রচারিত হয়ে গেল, রানীর অহঙ্কার-গরিমা নেই। সবার সঙ্গে সমান ভাবে মেশে। বৃষকেতু এসব দেখে-শুনে মনে মনে খুশিই হোল—বেশ তো, যাগ-যজ্ঞ আর রাজকার্যের মধ্যে মাথা না ঢুকিয়ে এইসব আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মেতে থাকুক না, সেই তো ভাল।

বৃষকেতু চলে যাবার পর সুদক্ষিণা মনে মনে ভাবতে বসল, এটা কি ভাল হোল? বলিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এতগুলি কথা বলে ফেলার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় কেমন করে কথাগুলি বেরিয়ে গেল। এই কথার সবগুলিই কি রাজপুরোহিতের কানে গিয়ে পৌঁছবে? তা যদি হয়, খুবই খারাপ কথা। কিন্তু বৃষকেতু-সম্পর্কে তার মনে মনে একটা ধারণা হয়েছে যে, সামনে মুখে যা-ই বলুক না কেন, বাইরে কারু কাছে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না। তা'ছাড়া এটাও সে লক্ষ করেছে, রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়নকে সে ভক্তি-শ্রদ্ধা যতটা না করে, ভয় করে তার চেয়ে বেশী। কাজেই এসব কথা তাঁর কাছে গিয়ে খুলে বলবে, সেই আশঙ্কা কম।

রানীমা, তোমার প্রসাধনের সময় হয়েছে। প্রসাধনের উপকরণাদি নিয়ে দাসী আজুলি এসে দাঁড়াল।

চিন্তার বোঝাটা জোর করে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে

সুদক্ষিণা একটু হেসে বলল, আয়, বোস্। কি লো আজুলি, এত দেরি করলি যে? বেলা কি আর আছে!

দেরি কি আর আমি করেছি! আগে আরও একবার এসেছিলাম। এসে দেখি তুমি কি যে চিন্তা করছ! আমি ঘরে ঢুকলাম, তোমার কাছে গেলাম। কিন্তু তুমি টেরও পেলে না। তুমি ঘুমোচ্ছ না ভাবছ কিছুই বুঝতে না পেরে আমি গুটি গুটি পা'য়ে চলে গেলাম। এখন আবার এসেছি।

দূর বোকা, ডাকলি না কেন?

আজুলি সুদক্ষিণার চুলগুলি নিয়ে বিন্যাস করতে বসল। এত ঘন অপর্যাপ্ত চুল, মুঠোর মধ্যে ধরা দিতে চায় না। কেমন করে কোন্ কৌশলে তাদের বাগ মানাতে হয় এ রহস্য আজুলির ভাল করেই জানা আছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রানীদের প্রসাধন আর পরিচর্যার বিদ্যাটা তার আয়ত্ত হয়ে গেছে। সেও যেন রানীদের কাছে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসাধনের সময় হাতও যেমন চলে, মুখও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। গল্প জমে উঠবেই। বুঝি অঙ্গসজ্জার নিয়মই তাই। গল্পে গল্পে কর্ত্রী আর সেবিকার ব্যবধানটা কেটে যেতে থাকে। অনুচরী যেন সহচরী হয়ে দাঁড়ায়।

আর দু' মাস বাদেই চলে যাচ্ছি মা।

সে কি রে, কোথায় যাবি? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সুদক্ষিণা।

কেন, আমার ঘরে!

ঘরে তো রোজই যাস্। সেটা আবার নতুন কথা কি?

সে তো যাই সন্ধ্যা বেলায়, আবার সকাল বেলাই ফিরে আসতে হয়। তখন একেবারেই যাব, আর তো আসতে হবে না। আর দু' মাস বাদেই আমার এক বছর পূর্ণ হয়ে যাবে যে।

সুদক্ষিণা কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, এক বছর! সে কি রে?

ও মা, তুমি জান না! আমি তো এক বছরের মেয়াদেই এসেছিলাম। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আর থাকব কেন?

কেন থাকবি না? তুই চিরদিন এখানে থাকবি, কে তোকে তাড়াতে চাইছে?

তাড়াবে কেন গো? হেসে উঠল আজুলি। তুমি বুঝি এ খবর রাখ না? আমি কি নিজের ইচ্ছায় এসেছিলাম? সে বছর অজন্মা দেখা দিল। পোকায় কেটে ফসল শেষ করল। যে-সামান্য ফসল উঠল, তাতে খাওয়াই চলে না, রাজার বলি কেমন করে দেব? রাজার লোক এসে চাপ দিল, রাজার পাওনা শোধ কর।

আমরা বললাম, কেমন করে শোধ করব গো, এদিকে আমরা-যে না খেয়ে মরে গেলাম।

ওরা বলল, সে কথা বললে কি আর চলে! রাজার ঋণ শোধ করতেই হবে।

ওরা পথটাও বাতলে দিল। আমার স্বামীকে বলল, রাজার বাড়িতে কাজের জন্য একটা দাসী চাই। তোমার বউটাকে দাও, এক বছর কাজ করে রাজার পাওনাটা শোধ করে দিক। আর সেই এক বছর রাজবাড়ির খানা খেয়ে একটু মোটা তাজা হয়ে ফিরে আসবে। এমনিতে তো না খেয়ে না খেয়ে শুঁটকি ধরেছে। এভাবে আর ক'দিন বাঁচবে?

আমার স্বামী কি আর রাজি হতে চায়! বাইরের কাজকর্ম, ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে—একা মানুষ কেমন করে সব দিক সামলাবে! কিন্তু তার কথা শোনে কে! ওরা আমাকে যেন হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এল। ছেলেমেয়েগুলি পেছন পেছন ছুটল আর আছাড়-পিছাড় খেয়ে কেঁদে মরতে লাগল। আমি পেছন ফিরে দেখি, আর বুকটা যেন ফেটে যায়, কিন্তু করব কি!

সুদক্ষিণার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, আহা শূদ্রদের বড় কষ্ট তো। কিন্তু উপায় কি, শূদ্র হয়ে জন্মেছে যখন, কষ্ট তো

পেতেই হবে। যে যার পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভোগ করে চলেছে। এর আর প্রতিকার কি!

একটু সান্ত্বনার সুরে সে ওকে বলল, তোরই বা এত আফশোস কিসের! রোজই তো গিয়ে ওদের দেখে আসছিস্।

আজুলি মাথা নেড়ে উত্তর দিল, সে তো ঠিক কথাই। কিন্তু তাতেই কি আর মন ভরে! আমার ঘর, আমার সংসার, আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, সবই আছে আমার, কি নেই? অথচ সব থেকেও আমার হাতের বাইরে। সময় সময় মনটা এমন খাঁ খাঁ করে ওঠে। সকাল বেলা ফিরে আসবার সময় পা যেন আর চলে না।

সুদক্ষিণা যেন তখনও কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। আজুলি এখানকার পক্ষে একান্ত ভাবে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে বলল, হ্যাঁ লো আজুলি, তুই সত্য-সত্যই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? একটু কষ্টও হবে না তোর?

আজুলি যদি মুক্তি পেত, ওই মুহূর্তেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত ওর ঘরের দিকে। একবার পেছন ফিরেও তাকাত না। কিন্তু মনের কথা সবই কি আর মুখ ফুটে বলা যায়? সে তার গলাটা একটু ভার-ভার করে বলল, কষ্ট কি আর হবে না মা, খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু কি করব বল, সংসার-যে আমার নাশ হয়ে গেল। পুরুষ মানুষ, সে কি আর সব দিক সামলে চলতে পারে!

কেন রে, তোর পুরুষ মানুষের আর কোন বউ নেই? তুই একাই?

আজুলি অবাক হয়ে গেল এই প্রশ্ন শুনে। বলল, আর বউ? বল কি গো? একটা পুরুষের আবার ক'টা বউ থাকবে! আমি বেঁচে থাকতে আর একটা বউ নিয়ে আসবে—এতই সাহস!

একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল সুদক্ষিণা।

কেন, সব পুরুষেরই কি মাত্র একটা করে বউ থাকে? এর বেশী থাকে না? দেখিস্ নি তুই কখনো?

আজুলি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে জিভ কেটে বলল, সে হোল

তোমাদের বড় ঘরের কথা। আমাদের ছোটলোকের মধ্যে ওই নিয়ম চলে না।

চলে তো না, বুঝলাম, কিন্তু তোর স্বামী যদি আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েই আসে, কি করতে পারিস তুই? তুই তাকে আটকে রাখতে পারবি?

আর একটা মেয়ে নিয়ে আমার সংসারে এসে উঠবে! ওঃ, এতই সাহস' আসুক না দেখি একবার। ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে নামাব।

ঘর তার, বাড়ি তার, সে-ই তোকে উপায় করে খাওয়ায়, তার জোরেই তুই বেঁচে আছিস্' তুই তাকে ঝেঁটিয়ে নামাবি? তোর আস্পর্ধা কম নয় তো?

ওঃ, ঘর তার, বাড়ি তার, কি ঘরবাড়িওয়ালা রে! ঘরবাড়ি সে কি তার মা'র পেট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল? আর সে আমাকে খাওয়াবে কেন? আমি কি বসে বসে খাই? ক্ষেতও আমাদের, খামারও আমাদের সেও খাটে, আমিও খাটি, সেও খায়, আমিও খাই। আমিও তাকে খাওয়াই, সেও আমাকে খাওয়ায়।

সুদক্ষিণা হাসিমুখেই কথা বলছিল। কিন্তু মুখেই হাসি, ভিতরে হাসির আভাটুকু ক্রমেই মিলিয়ে আসছে। আজুলির কথাগুলি যেন নতুন একটা জগতের আভাস বয়ে আনছে, যে-জগতের সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

কিন্তু ক্ষেতে কাজ করে কে? চাষ করে কে? ফসল ফলায় কে? তোর পুরুষ, না তুই? তোর পুরুষ যদি না দেয়, তোর খাবার আসবে কোত্থেকে শুনি?

সুদক্ষিণার অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে আজুলি উত্তর দিল, এসব বলছ কি তুমি? ওরাই শুধু ক্ষেতে কাজ করে, আমরা করি না? ওরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে, আমরা মাটি ভেঙ্গে গুঁড়ো করি, আগাছা বাছি। ওরা কুয়ো খোঁড়ে, আমরা তার জল টেনে টেনে মাটি ভিজাই। ওরা বীজ বোনে, আর সেই বীজ থেকে যখন চারা হয়ে

ওঠে, আমরা ওদের আগাছা থেকে মুক্ত করে দিয়ে শিশুর মতই যত্নে পালন করি। তারপর ফসল যখন পেকে ওঠে ওরাও কাটে, আমরাও কাটি। ওরা শস্য মাড়াই করে, আর আমরা ঢেঁকিতে কুটে, তুঁষ ঝেড়ে শস্যের দানাগুলি বার করি। এইভাবে ওরা আর আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করি, হাতে হাতে কাজ করি।

সুদক্ষিণার কাছে এসব নতুন কথা, সবই অভিনব। তার বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না।

তোরা খোলা মাঠের মাঝখানে সবার চোখের সামনে পুরুষের সঙ্গে একত্র মিলে এসব পুরুষালী কাজ করিস্, এতে লোকে নিন্দে করে না, হাসে না, বিদ্রূপ করে না ?

বা রে, হাসবে কেন ? নিন্দে করবে কেন ? কাজের মধ্যে নিন্দের কি আছে ? কাজ যারা করে না, লোকে তাদেরই নিন্দে করে।

সুদক্ষিণা মনে মনে ভাবছিল, মেয়েমানুষের এ কেমন রীতি ! পুরুষে আর মেয়েতে কোনই প্রভেদ নেই, অধিকার অনধিকার বোধ নেই এ কেমন এক সমাজ ! ওরা শাস্ত্রও মানে না, সমাজশৃঙ্খলাও মানে না, তবে ওরা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে ! এজন্যই তো ওদের বর্বর বলে। ওরা মানুষ হয়েও পশুর ধারাই অনুসরণ করে চলে।

পুরুষেরা তোদের বাধা দেয় না ? বলে না, তোমরা ক্ষেতের কাজে এসো না, এ কাজ তোমাদের নয় ?

বা রে, এমন কথা বলবে কেন ? আমরাও তো তাদের এ কথা বলি না যে, তোমরা ক্ষেতের কাজে এসো না, এ কাজ তোমাদের নয়। তারাই বা বাধা দেবে কেন ? আমরা মিলে-মিশে কাজ করি।

এসব কথা ভাল নয়। এসব রীতি শাস্ত্রানুমোদিত নয়। কিন্তু তা হলেও 'আমরা মিলে-মিশে কাজ করি' কথাটি ভারী মিষ্টি লাগল ওর কানে। এর পূর্ণ তাৎপর্যটুকু বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কথা-

টাকে সে আমলও দিতে চাইল না, কিন্তু তবু কথাটা তার মনের মধ্যে লেগে রইল।

আরও এক প্রশ্ন ছিল সুদক্ষিণার মনে। কিন্তু এই শাস্ত্র বর্জিত, যথেচ্ছাচারী, বিবেকশূন্য সম্প্রদায়ের কাছে এ প্রশ্ন তুলে লাভ কি? তারা কি এই প্রশ্নের সমাধান দিতে পারবে? কিন্তু তবু—তবু সে সেই প্রশ্ন তুলল, তোরা কি দেবদেবীর পূজো-আর্চা করিস্?

করি না তো কি। দেবদেবীরা প্রসন্ন না হলে কোন কাজই তো সফল হয় না।

পুজো বুঝি শুধু পুরুষরাই করে?

না, না, তা কেন হবে? মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে পুজো করে।

পুরুষরা কোন বাধা দেয় না?

বাধা? বাধা দেবে কেন? মেয়ে-পুরুষ পূজো আর উৎসবে সবাই যোগ দেয়। সবাই যদি না থাকে, সে পূজো কেমন পূজো?

সুদক্ষিণা ভাবতে লাগল। আজুলি আজ তাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। চিন্তা জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে লাগল। শাস্ত্রে শাস্ত্রে লাঠালাঠি আর কাটাকাটি। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বিচার করে বলা বড় কঠিন। আজুলিদের সমাজে পুরুষেরা মেয়েদের ছোট করে দেখে না, পুরুষ আর মেয়েরা মিলে-মিশে কাজ করে, আর মিলে-মিশে পূজো ও উৎসব করে। কেউ কাউকে সরিয়ে দিতে চায় না। এই কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু ওরা-যে বর্বর।

প্রসাধনের কাজ কখন শেষ হয়ে গেছে! আজুলি কাজ শেষ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে। সুদক্ষিণা তখনও বসে বসে ভাবছে।

পাঁচ

সুদর্শন বরুণ দেবের বন্দনা করছিল ঃ

হে বরুণ, তোমাকে বন্দনা করি।

বৃক্ষের শীর্ষে শীর্ষে তুমি প্রবাহিত করে নিয়ে চল বায়ুস্রোতকে। স্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চারিত কর তুমি, অশ্বে যোগাও প্রবল গতিবেগ।

তুমি চিত্তে স্থাপন কর বুদ্ধিকে, আর জলগর্ভ মেঘের বুকে সঞ্চালিত কর চলমান অগ্নিশিখাকে। তুমি আকাশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছ সূর্যকে, আর মেঘকে প্রতিষ্ঠিত করেছ পর্বত শিখরে। হে বরুণ, তোমাকে বন্দনা করি।

তুমি তোমার পূর্ণ জলভাণ্ডকে উপুড় করে ঢাল, আর আকাশের পথ বেয়ে পৃথিবীর বুকে জলধারা বর্ষিত হয়। সেই জল পান করে আমাদের ক্ষেত্রের যবাঙ্কুরগুলি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতৃ-দুগ্ধের জন্য লালায়িত, তেমনি পৃথিবী যখন তৃষ্ণাকুল হয়ে ওঠে, তখন তোমার আদেশে পর্বতেরা জলভরা মেঘগুলিকে আকর্ষণ করে আনে, আর প্রবল পরাক্রমশালী মরুৎগণ সেই মেঘগাভীর দুগ্ধ দোহন করে পৃথিবীর তৃষ্ণা মিটায়। হে বরুণ, তোমাকে বন্দনা করি।

হে মহিমময় বরুণ, হে অবিনশ্বর প্রভু, আমি তোমার অপার মায়ার গুণগান গাইব। তুমি ঊর্ধ্বে মহাকাশে অবস্থিত হয়ে তোমার মায়ার বলে সূর্য আর পৃথিবীকে তোমার তৌলযন্ত্রে পরিমাপ করছ। হে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, তোমার এই অব্যর্থ মায়াজাল কে প্রতিরোধ করতে পারে! তোমার জাদুমন্ত্রের তীব্র আকর্ষণে নেমে আসা জলধারা মৃত মাটির বুকে প্রাণ সঞ্চার করে। তোমার ইঙ্গিতে জলভারে উচ্ছল নদীগুলি সমুদ্রের বুকে সেই জলরাশি উপঢৌকন দেয়। হে বরুণ, তোমাকে বন্দনা করি।

যদি আমরা কখনও বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ভাই, বন্ধু, সাথী, প্রাতিবেশী বা বিদেশী যারা আমাদের প্রতি প্রীতিভাব পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পাপ কার্য করি, তবে তুমি আমাদের সেই পাপ-পথ থেকে নিবৃত্ত কোরো। হে বরুণ, তোমাকে বন্দনা করি।

বন্দনা শেষ করে সুদর্শন উঠে দাঁড়াল। উঠেই দেখল তার পত্নী বসুমতী কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কি দেখছ অমন করে? একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

বসুমতী উত্তর দিল, দেখছি, সবই তোমার উল্‌টো। কেউ যা করে না, তুমি তাই কর, আর সবাই যা করে তুমি তা কর না। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

কেন, কি হয়েছে?

এত লোক দেখি, কই তারা তো কেউ বরুণ দেবকে নিয়ে এমন করে মেতে থাকে না। তারা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে, অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে, সোমের কাছে প্রার্থনা করে, অশ্বিনীকুমার যুগলের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু তুমি তাদের মানতেই চাও না। এতদিন ধরে দেখছি কিন্তু একদিনও শুনলাম না তাঁদের নাম স্মরণ করতে।

সুদর্শন হেসে উত্তর দিল, সকল দেবের অধিপতি বরুণদেব। একা তাঁকে বন্দনা করলেই সকলের বন্দনা হয়ে যায়। তাঁর মধ্যেই সবার স্থান, তাঁর বাইরে কেউ নেই। কিন্তু বসুমতী, আমি তো তবু এক-জনকে বন্দনা করি, তুমি তো কাউকেই কর না। কেন কর না? তুমি কি কাউকেই মান না?

ছি ছি, মানব না কেন? তোমার বন্দনাতেই আমার বন্দনা হয়ে যায়।

সে কেমন কথা, আমি খেলে তোমার পেট ভরবে?

তোমার সবই উল্‌টো কথা। কিসের মধ্যে কি! খাওয়া-দাওয়া আর ধর্মাচরণ, এ কি একই কথা হোল? দেখ না, শিশুরা অবোধ, ওদের কি কোন দায় আছে? পিতামাতা যেমন কর্ম করে, ওরাও

তেমনি ফল ভোগ করে। ওদের খাওয়াও ওরা বাঁচবে, না খেতে দাও, মরে যাবে। ওদের কি কিছু করবার ক্ষমতা আছে? তেমনি ধর্মাচরণের ব্যাপারে আমাদের এ মেয়ে জাতটা শিশুদের মতই অবোধ। চিরদিনই অবোধ থাকে। প্রজাপতিরই এই বিধান। আর প্রজাপতির বিধান মতেই স্বামী যদি পুণ্যকার্য করে, পত্নী তার সমান অংশ লাভ করে। আবার স্বামী যদি পাপ কার্য করে, পত্নীকে তারও সমান অংশ নিতে হয়। এজন্যই তো পত্নীর আর এক নাম সহধর্মিনী।

এজন্যই নাকি? প্রজাপতির এই রকমই বিধান? কার কাছ থেকে এসব কথা শুনেছ?

কেন, ব্রাহ্মণদের কাছে। দেখ না, যখন যাগযজ্ঞ হয়, তোমরা যজ্ঞক্ষেত্রে গিয়ে যথারীতি যজ্ঞানুষ্ঠান কর। আমরা যেতে পারি সেখানে? আমাদের যাওয়ার দরকারও করে না, আমরা ঘরে বসেই তার ফল পাই।

এতক্ষণ সুদর্শনের কথার মধ্যে কৌতুকের ভাব ছিল, এবার একটু যেন গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। বসুমতীর কথার উপরে কোন কথাই সে বলল না।

তার এই নিঃশব্দতায় বসুমতীর মনে একটু খটকা লাগল, সে জিজ্ঞাসা করল, কেন, এ কথা কি সত্য নয়?

কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠে সুদর্শন উত্তর দিল, আমি জানি না, আমি বলতে অক্ষম।

তুমি জান না, এ কথা বললেই বিশ্বাস করব? সবাই বলে, তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কম আছে। আসল কথা, তোমরা আমাদের মেয়েদের কাছে সব কথা খুলে বলতে চাও না। আচ্ছা, ও কথা থাক, আমার একটা কথার উত্তর দাও তুমি। লোকে যখন দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে, তখন তারা বলে, গাভী দাও, ধন দাও, সন্তান দাও, জয় দাও, কীর্তি দাও—যে যা চায়, তেমনি বলে।

তুমি কি চাইলে? কিছুই চাইলে না। এ তোমার কেমন প্রার্থনা?

সুদর্শন বলল, কেন, আমি তো চাইলাম, হে দেবতা, তুমি আমায় পাপ পথ থেকে নিবৃত্ত কর। আর যা-কিছু সম্পদ সে তো তিনি আপনা থেকেই দেন। পিতা কি কখনও সন্তানের প্রার্থনার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন? বরুণ সকল পিতার শ্রেষ্ঠ পিতা। তিনি সব কিছু দেখতে পান সব কিছু শুনতে পান। আমার কি আছে আর না আছে, তা কি আর তাঁর কাছে অজানা আছে? আমার যদি প্রাপ্য হয়, তবে তিনি নিজে থেকেই দেবেন।

বসুমতী এ কথাটা মানতে পারল না। বলল, এ তোমার কেমন কথা? না চাইলে কি আর পাওয়া যায়? দেখ না, তুমি কিছুই চাও না, তোমার সংসারের কি দুর্দশা! আর তোমার ভাইরা? তাদের গোশালায় গাভী আর ধরে না। তাদের স্ত্রীদের গায়ে সোনার অলঙ্কার। তারা যখন তখন আমাকে ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলে, আর বড় বড় কথা শোনায়।

সুদর্শন বলল, ওদেব প্রাপ্য ছিল, ওরা পেয়েছে। আমাদের প্রাপ্য ছিল না, আমরা পাই নি। শুধু চাইলেই কি আর মেলে?

বসুমতী ঠাণ্ডা মেয়ে। তা'ছাড়া স্বামীর উপর ওব অগাধ বিশ্বাস, স্বামীর বাক্যকে বেদবাক্যের মতই মনে করে। কিন্তু আজ ওকে তর্কে পেয়ে বসেছে। সে বলল, তাই যদি হবে, তাহলে লোকে এত যাগ-যজ্ঞ করে কেন? আর অভাবে পড়লে দেবতাদের কাছে এমন করে ধন্না দিয়েই বা পড়ে কেন? যাগ-যজ্ঞ সবই কি তবে নিষ্ফল?

সুদর্শন চমকে উঠল। এ তার হয়েছে কি? শাস্ত্রের আলোক থেকে বঞ্চিতা, সরল-মনা সহজ-বুদ্ধি বসুমতী, তার কাছেও সে আজ পদে পদে হটে যাচ্ছে। যাগ-যজ্ঞ সবই নিষ্ফল, এমন কথা সে কেমন করে মনে করবে! অথচ তার কথার মানে তো কতকটা সেই রকমই দাঁড়ায়। বসুমতী তো অন্যায় কিছু বলে নি। কিছুদিন ধরে কি

যেন তার হয়েছে। মাথাটার ভিতর কেমন যেন এলোমেলো হয়ে উঠেছে। চিন্তা আর কথায় সঙ্গতি থাকতে চায় না।

এমন সময় পাড়ার মধ্যে একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। কি হোল আবার, সুদর্শন আর বসুমতী দু'জনেই ঘর থেকে বাইরে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। গোলমালের শব্দটা আসছে সাত্যকিদের বাড়ির দিক থেকে। কি হয়েছে, সুদর্শনকে একবার খোঁজ করে দেখতেই হবে।

সুদর্শন একটু চিন্তিত ভাবে বলল, সাত্যকি যতদিন বাড়ি না থাকে, বাড়িটা ঠাণ্ডা থাকে। সে এলেই একটা না একটা উৎপাত শুরু হয়। সাত্যকি তো এতদিন বাড়ি নেই বলেই জানতাম। তা হলে সে কি আবার ফিরে এল নাকি? যাই, একবার খোঁজ করে আসি।

সুদর্শন সাত্যকির বাড়ি গিয়ে দেখল সে যা ভেবেছে ঠিক তাই। সাত্যকি কালই বাড়ি ফিরেছে। আর এই গোলমালটা বেধেছে তাকে নিয়েই। সাত্যকির ছেলেমেয়ে ক'টা কান্নাকাটি করছে, আর তার বউ গাল দিয়ে সাত্যকির ভূত ছাড়াচ্ছে। সাত্যকির বউর গলাটাই সুদর্শন বাড়ি থেকে শুনতে পেয়েছিল। বৈশ্যপাড়ার ক্ষেমঙ্করের মেজো ছেলে বল্লভ দরজার কাছে সাত্যকিদের ভেড়ার দড়িটা ধরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে সাত্যকির শাশুড়ী বুড়ি বকর বকর করে কি যেন বলে চলেছে। ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হয়, সাত্যকিকেই গাল দিচ্ছে। আর কেন্দ্রস্থলে ঘটনার নায়ক সাত্যকি নির্বিকার চিত্তে বসে সমস্ত অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

সুদর্শনকে দেখেই সাত্যকি মনের আনন্দে লাফ দিয়ে ওঠে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, চল, অনেক দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা। অনেক গল্প জমে আছে, পেট ভুট ভুট করছে, তোমার কাছে একটু খালাস করতে পারলে বাঁচি। এখানে যা গোলমাল, কোন কথা বলা যাবে না। চল, একটু বেরিয়ে পড়ি।

সুদর্শন তার কথা গায়ে না মেখে বর্তমান গোলযোগের সূত্রটার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোল। সুদর্শনকে ঢুকতে দেখেই সাত্যকির বউ সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ আর অঞ্চল সংযত করে স্থান ত্যাগ করল। সুদর্শন সাত্যকির বড় ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল, কাঁদছিস কেন রে শঙ্কু, কি হয়েছে?

শঙ্কু ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর দিল, আমাদের মন্নুকে নিয়ে যাচ্ছে।

মন্নু? মন্নু আবার কে রে?

শঙ্কু দরজার দিকে আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে বলল, ঐ যে, ঐ আমাদের ভেড়া।

এবার বল্লভের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতেই আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল। কাল সন্ধ্যার পর সাত্যকি ক্ষেমঙ্করেব বাড়িতে গিয়েছিল পাশা খেলতে। ক্ষেমঙ্করের বাড়িটা জুয়োর একটা পুরানো আড্ডা। আর পাশা সাত্যকির আবাল্য বন্ধু বললেই চলে, যে-বন্ধু ওর জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। এ অবশ্য অন্য সবার কথা, সাত্যকি নিজে বলে, এই পৃথিবীতে সত্য বস্তু বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই পাশা, আর সব মায়া।

সে যাই হোক, সাত্যকি প্রথম দানে জিতে গেল। তার পরের পালায় সাত্যকি বাজী ধরল মন্নুকে, অর্থাৎ তাদের ভেড়াটিকে। মন্নু এ বাড়ির সবারই প্রিয়, এমন কি সাত্যকির নিজেরও। কিন্তু আপন-পর বোধ, হিতাহিত জ্ঞান এইটুকুই যদি ভুলিয়ে দিতে না পারবে, তবে আবার কিসের পাশা খেলা! কিন্তু পাশা খেলার সেদিন কি আর আছে! সে ছিল আগেকার দিনে, যখন স্ত্রীকে আর রাজ্যকে বাজী ধরেও রাজারাজড়ারা পাশা খেলত। তার নাম পাশা খেলা। কিন্তু আজকালকার দিনে মানুষের সেই দরাজ দিলও নেই, সেই সুযোগ-সুবিধাও নেই। এইসব দুঃখের কথা সুদর্শন সাত্যকির মুখে অনেক বারই শুনেছে।

এবারকার দানে সাত্যকিকে হার মানতে হোল। হার হবার পর সাত্যকির হয়তো মনে পড়েছিল মন্নুকে সে কতটা ভালবাসত। কিন্তু তখন ভেবে আর কি হবে! সকাল বেলা ক্ষেমঙ্করের ছেলে বল্লভ এল মন্নুকে নিতে। সাত্যকি কোন ওজর-আপত্তি দেখাল না। বাজীর ব্যাপারে সে চিরদিনই সত্যনিষ্ঠ। সে তাড়াতাড়ি মন্নুকে নিয়ে এসে বল্লভের হাতে সমর্পণ করল। কিন্তু বল্লভ এক পা এগোতে পারল না। যেই না টের পাওয়া অমনি চ্যা ভ্যাঁ শুরু হয়ে গেল। আর ওদের কান্না শুনে ওদের মা রণরঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। এসব দেখে-শুনে বল্লভ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই হোল ব্যাপার।

ভাগ্যক্রমে ক্ষেমঙ্কর সুদর্শনের খুবই পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, সুদর্শনের অনুগতও বটে। সে বল্লভকে বলল, তুই ভেড়াটাকে রেখেই যা বল্লভ, আমি ক্ষেমঙ্করকে বুঝিয়ে বলব সব কথা। বল্লভ এক কথাতেই রাজি, সে আপাতত এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। চুরি না করলেও সে যেন চুরির দায়ে ধরা পড়ে গেছে। এমন হবে জানলে সে কি এই ভেড়া নিতে আসত! কক্ষণও না।

এক মুহূর্তে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে গেল। বাচ্চারা কান্নাকাটি ভুলে গিয়ে মন্নুকে ঘিরে লাফালাফি শুরু করে দিল। মন্নু ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেনই বা এত কান্নাকাটি, আর কিসের বা এত আনন্দ! সে হয়তো মনে মনে ভাবছিল, মানুষ জাতটা বড়ই দুর্বোধ্য। কিন্তু ভেড়ারা মানুষের মত এমন নির্বোধ নয় যে, এক কথা নিয়ে অষ্টপ্রহর মাথা ঘামিয়ে মরবে। ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মন্নু ওদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

সাত্যকি সুদর্শনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে যে দেখল সেই একটু চোখ টিপে হাসল। সুদর্শনের দৃষ্টি এড়াল না। সে ভাল করেই জানত ওদের দু'জনের বন্ধুত্বটা নগরের লোকেদের কৌতূহল ও আলোচনার বস্তু। শুধু কৌতূহল নয়, নিন্দারও বটে। সুদর্শনের

জীবনে একটিমাত্র কলঙ্ক। তা হচ্ছে সাত্যকি। সে সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ লোক বলে সমাজে সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। কিন্তু সাত্যকির মত উচ্ছৃঙ্খল ও দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে তার প্রবৃত্তি ও রুচিতে কেন-যে বাধে না, লোকে তা বুঝে উঠতে পারে না।

শুধু আড়ালেই নয়, অনেকেই তার মুখের সামনে অভিযোগ করেছে। কিন্তু সুদর্শন আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত কোন কথাই বলতে পারে নি। বলার থাকলে তো বলবে। সাত্যকি সত্য-সত্যই দায়িত্বহীন, দ্যূতাসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। লোকে যা বলে, কোন কথাই মিছে বলে না। বরঞ্চ লোকে যা জানে না, এমন অনেক কথা আছে, যা একমাত্র সুদর্শনই জানে। সে-সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে লোকে হয়তো তাকে পথের কুকুরের মত পিটিয়ে মারত। কিন্তু তবু সাত্যকি তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের পরিমণ্ডল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবার শক্তি সুদর্শনের নেই। সাত্যকির এক বিরাট সমাজ, সুদর্শনকে না হলেও তার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। কিন্তু সাত্যকিকে ছাড়া সুদর্শনের চলে না। এই রহস্যের পিছনকার কারণ সুদর্শন নিজেও ভাল করে খুঁজে পায় না, বাইরের লোকে কেমন করে বুঝবে?

সাত্যকির স্বভাবের মধ্যেই ঘূর্ণি রোগ আছে। এই রোগ মাঝে মাঝেই তাকে ঘুরিয়ে মারে। কোথায় থাকে, কোথায় যায়, সে খবর কেউ বলতে পারে না।

যখন তার সময় হয়, অর্থাৎ একটানা উড়তে উড়তে যখন তার ডানা দুটো ক্লান্ত হয়ে আসে তখন সে ফিরে আসে তার গৃহে, কিছুদিন পাখা গুটিয়ে বসে বসে ঝিমায়।

এই রোগ ওর মধ্যে পিতৃসূত্রে সংক্রামিত হয়েছে। কিছুটা বা মা'র কাছ থেকেও পেয়ে থাকতে পারে। ওর বাবা যখন যৌবনের প্রথম ধাপে তখন হঠাৎ সে একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। গেল তো

গেল, দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর যেমন হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ভাবে সবাইকে চমকে দিয়ে আবার হঠাৎ একদিন ফিরে এল। সে প্রায় এক যুগ পরে। যাবার সময় একাই গিয়েছিল, আসবার সময় একা নয়, সঙ্গে এল সাত্যকি আর তার মা। সাত্যকির বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। আর তার মা'র সম্পর্কে আলোচনায় প্রতিবেশীদের রসনা মুখর হয়ে উঠল। সে আর্যগোষ্ঠীর মেয়ে নয়। উচ্চ বর্ণের আর্যদের মত সুগৌর নয়, শূদ্রদের মত কৃষ্ণবর্ণও নয়, তামার মত রঙ্, ভাঙ্গা ভাঙ্গা আর্য ভাষায় কথা বলে। বালক সাত্যকির মুখেও মায়ের মতই কথা। আর কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে এক একটা বিদ্‌ঘুটে কথা উচ্চারণ করে, যার মানে কেউ বোঝে না। ওদের মা ছেলের কথা শুনে সবাই হাসে।

আর্যদের ঘরে অনার্য স্ত্রী-যে আসে না তা নয়, মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু তারা কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আসে, সেজন্যই জাতি-বর্ণের পরিচয় খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ রকম চেহারা আর এ রকম মুখের ছাঁদের সঙ্গে এখানকার কেউ পরিচিত নয়। ওদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও নাকি দক্ষিণ অঞ্চলের মেয়ে। কোথায় সেই দক্ষিণ অঞ্চল? বহু দূরে, সে এক সমুদ্র-পারের দেশ। কি একটা রাজ্যের নামও করে। কিন্তু সে নাম এখানে কারুই জানা নেই। সত্য বলে কি মিথ্যা বলে, তা-ই বা কে জানে! যে-লোক নিজের দেশ ছেড়ে, জ্ঞাতি-গোত্রের সংশ্রব ছেড়ে এক যুগ কাল বিদেশে বিধর্মীদের মাঝে কাটিয়ে এসেছে, তার কথায় বিশ্বাস আছে কিছু? ওরা মেয়েটাকে অনেক বার বলেছে, তোমার নিজের ভাষায় কথা বল দেখি, আমরা একটু শুনি। ও শুধু হাসে, আর বলে, ভুলে গেছি। ভুলে গেছে! এটা কি একটা বিশ্বাস করবার মত কথা?

ওরা নিজেরা নিজেদের মনে থাকত, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত কম। আবার মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যেত। লোকে

মনে করত, আর বোধ হয় ফিরবে না। কিন্তু না, কিছুদিন বাদে আবার ফিরে আসত। কোথায় গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলে এক একটা জায়গার নাম করত। সত্য বলত না মিথ্যা বলত ওরাই জানে।

এই ভাবে বছর সাতেক কাটল। এবার ওদের ছোট্ট সংসারটুকুতে ভাঙ্গন ধরল। আগে কেউ কোন খবর পায় নি, হঠাৎ একদিন শোনা গেল সাত্যকির মা নাকি মারা গেছে। জ্ঞাতিরা দল বেঁধে এল জ্ঞাতির শেষ কর্তব্য করতে। গিয়ে দেখে বাড়িতে কান্নাকাটি নেই, কিছু নেই, এ কেমন মরা মরল! ঘরের ভিতর গিয়ে দেখে, একটা লোকও নেই, শুধু একটা বেরাল ঘরটার ভিতর ঘুরে ঘুরে ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডাকছে। চমকে উঠল সবাই, গেল কোথায়? একজন বলল, এরা মানুষ তো, না আর কিছু?

না, মানুষই, আর কিছু নয়। বাইরে একটু খোঁজ করতেই পাওয়া গেল। বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে সাত্যকির বাবা গর্ত খুঁড়ছে, আর সাত্যকি খুঁড়ে তোলা মাটি ঝুড়ি ভর্তি করে উপরে তুলে ফেলছে। গর্তের পাশেই শবদেহ পড়ে আছে।

এ কি, কি হচ্ছে এখানে? ওরা ক'জন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

ওদের সাড়া পেয়ে সাত্যকির বাবা গর্ত থেকে উঠে এসে শান্ত কণ্ঠে বলল, গর্ত খুঁড়ছি, মাটি-চাপা দেব।

সে কি, মাটি-চাপা দেবে কেন? পাগল হলে নাকি তুমি?

না, পাগল না। ওদের মধ্যে মাটি-চাপা দেওয়াটাই রীতি কিনা।

জ্ঞাতিদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ যে সে বলল, না না না, ওসব রীতি আমাদের মধ্যে চলবে না। আগে যা ছিল, তা ছিল, এখন বিবাহ সূত্রে আর্য-স্ত্রী। সুতরাং আর্যবিধি-অনুসারে অগ্নিসংস্কার করতে হবে। তা না হলে মৃতের সদ্গতি হবে না। নাও হে নাও, এগিয়ে এসে তোলো।

কয়েকজন এগিয়ে আসছিল, কিন্তু বাধা পেয়ে আসতে পারল না।

সাত্যকির বাবা এক লাফে মাঝখানে এসে পড়ে কোদালটা তুলে ধরে বলল, সাবধান, এক পা এগোও যদি ফল খুব খারাপ হবে। ওকে আমি মাটি চাপা দেবই।· কেউ বাধা দিতে পারবে না।

ওরা আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল। দেখল, ওর চোখ দুটো জবা ফুলেব মত টকটক করছে। ও বাবা, সত্য-সত্যই পাগল হয়ে গেল নাকি ?

ওরা বলতে বলতে চলে গেল, আমাদে:' যা কর্তব্য. তা আমরা করলাম। এর পরে আমরা আর কি করতে পাবি।

সমাজের লোকেরা খুবই চটে গেল. চটবার কথাই তো। ওরা বলল, যা খুশি করবার করুক গে, আমরা জানি না'

এর পর থেকে সাত্যকির বাবা বাইরে যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিল। আগে যা দু' এক বাড়িতে যাতায়াত করত, এখন তাও বন্ধ করে দিল। বাড়ির মধ্যে বাপ-ব্যাটায় মিলে সাবাদিন কেবল গুজুর গুজুর করত। কি যে এত ওদের কথা ওরাই জানে! রোজ বিকাল বেলা সাত্যকির বাবা সাত্যকির মা'র শেষ শয্যার ধারে ঘাসেব উপর শুয়ে থাকত। এই ভাবে মাস কয়েক কাটল।

একদিন সাত্যকি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা. তমি দিন দিন এমন করে শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?

কই রে, শুকিয়ে যাচ্ছি না তো ওর বাপ হেসে উত্তর দিল।

না বাবা, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ. তুমি এত কম খাও কেন বাবা, তুমি আর একটু বেশী করে খেও.

এর কিছুদিন বাদেই সাত্যকির বাবা শয্যা নিল। শেষে একদিন পাড়া-প্রতিবেশীর কানে গিয়ে খবর পৌঁছল, সাত্যকির বাবার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। খবর পেয়ে জ্ঞাতিরা ছুটে এল। হাজার হোক রক্তের সম্বন্ধ তো। এমন সময় কি কেউ রাগ করে বসে থাকতে পারে ?

ওদের দেখে সাত্যকির বাবা বলল, তোমরা এসেছ, ভালই

হয়েছে। আমি এবার মরব তার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

ওরা বলল, এ কি কথা বলছ? রোগ হলেই কি আর মানুষ মরে? এত ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি দু'চার দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। দেখ না, আমরা সব ব্যবস্থা করছি। তুমি কিছু ভয় পেও না।

আহা, ভয় পাব কেন? ভয়ের কি আছে? আমি শুধু বলছি, আমি দু' এক দিনের মধ্যেই মরব। আমার এই ছেলেটা রইল। ওর মা গেল, বাপ গেল, কেউ তো আর রইল না। তোমরা ওকে দেখো। আর একটা কথা। আমি মরলে পর আমার দেহটাকে ওর মায়ের পাশে মাটি দিও।

মাটি দেব? কেন? কয়েক জন সমস্বরে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, মাটিই তো দেবে। আমি ওকে বিয়ে করবার আগেই ওদের ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম।

অ্যাঁ, এসব বলছ কি তুমি?

হ্যাঁ, যা বলছি তাই। তোমরা হয়তো দুঃখ পাবে, এই কথা মনে করেই আগে তোমাদের কাউকে এ কথা বলি নি। কিন্তু এখন তো আমাকে বলতেই হবে। আমি এখন সজ্ঞানে এই কথা বলছি, আমি মরলে পর আমাকে তোমরা ওর পাশেই শুইয়ে রেখো। ওখানেই আমি শান্তিতে থাকব।

ওরা এ কথার উত্তরে ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলল না। কি আশ্চর্য, ঠিক তার পর দিনই সে মারা গেল। জ্ঞাতিরা আবার তৈরি হয়ে এল। তারা ওর শেষ অনুরোধে আমল দিল না, পোড়াবার জন্য কাঁধে তুলে নিতে গেল। কিন্তু সাত্যকি ওর বাবার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কাঁদছে না, ও শুধু চেঁচাচ্ছে, তোমরা আমার বাবাকে পুড়িয়ো না গো, পুড়িয়ো না। বাবা-যে তাকে মাটি দিতে বলে গেছে।

কিন্তু কে শোনে ওর কথা! ওরা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল, তারপর ওদের বিধিমত পুড়িয়ে ছাই করল। সাত্যকিকেও

নিয়ে গেল সঙ্গে করে। ছেলের হাতের আগুন, কে না চায়? কিন্তু সাত্যকির বাবা চায় নি। তবুও তাকে ছেলের হাতের আগুন পেতেই হোল। সাত্যকি আগুন ছোঁয়াতে চায় নি, কিন্তু ওরা সবাই মিলে ওকে দিয়ে জোর করে তাই করাল। বাপ মরার পর ও একবারও কাঁদে নি, কিন্তু এবার ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল।

কান্নাকাটি না করলেও বাপের শোক ওকে মুহ্যমান করে ফেলেছিল। মা মরে গেলেও বাপ ছিল, সেই বাপও এখন চলে গেল। আপন বলতে কেউ আর রইল না। সেই শোকের উপর বড় শোক, বাপ মরবার আগে এত করে বলে গেল ওর মা'র পাশে তাকে শুইয়ে রাখবার জন্য, কিন্তু সেই কথাটাও ওরা রাখল না। এই আঘাতটা ওর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। পুড়িয়ে ফেলার সেই ভীষণ দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ভিতরে ভিতরে জমে ওঠা অনুপায়ের ক্রোধ আর বিক্ষোভ হঠাৎ হাউ হাউ কান্নার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। উপস্থিত সবাই সহানুভূতির সুরে বলল, আহা, কাঁদবেই তো, এই বয়সেই মা বাপ দুই-ই হারাল। কিন্তু এ-যে কিসের কান্না ওরা তা কেমন করে বুঝবে! সেই দিন থেকে যে-পোকাটা ওর মনের মধ্যে ঢুকল, সেটা দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল।

জ্ঞাতিদের মধ্যে একজন ওকে বাড়িতে স্থান দিল। শুধু স্থান দেওয়াই নয়, বিদ্যাভ্যাসের জন্য সে ওকে গুরুর কাছে পাঠাল। গুরুর বেশ নাম-ডাক, অনেক ছাত্র তার কাছে পড়তে আসে। এইখানেই সুদর্শনের সঙ্গে তার পরিচয় ও বন্ধুত্ব! গুরু ওর মেধা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। যে-সব ছাত্র পড়তে আসে ওর সঙ্গে কারুই তুলনা হয় না। ও যেন আর সবার থেকে এক যোজন এগিয়ে থাকে। থাকবার কথাও বটে, বাপের কাছে আগে থেকেই ওর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছিল।

উত্তরাধিকারী হিসাবে বাপের কাছ থেকে কোন সম্পত্তিই পায় নি, শুধু পেয়েছিল এই একটি জিনিস, যার জোরে সে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। তার কথা বলতে গুরু উচ্ছ্বসিত, তার প্রশংসা

তাঁর মুখে ধরে না। সে নাকি এক বছরের পাঠ এক মাসেই আয়ত্ত করে ফেলে। সবার সামনেই তিনি খোলাখুলি বলে ফেলেন, এমন ছাত্র পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। আর সব ছাত্রেরা শুনে ঈর্ষা বোধ করে এবং সাত্যকির উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে পাঠ বন্ধ হয়ে যায়, গুরু-শিষ্যে আলোচনা চলতে থাকে। তখন বাকী ছাত্রেরা সব অবান্তর হয়ে পড়ে। গুরু যেন তাদের চোখেই দেখতে পান না। গুরু আর তাঁর প্রধান ছাত্রের মধ্যে যে-কথা নিয়ে আলোচনা হয় আর সব ছাত্রেরা কেউ তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে না। ওরা নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে, কেউ হাই তোলে, কেউ বা ঝিমোয়। আবার মাঝে মাঝে সেই আলোচনা তর্কের পর্যায়ে গিয়ে ওঠে। গুরু হাসিমুখে প্রশ্রয় দেন, প্রকারান্তরে উৎসাহও যোগান। তিনি বলেন, তর্কেব মধ্য দিয়েই তো বিশুদ্ধ জ্ঞান বেরিয়ে আসে। আরও বলেন, জীবনভর ছাত্র পড়িয়ে এলাম, কিন্তু এত আনন্দ আর কখনও পাই নি।

সাত্যকি আগে কথা বলত কম, শুনতেই চাইত বেশী। গুরুই ওকে উস্‌কে তুললেন। কিন্তু মুখ যখন একবার খুলল, তখন সে মাত্রা-বোধ হারিয়ে ফেলল। আর সব ছাত্রেরা গুরুর মুখের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই ভয় পায়, আর সাত্যকি নির্ভয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করে চলে, যেন তারই একজন সহপাঠী। তার স্পর্ধা দেখে তার ছাত্র-বন্ধুরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত শুধু ছাত্রেরাই নয়, গুরু নিজেও যেন কেমন একটু হকচকিয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে তাঁর চোখে ভ্রূকুটি-ভঙ্গি দেখা দেয়। তাঁর মনে হয়, অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে ছাত্র যেন তার নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে চলেছে। সময় সময় কেমন এক-একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসে আর তার উত্তর দানের মধ্যেও ঔদ্ধত্যের ভঙ্গি থাকে। সময় সময় তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি কথা খুঁজে পান না, আর এতগুলি ছাত্রের সামনে অপ্রস্তুত বোধ করেন। তখনই তাঁর ভিতরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। আর

তাঁর সেই জ্বলুনিটা চাপা থাকে না, চোখ-মুখের ভাব থেকেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ছাত্রদের মধ্যে দৃষ্টি যাদের তীক্ষ্ণ তাদের কাছে গুরুর এই পরিবর্তনটা ধরা পড়ে যায়। তারা এতে পরম আনন্দ অনুভব করে, আর এই নিয়ে পরস্পর কানাকানি আর বলাবলি করে। কিন্তু তর্কে মত্ত সাত্যকির এ সমস্ত গৌণ ব্যাপার লক্ষ করার মত অবসর নেই।

সাত্যকির আর এক দোষ, তার সময়-অসময় জ্ঞান নেই। গুরু যজ্ঞানুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন, আর সবাই নিবিষ্ট-চিত্তে শুনছিল। এমন সময় সাত্যকি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল, গুরুদেব, ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তে ইন্দ্রের স্তবগানে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এমন কেউ কেউ আছে, যারা প্রশ্ন করে, তিনি কোথায়? আবার এমন লোকও আছে যারা বলে, তিনি নাই। এর অর্থ কি?

গুরু উত্তর দিলেন, আসুরী মায়ায় আচ্ছন্ন যারা, তারাই এ রকম সংশয় প্রকাশ করে। ইন্দ্র যদি না থাকে, সৃষ্টি কি কখনও থাকতে পারে?

আচ্ছা, ইন্দ্র সম্পর্কে বেদে যে-সমস্ত বর্ণনা আছে, তা কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য? আমার কিন্তু কেমন যেন লাগে, মনে হয়, অনেক অতিরঞ্জন করা হয়েছে। দেখুন না, বৃত্রাসুরকে মারবার আগে ইন্দ্র নাকি তিন পুকুর ভরতি সোমরস পান করে নিয়েছিলেন। আবার আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি এক চুমুকে ত্রিশ পুকুর সোমরস পান করে নেন। আচ্ছা, এ কি কেউ কখনও পারে?

ইন্দ্রদেব তো আর তোমার আমার মত নন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বেদে যা আছে তা অভ্রান্ত। অতিরঞ্জন করা হয়েছে, এ রকম কথা বোলো না আর কখনও। এমন কথা মুখে আনাও পাপ। বেদ তো আর মানুষের রচিত নয় যে, তাতে ভুল-ভ্রান্তি বা অতিরঞ্জন থাকবে। কিন্তু ওসব কথা থাক এখন, আমি যা বলছিলাম তাই শোন।

আচ্ছা, বেদের কথা যাক। কিন্তু গুরুদেব, ইন্দ্রকে যজ্ঞ করে প্রসন্ন না করলে বৃষ্টি হয় না, এ কথাটা কি ঠিক?

ঠিক বই কি, নিশ্চয়ই ঠিক। এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি?

আমার বাবা সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ইন্দ্রের পূজা বা যাগ-যজ্ঞ করা হয় না, ইন্দ্রকে তারা মানেই না মোটে। আর মানবে কি, ইন্দ্রের নামই তারা শোনে নি।

গুরু বললেন, তা তো হতেই পারে। এই পৃথিবীতে অর্ধেক দিন, অর্ধেক রাত্রি, অর্ধেক জ্ঞান, অর্ধেক অজ্ঞানতা। যারা জন্মান্ধ তারা সূর্যের স্বরূপ কেমন করে বুঝবে?

কিন্তু গুরুদেব, সেই সব দেশেও তো আমাদের দেশের মতই বৃষ্টি হয়। আমি ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে সে-সব দেশে গেছি। সেই সব জায়গায় আমাদের এখানকার চেয়েও অনেক বেশী ভাল ফসল ফলে। এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তারা তো ইন্দ্রযজ্ঞ করে না, তবে এমন হয় কি করে?

তোর মাথা হয়, ধমকে উঠলেন গুরু। থাম এখন তুই। পড়া-শোনার সময় যত সব বাজে কথা। নিজেও পড়ায় মন দেবে না, আর কাউকে শুনতেও দেবে না!

সাত্যকি ধমক খেয়ে বিমর্ষ হয়ে চুপ করে রইল। কি এমন অন্যায় কথা বলেছে সে? এটা কি একটা জানবার মত কথা নয়?

এই রকম ছোটখাটো ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু এই ভাবে খুট-খাট চলতে চলতে শেষে একদিন বেশ বড় রকমের একটা ঘটনা ঘটে গেল। গুরু সেদিন মৃতের সংস্কার-কার্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছিলেন। শুনতে শুনতে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিনের কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল সাত্যকি: গুরুদেব, কোনটা ভাল,

অগ্নিসংস্কার না ভূমিগর্ভে প্রোথন? সমস্ত ছাত্রেরা সচকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল—এ বলে কি!

এ রকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে গুরু সে কথা ভাবতেও পারেন নি। তিনি একটু থমকে গিয়ে শেষে বললেন, ভূমিগর্ভে প্রোথন—এ হচ্ছে অসভ্য অনার্যদের রীতি। এ কি কখনও ভাল হতে পারে? এই রীতি ঘৃণার্হ।

গুরুর এই কথাগুলি ওর মর্মে মর্মে গিয়ে বিঁধে বসল—অসভ্য অনার্যদের রীতি! ঘৃণার্হ রীতি! আজই প্রথম সে তীব্র ভাবে অনুভব করল, যারা তার চারদিকে ঘিরে বসে আছে তারা সবাই আর্য, আর সে আর্য-বহির্ভূত অন্য কিছু।

কেন? ঘৃণার্হ কেন?

কেন? এর পরেও আবার কেন? ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন গুরু।

একটি ছেলে আড়াল থেকে গুরুর হয়ে উত্তর দিল, অসভ্য অনার্যদের রীতি বলেই ঘৃণার্হ। তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিদ্রূপের সুর। সাত্যকি বুঝল, ওর জন্ম-সম্পর্কে ইঙ্গিত করছে। কথাটা কে বলল, বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

গুরু শান্ত কণ্ঠে বললেন, বৈদিক শাস্ত্রে এর বিধান নেই।

কিন্তু সাত্যকির ঘাড়ে তখন তর্কের ভূত চেপে বসেছে। সে বলল, না, এ কথা যথার্থ নয়, বৈদিক শাস্ত্রে এর বিধান রয়েছে।

যথার্থ নয়! গুরু উষ্ণ হয়ে উঠলেন, এই উদ্ধত বালক তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলবে!

অর্বাচীন, বল্ কোথায় আছে সেই বিধান। ক্রোধে কাঁপছিলেন গুরু।

সাত্যকি প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই মন্ত্র সে ভুলবে না। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্ত থেকে সে আবৃত্তি করল:

এই যে তোমার মাতৃরূপা পবিত্র পৃথিবী
তুমি তার গর্ভে প্রবেশ করো।
মা তোমাকে তার কোমল শয্যায় শোওয়াবেন
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।
হে পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও,
তাকে সহজ-প্রবেশ দাও, নিরাপদ আশ্রয় দাও
মা যেমন করে তার শিশুকে বেশভূষায় সজ্জিত করেন
তেমনি করে তুমি তাকে আবৃত করে রাখো।
তোমাকে ঘিরে আমি এই মাটির স্তূপ রচনা করে তুললাম
আমাকে যেন কোন অমঙ্গল না পায়
পিতৃ-পুরুষেরা এই স্তূপকে রক্ষা করে চলুন
মৃত্যুর অধিপতি এইখানেই তোমার যোগ্যভবন প্রতিষ্ঠা করুন।

ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। সবাই প্রতীক্ষমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গুরুর মুখের দিকে। গুরু স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। কতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। অধীর গুঞ্জনধ্বনি ক্রমেই বেড়ে চলল।

শেষে গুরু মুখ খুললেন। বললেন, তুমি মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পার নি। তুমি শুধু শব্দার্থই দেখেছ, তার মর্মদেশে প্রবেশ করতে পার নি। পৃথিবী এখানে রূপক। জীবিতের আশ্রয়স্থল যেমন পৃথিবী, তেমনি মৃতের আশ্রয়স্থল অগ্নি। এখানে পৃথিবী অগ্নি। বুঝতে পারছ তো?

আপনি অর্থের বিকৃতি করছেন। যেটা সহজ ও প্রত্যক্ষ তাকে জটিল করে তুলছেন।

এবারে সমস্ত গুঞ্জন একেবারে থেমে গেল। কি দুঃসাহস, গুরুর মুখের উপর এমন কথা বলে!

অপমানে কুঞ্চিত হয়ে উঠল গুরুর মুখ। তাঁর এমন মুখ কেউ কোন-দিন দেখে নি। যেন এর প্রতিশোধ নেবার জন্যই তিনি গর্জন করে

উঠলেন, যার দেহে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত নেই সে কখনও বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। তাকে বোঝালেও সে বোঝে না। এরই নাম অধিকারভেদ।

সাত্যকির আর্য-অনার্যের মিশ্রিত রক্তধারা তার ধমনীতে উন্মাদের মত নেচে উঠল। গুরুর কণ্ঠ অনুসরণ করে সেও অনুরূপ সুরেই গর্জে উঠল, ধীশক্তির স্থিতি চিত্তে, রক্তের মধ্যে নয়। মূঢ় ব্যক্তিরাই তাকে রক্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকে।

কয়েকজন ছাত্র উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুরুর প্রতি এমন কটূক্তি, এ তারা কেমন করে সইবে! গুরু চেঁচিয়ে উঠলেন, বেরিয়ে যা এখান থেকে, আর কোন দিন এখানে প্রবেশ করবি না।

সাত্যকি যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনার গতি সে যেন ঠিক অনুধাবন করতে পারছিল না। গুরু ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে একটু অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন। শুধু এইটুকুর জন্যই ওরা অপেক্ষা করছিল।

এই ইঙ্গিতটুকু পেতেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, তারপর প্রহার করতে করতে তাকে বহিষ্কৃত করল। ওদের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ এত দিনে মিটল। চূড়ান্ত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে সাত্যকির ছাত্র-জীবনেব পরিসমাপ্তি ঘটিল।

সুদর্শন সেদিন সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চলভাবে সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করল। তার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না যে, আজ গুরুর চরম পরাজয় ঘটেছে। শুধু তর্কের দিক দিয়ে নয়, সমস্ত দিক দিয়েই। সব দেখে-শুনে কেমন একটা ধিক্কার জাগল তার মনে। আর সেই দিনই গুরুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আর এই ঘটনা সুদর্শন আর সাত্যকির বন্ধুত্বের গ্রন্থিকে আরও দৃঢ় করে তুলল।

সাত্যকির জীবনে এবার এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর এক নতুন অধ্যায় শুরু হোল। গুরু-শিষ্য সংবাদ সকলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এতদিন সাত্যকি সবার কাছে সোনার টুকরো ছেলে বলেই

পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে গুরুই তার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচার করে এসেছেন। সাত্যকি যে-বাড়িতে স্থান পেয়েছিল তারা ওকে বুঝিয়ে বলল, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এখন গুরুর পায়ে গিয়ে জড়িয়ে ধর্। গুরু পিতার তুল্য, পিতার চেয়ে বড়, তাঁর কাছে আবার মান-অপমানের কথা কি! আর এমন গুরু উনি, যিনি তোকে তাঁর নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসেন।

কিন্তু সাত্যকির শক্ত ঘাড় কিছুতেই নরম হোল না। তার সাফ এক কথা, আমি কোন অন্যায় করি নি, আমি কেন ক্ষমা চাইতে যাব? এই নিয়ে বাড়িতে দু'বেলাই কথা কাটাকাটি আর মন কষাকষি চলল। এত ঝামেলা সাত্যকির ভাল লাগল না। সে এক বুড়িকে পিসী পিসী ডাকত, সোজা তার বাড়িতে গিয়ে উঠল। পিসী আদর করে তাকে জায়গা দিল।

কিন্তু পিসীর পেটে পেটে আরও মতলব ছিল। ক'দিন বাদেই সেটা বোঝা গেল। পিসীর একটা মাত্র মেয়ে, দেখতে শুনতে ভাল। পিসী ওকে সাত্যকির হাতে তুলে দিতে চাইল। পিসীর মেয়ে সাত্যকির চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে। তা হোক, ওতে কি আসে যায়! সাত্যকি-যে শুধু পিসীর জন্যই এ বাড়িতে যাতায়াত করত, এটা পুরাপুরি ঠিক কথা নয়। মেয়েটার দিকে ওর রোখ ছিল, কিন্তু সাহস করে ওকে কোন কথা বলতে পারে নি। কিন্তু সুযোগ কোন চেষ্টা ছাড়া আপনা থেকেই নেমে এল। বুড়ি সাত্যকির জ্ঞাতিদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। জ্ঞাতিরা ভাবল, ভালই তো, বুড়ির সম্পত্তি আছে কিছু। একটা মাত্র মেয়ে, যা আছে তা মেয়ে-জামাইয়েরই থাকবে। সাত্যকির তো নাই বলতে কিছুই নাই। ওদের বাপের যে-বাড়িটা ছিল, সেটা তো দেনার দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই এখানে বিয়েটা হলে সাত্যকির একটা হিল্লে হয়ে যাবে। জ্ঞাতিরা একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। সাত্যকির মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু পিসীর মেয়ে খুশি হোল, না বেজার হোল কিছুই বোঝা গেল না।

বিয়ের পর কিছুদিন বেশ কাটল। এই সময়টা মোটামুটি সকলেরই বেশ কাটে। পূর্ণযৌবনা অঞ্জনার নেশায় সে একেবারে বুঁদ হয়ে রইল। মধুমক্ষিকা মধুর ভাণ্ডে পড়লে তার যে-অবস্থা হয়, সেও তেমনি নড়বার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। গুরুগৃহের সেই চরম লাঞ্ছনার কথা তার আর মনে রইল না, আর্য-অনার্যের ভেদ-বিভেদের কথা তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেল। বন্যার প্লাবন যখন আসে, বন্ধুর ভূমির উঁচু-নীচু সমান করে দিয়েই আসে।

কিন্তু কুসুমেও কীট থাকে। তেমনি অঞ্জনারও এক প্রেমিক ছিল বিয়ের আগে থেকেই। সে লোকচক্ষু এড়িয়ে গোপনে যাতায়াত করত। তাই বলে বুড়ির চোখকে এড়াতে পারে নি। কিন্তু বুড়ি কি করে বাধা দেবে! অমন জোয়ান মেয়ে যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে তাকে ঠেকিয়ে রাখা, সে কি সহজ কথা! বুড়ি তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলে একটা প্রতিরোধের প্রাচীর খাড়া করে তুলতে চেয়েছিল। তা ছাড়া সাত্যকি ছেলেটাকে তার বড়ই পছন্দ। ওর গায়ের রংটা একটু তামাটে, সে ওর মায়ের জন্য, কিন্তু চেহারাটা সুন্দর। ভাল ছেলে বলে সুনামও আছে ওর। তাব উপর ওর মনটা বড় ভাল।

কিন্তু বেড়া দিয়েও সব উপদ্রবকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। নষ্ট স্বভাবের গরু বেড়া ভেঙে ফেলে ফলন্ত শস্যের ক্ষেতে এসে হামলা করে। অঞ্জনার সেই মনের মানুষটি বিয়ের পরেও যাতায়াত বন্ধ করল না। কিন্তু নির্বোধ সাত্যকি এর কোন খবরই রাখে না। অঞ্জনা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বুড়ি দেখে, দেখে আব ওর চোখ টাটায়। মেয়েকে সে দু'এক বার হুঁশিয়ারীও দিল। কিন্তু মেয়ে তার কথা গায়েই মাখে না। বুড়ি অনুপায় হয়ে নিজের হাত নিজেই কামড়ায়। ছেলেটা কি চোখ বুঝে চলে নাকি? কিছুই কি ওর চোখে পড়ে না? ছেলেটার জন্য বুড়ির বড় মায়া, নিজের পেটের মেয়েটাকে উদ্দেশ করে যখন তখন যা তা বলে গাল দেয়, কিন্তু মেয়ে শুনেও শোনে না।

অবশেষে বুড়ি আর কোন উপায় না দেখে এক দিন সাত্যকির কানের কাছে মুখ নিয়ে মেয়ের সম্পর্কে ফিস ফিস করে অনেক কথা বলল। কোন শাশুড়ী তার জামাইকে এ সমস্ত কথা বলে না। কথা শুনতে শুনতে সাত্যকির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, দম বন্ধ হয়ে আসবার মত হোল, আর শেষপর্যন্ত সব কথা শোনার পর, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে পড়ল। বুড়ির মনে মনে ভয় ছিল, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সাত্যকি হয়তো লাফালাফি চেঁচামেচি করে একটা হট্টগোল বাধিয়ে বসবে। এ অবস্থায় এই রকম করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিসের কি, সাত্যকি পাথরের মত ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ হয়ে রইল।

বুড়ি তখন তাকে উত্তেজিত করে তুলতে চাইল, বলল, এখনও সময় থাকতে শাসন কর। এর পর শাসনের বাইরে চলে যাবে।

শাসন? ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সাত্যকি। কথাটার মানে যেন ঠিক ধরতে পারছে না। এমন একটা কথা শোনার পর কোন রকম মাতামাতি করল না, আগ্রহের বশে কোন অতিরিক্ত কথা জানতে চাইল না, অন্য কোন উক্তি করল না, শুধু স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার মুখ থেকে শ্লথ উচ্চারিত একটি প্রশ্ন বেরিয়ে এল—শাসন?

বুড়ি মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভঙ্গিতে শাসন-কার্যের রূপটাকে প্রস্ফুট করে তুলে বলল, হ্যাঁ, শাসন। আমি অনেক বার বলে দেখেছি, কথায় কিছু হবে না। এখন ভালমত শাসন চাই। মেয়েমানুষদের মাঝে মাঝে শাসন করতে হয়, নইলে ওরা ঠিক থাকে না। যেমন পেত্নী, তার তেমনি মন্তর চাই।

সাত্যকি চমকে উঠল, এ বলে কি! অঞ্জনার গায়ে হাত তুলবে! ননীর মত কোমল, ফুলের মত সুন্দর আর মধুর মত মধুর অঞ্জনা, যার হাতের একটু ছোঁয়া পেলে ওর বুকের রক্ত পাগল হয়ে কপাট ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, সেই অঞ্জনাকে গায়ের জোরে শাসন

করতে হবে। অসম্ভব! তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—না না, এ আমি পারব না।

পারবে না কি, পারতেই হবে। বুড়ি রাগ করে উঠল, মেরে পাট পাট করে ফেল্, আমি কোন কথা কইব না। তোমার বউ না? তোমার বউকে তুমি মারবে না তো কে মারবে? ছ্যাচা গুঁতো খেয়ে গায়ের রস একটু কমুক, তখন সব ঠিক হয়ে যা্বে।

এত উৎসাহ দানেব পরও সাত্যকির কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

তুমি কেমন পুরুষ? বুড়ি তার পৌরুষেব উপর ইঙ্গিত কবে তাকে উস্কে তুলতে চাইল। কিন্তু বৃথা, সাত্যকি এই উস্কানিতে ধরা দিল না। সে স্থবিরের মত যেমন ছিল তেমনি বসে রইল!

বুড়ি এবার শাস্ত্র থেকে নজির দেখাল। বলল, এ তো কোন নূতন কথা নয়। চিরদিনই এমনি হয়ে আসছে। মেয়েমানুষের স্বভাব স্বভাবতই চঞ্চল। শাসন করে তাদের দমনে রাখতে হয়। মানুষেব কথা বাদ দাও, দেবতারা কি করেন? তাঁদের বউরা যখন তাঁদের অবাধ্য হয়, বা অন্য কোন পুরুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন তাঁরা তাদের প্রহার করতে করতে দুর্বল ও অবসন্ন করে ফেলেন। আর বউদেরও এতে আপত্তি করবার কিছুই নেই। তাদের দেহ তো তাদের স্বামীদেরই সম্পত্তি, এর উপর তাদের নিজেদেব কোন অধিকার নেই। স্বামীরা তাদের দেহ নিয়ে যা খুশি করতে পারে। এসব কথা শাস্ত্রেই লেখা আছে।

এসব কথা সাত্যকির কাছে নূতন। সে তার বাবা আর মা'র কথা মনে মনে ভাবছিল। কই, তার বাবা তো তাব মাকে কোন দিন প্রহার করত না।

বুড়ি আড়চোখে সাত্যকির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এত কথার পরেও তার মনের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এবার সে নিজের মনে মনেই বলল, মেয়েমানুষ জাতটা ডাইনীর জাত। নরম মত পুরুষ পেলে ওরা ভেড়া বানিয়ে রাখে। পুরুষের আছে গায়ের

জোর, আর মেয়ের আছে জাতু। জাতুর কাছে গায়ের জোর খাটে না।

সাত্যকি ভাবতে বসল। উপর্যুপরি ক'দিন ধরে সে শুধু ভাবলই। নিজের জীবনটাকে নিয়ে সে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল, কেন তার এই দুর্গতি। অল্প বয়সে সে তার মাকেও হারাল, বাপকেও হারাল, আপন বলতে কেউ রইল না। কিন্তু সেজন্য আর দায়ী কে? যম যাকে ডেকে নেয়, তাকে কি কেউ আটকে রাখতে পারে! কিন্তু মানুষ কি তাকে কম দুঃখ দিয়েছে? সেই ছোটবেলায় প্রথম যখন এখানে এল, তখন অনেকেই তার গায়ের বর্ণ, কথার ঢং আর তার মায়ের কথা নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করেছে। ছেলেমানুষ হলেও সে-সব কোন কথাই সে ভুলে যায় নি। বাপের মৃত্যুর পরের কথাটা মনে করলে এখনও তার শরীর-মন অস্থির হয়ে ওঠে। এখানকার আর্যেরা তার বাবার শবদেহকে পুড়িয়ে ছাই করল, ওরা তার শেষ ইচ্ছাটুকুর মর্যাদা দিল না। ওরা তো তার মাকেও এমনিভাবেই পুড়িয়ে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু ওর বাপের সেই উগ্র মূর্তি দেখে ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ওর বাবা ওর মাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু হতভাগ্য সাত্যকি, সে তার বাপকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। কে জানে, তার আত্মা হয়তো এজন্য কত কষ্ট পাচ্ছে। ওর মনে পড়ছে, ওর বাবা বলেছিল, আমাকে পুড়িয়ে ফেললে আমি আমার পত্নীকে খুঁজে পাব না। কে জানে, এখনও হয়তো তেমনি করে ব্যর্থ আশা নিয়ে তার সন্ধান করে ফিরছে। এই আর্যরাই তো সেজন্য দায়ী।

বিদ্যাচর্চা তার জীবনে নূতন আনন্দ বহন করে এনেছিল। বিশুদ্ধ আর্য সন্তান নয় বলে অন্যান্য ছাত্রেরা তাকে বিদ্রূপ করত, তাচ্ছিল্য করত, এ ব্যথা তার মর্মে মর্মে বিঁধত। কিন্তু গুরুর অকৃত্রিম স্নেহ ও জ্ঞানের প্রসাদ তার জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু একদিন সেই গুরুও মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। এ কথা বলতে তাঁর মুখে বাধল

না যে, যার দেহে বিশুদ্ধ আর্য-রক্ত নেই, সে কখনও বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। তারপর গুরুর ইঙ্গিতে ছাত্রদের হাতে তার সেই অকথ্য লাঞ্ছনা। এ কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল। তাকে দেখলে সবাই হাসাহাসি করে। কেন, কি অপরাধ করেছিল সে এই আর্যদের কাছে!

তারপর কত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ও ঘাতাঘাতের পর অঞ্জনা তার হাতে এসে ধরা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী তার কাছে মধুময় হয়ে উঠল, তার কোন অভাব, কোন অপূর্ণতা রইল না। সে ভাবল পুরানো সেই দুঃখের স্মৃতিগুলি সবই সে ভুলে যাবে, কোন কিছু মনে রাখবে না, শুধু অঞ্জনাকে কেন্দ্র করে এই পৃথিবীর বুকে সে এক স্বপ্নের স্বর্গ গড়ে তুলবে! কত দিন অঞ্জনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে তাকে তার এই স্বপ্ন-কথা শুনিয়েছে, আর তার উত্তরে অঞ্জনা মধুর হাসি হেসেছে। এই হাসির আড়ালে কি যে গরল ছিল, কেমন করে সে তা জানবে! কেন, কেন সে তাকে নিয়ে এমন করে খেলা করল! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পেয়ে গেল। যারা তার বাবার শবদেহকে পুড়িয়ে ছাই করেছিল, সেই জাতিরা তার গুরু, তার সহপাঠীরা আর এই অঞ্জনা সবাই অভিন্ন। এরা আর্য-রক্তধারী আর তার রক্ত অবিমিশ্র আর্য-রক্ত নয়। তাই তাকে সবাই বঞ্চনা করে।

তবে আমি কি? আর্য না অনার্য, এই আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দিল তার মনে। পিতৃপরিচয়ে আর্য, মাতৃপরিচয়ে অনার্য, পিতৃমাতৃ-পরিচয়ে সঙ্কর জাতি। আর্যরা তাকে আর্যাত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না, অনার্যরাও তাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না। সে তবে কি? পায়ের তলায় দাঁড়াবার মত শক্ত মাটি সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তখন হাল ছাড়া তরণীর মত সে ভাসিয়ে দিল আপনাকে। এই থেকেই তার বৈশ্যপাড়ায় জুয়োর আড্ডায় যাতায়াত শুরু হোল। সেখানে তার পরিচয় হোল সুরার সঙ্গে। আর জুয়ার আড্ডার সুর-রসিক

বন্ধুরা তাকে টেনে নিয়ে গেল বারাঙ্গনা পল্লীতে। জুয়ার আড্ডা, সুরা আর বারাঙ্গনা, এরা একের সঙ্গে অপরে এক সূত্রে সংশ্লিষ্ট। সাত্যকি এবার এক নূতন জগতে প্রবেশ করল। এই জগৎ তাকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করে এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত করে তুলতে লাগল।

অঞ্জনার সঙ্গে সাত্যকির সম্পর্কটি কিছু দিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনার মা ভয়ে কেঁপে মরছিল এর পরিণতি কি ঘটবে তাই ভেবে। মাত্র ক'মাসের কথা, এরই মধ্যে সাত্যকির বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। যত অস্থানে কুস্থানে তার গতি। লোকের নিন্দায় আর কান পাতা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ও রাত্রি-জাগরণের ফলে ওর চেহারা রুক্ষ ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। স্বভাবও হয়েছে তেমনি, আচমকা কথায় কথায় রেগে ওঠে, শাশুড়ীর সামনেই অঞ্জনাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দেয়।

অঞ্জনা আজকাল সাত্যকিকে ভয় করতে শিখেছে। আগে সাত্যকিই ওকে কিছুটা ভয় করে চলত। পাশার দান উল্টে গেছে। সাত্যকি নতুন মূর্তি নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কোন দিন বারাঙ্গনা পল্লীতে রাত কাটায়, কোন দিন তার পরিবর্তে অঞ্জনার উপর এসে চড়াও হয়। একদিন সে এই অঞ্জনার পায়ে তার প্রথম যৌবনের সুকুমার প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল, সেদিন অঞ্জনা ছলনা করে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আর আজ সাত্যকি, তার নতুন জগৎ তাকে যে-প্রেমে দীক্ষা দিয়েছে সেই পাশবিক প্রেম অঞ্জনার উপর প্রয়োগ করে। অঞ্জনা প্রত্যাখান করতে চায়, কিন্তু সাধ্য কি? কঠিন বাহুবলের কাছে তাকে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ননীর মত কোমল, ফুলের মত সুন্দর আর মধুর মত মধুর যে-অঞ্জনা, তাকে নির্মমভাবে মন্থন করে সে। অঞ্জনা আর্তনাদ করে ওঠে, কিন্তু ওর মায়া নেই। মনে হয় কি এক অক্ষম প্রতি-হিংসার তাড়নায় সে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ওকে ঘরে ফিরে আসতে দেখলেই এখন অঞ্জনার বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। কখন-যে কি করে বসে ঠিক নেই। আজকাল সাত্যকির হাত বেশ তৈরি হয়ে উঠেছে, কথায় কথায় মারপিট করে। শাশুড়ীর সেই উপদেশ আজকাল সে যথারীতি পালন করে চলে। তবে সময় সময় মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যায়, তখন মেয়েকে জামাইয়ের হাত থেকে বাচাবার জন্য বুড়িকে মাঝখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। অঞ্জনা বুঝতে পারে না প্রহার বা প্রেম কোন্‌টা কখন তার উপর নেমে আসবে। দুটোকেই সে সমানভাবে ভয় করে।

এই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। অঞ্জনা একে একে দু'টি সন্তানের মা হোল। দু'টি ছেলেকে কোলে-পিঠে নিয়ে সে বিষম ব্যতিব্যস্ত। অবস্থা বেগতিক বুঝে তার সেই মনের শিকারী তাকে ছেড়ে অন্য শিকারের অন্বেষণে চলে গেছে। সংসারের অভাব-অনটন বেড়ে গেছে। অঞ্জনা খেটে খেটে হয়রান। তার সেই চেহারা আব নেই। সাত্যকি যা উপার্জন করে, সংসার তার ভাগ পায় না। সে যা পায়, সবটাই প্রায় উড়ায়। সংসারেব বোঝা আর সকলের চক্ষু-শূল হয়ে দাঁড়াল সে। অমন-যে শাশুড়ী, সেও পাড়ায় তার নিন্দে রটিয়ে বেড়ায়। অঞ্জনা কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। লাজ-লজ্জা নাই, মার খায় আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। মাবতে মাবতে সাত্যকিও যেন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, আজকাল আর বেশী হাত উঠতে চায় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ক'বছবের উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর একঘেয়েমির চাপ তাব কাছে ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছিল। কিন্তু ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, জুয়া, সুরা আর বারাঙ্গনার সেই একঘেয়ে চক্রের মধ্যেই তাকে ঘুরে-ফিরে মরতে হবে। এই চক্রব্যূহ ভেদ করে বেবিয়ে আসবার পথ তার জানা নেই।

ঠিক এই সময় সুদর্শন ফিরে এল। সে বিদ্যা-লাভেব আশায় বিদেশে গিয়েছিল। এই কয় বছর পর সেখানকার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে তার বন্ধু সাত্যকির জীবনের আমূল

পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর মুখ থেকে, ওর মুখ থেকে সবিস্তারে সমস্ত কথাই সে শুনল। কিন্তু এর অনেক কথাই সে বিশ্বাস করতে পারে নি। কেননা, সাত্যকিকে তার চেয়ে বেশি করে জানে কে? তা'ছাড়া তাদের সহপাঠীরা সবাই-যে সাত্যকির বিরুদ্ধে এ কথা তার অজানা নয়। এই নিন্দা রটানো হয়তো তাদেরই কাজ।

দু'জনে দেখা হতেই সাত্যকি ভীষণ চমকে উঠল—এ কি, সুদর্শন! কি আশ্চর্য, এই ক'বছর একবারও তার কথা মনে পড়ে নি। অথচ তারা দু'জন কি বন্ধুই না ছিল! এটা কেমন করে সম্ভব হোল! ভাগ্যিস, কেউ কারু মনের কথা টের পায় না। সুদর্শন বলল, আসবার সময় সারা পথে শুধু তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছি।

একটি মাত্র কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাতেই সাত্যকির অন্ধকার মনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কথায় কথায় সেই দিনের কথা উঠে পড়ল। সুদর্শন বলল, সেদিন গুরুদেব তোমার উপরে খুবই অন্যায় করেছিলেন, ছাত্রেরাও অন্যায় করেছিল। এ কথা গুরুদেবকে আমি স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি? তুমি সেদিন ওদের সঙ্গে ছিলে, না?

আমি? আমি থাকব ওদের সঙ্গে! ছি ছি, এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? আমিও তো সেদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানকার সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করলাম।

সাত্যকি অবাক হয়ে বলল, বল কি তুমি? কই, আমি তো কিছুই জানতাম না।

কেমন করে জানবে বল। দু'দিন পর্যন্ত আমি তোমাকে খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না। কোথায়-যে তুমি ছিলে, তুমিই জান। তার পর হঠাৎ আমার বিদেশে যাওয়া স্থির হয়ে গেল। সহযাত্রী পেলাম,

তখনই যাত্রা করতে হোল। যাবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখাটা পর্যন্ত করে যেতে পারলাম না, একি আমার কম দুঃখ!

আর আজ এত দিন বাদে—

সুদর্শনের কথাগুলি সাত্যকিকে কেমন যেন উন্মনা করে তুলল। সে বলল, হ্যাঁ, আজ এতদিন বাদে। কিন্তু আমার মনে আজ কি হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, তুমি যদি কাছে থাকতে, তা হ'লে আমার হয়তো এ দশা হোত না। আমার-যে আপনার বলতে কেউ রইল না। তাই তো আমি এমন করে ভেসে গেলাম।

সুদর্শন চমকে উঠল, সাত্যকির এমন করুণ কণ্ঠস্বর আর কোনদিন সে শোনে নি।

কি হয়েছে ভাই? সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করল সুদর্শন।

সঙ্গে সঙ্গেই সে লক্ষ করল, ওর দু' চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তুমি কাল এসেছ, এর মধ্যে আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনেছ।

সুদর্শন উত্তর দিল, হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু আমি ওসব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করি না।

ওরা যা বলছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ওরা একটুও মিথ্যা বলে নি বা অতিরঞ্জিত করে নি।

এসব বলছ কি তুমি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমি আমার সংসারের সর্বনাশ করেছি, আমার শাশুড়ী, পত্নী, সন্তান সকলের সর্বনাশ করেছি। কিন্তু সব চেয়ে সর্বনাশ করেছি আমার নিজের, যার কোন প্রতিকার নেই।

সুদর্শন দৃঢ় স্বরে বলল, এ কোন কথাই নয়। এমন কোন পাপ নেই, যার কোন প্রতিকার নেই।

সাত্যকি ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিল, পাপ সম্বন্ধে তোমার

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, তাই তুমি এমন কথা বলছ। শোন সুদর্শন, আমি পাপ করেছি, প্রকাশ্যেই করেছি, তা সবাই দেখেছে। কিন্তু কত দিন আমি অনুতাপে দগ্ধ হয়ে কেঁদেছি, কতবার কত সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি সে কথা তো কেউ জানে না। পাপ-পঙ্কে মগ্ন হয়েও আমি মাঝে মাঝে চমকে উঠেছি, স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি, আমার বাবা আর মা কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, কি অসহ্য বেদনা ঝরে পড়ছে সেই দৃষ্টি থেকে, তবু আমি আপনাকে মুক্ত করতে পারি নি। এ পাপের নেশা এমন নেশা যার প্রতিক্রিয়া মানুষকে দগ্ধ করে মারে, কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় আসে তখন কে যেন তাকে সবলে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কোন বাধা মানে না। পাপের মধ্যে ডুবে যাবার দুর্ভাগ্য যাদের হয় নি, এই মর্মন্তুদ কাহিনী তারা কেমন করে জানবে!

দুই বন্ধু বহুক্ষণ ধরে এই ভাবে কথোপকথন করল। পরদিন সকাল বেলা সুদর্শন সাত্যকির বাড়িতে গিয়ে দেখল সাত্যকি নেই। এ সময় সে সুদর্শনের জন্য অপেক্ষা করবে, এই রকমই কথা ছিল। কোথায় গেল সাত্যকি? ওর বাড়ির লোকেরা বলল, রোজ এই সময় জুয়ার আড্ডায় যায়। আর কোথায় যাবে? সেখানেই গেছে। সুদর্শন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। সারাদিন সে তাকে খুঁজে মরল। কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তার পরদিন ভোরবেলা ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনল দিন গেছে, রাত্রি গেছে, কিন্তু সে আর বাড়ি ফিরে আসে নি। তার পরদিনও সাত্যকি বাড়ি ফিরল না। তার পরদিনও না। তখন সবাই বুঝল সাত্যকি আর ফিরবে না। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সেই নিরুদ্দেশ হবার পর তিন বছর কেটে গেছে। সকলেরই ধারণা সাত্যকি আর ফিরবে না। এমন সময় সকলের এই ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে সাত্যকি এসে উপস্থিত হয়েছে। সুদর্শন অবাক হয়ে দেখল সাত্যকির মুখে সেই গ্লানির কালিমা নেই। সে যেন তার

সেই পুরানো দিনে ফিরে গেছে। না, তাও নয়। আরও একটা নূতন কিছু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে। নূতন স্বাস্থ্যের আভায় ওর মুখ ঝলমল করছে। যেন প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে ওর জীবন। সেদিনকার সেই কঠিন অন্তর্জ্বালা নেই, হাহাকার নেই, অতৃপ্তি নেই। সে যেন নূতন প্রাণশক্তিতে টলমল করছে। সুদর্শন আপনাকে আপনি প্রশ্ন করল, এর নাম কি ?

ছয়

আশ্চর্য সাত্যকি, তুমি এখনও সেই বিষাক্ত চক্রের মধ্যেই ঘুরে মরছ! এতকাল নিরুদ্দেশের পর তুমি ফিরে এলে, এসে আমার সঙ্গে দেখা করবার কথাটাও তোমার একবার মনে পড়ল না, তুমি সোজা চলে গেলে তোমার সেই জুয়ার নরকে। কিন্তু কই সেজন্য তোমার একটুও তো সঙ্কোচ নেই।

তিন বছর বাদে সাক্ষাৎ হবার পর সুদর্শন এই কথা দিয়েই প্রথম আলাপ শুরু করল। সাত্যকির বাড়ি থেকে বাইরে এসে ওরা যদৃচ্ছা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল। ছাত্রজীবনে মাঝে মাঝেই এমন করত। এই অনির্দিষ্ট ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কত দিন ওরা কত কথা কাটাকাটি, কত তর্কবিতর্ক করেছে, কত কিছু নিয়ে আলোচনা করেছে। সাত্যকি কোথা থেকে সব নতুন নতুন কথা আর প্রশ্ন নিয়ে আসত, গুরুর মুখে যে-সব কথা কোন দিনই শোনে নি। সাত্যকির মুখে কথা যেন বৃষ্টির মতই ঝরে পড়ত। তার অনেক কথাই সে গ্রহণ করতে পারে নি, মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু অদ্ভুত সেই কথার শক্তি, যেন মন্ত্রশক্তির মত তা তার মনের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলত, আর তার ভাবনা সজাগ আর সক্রিয় হয়ে উঠত। সেজন্য সাত্যকির কাছে সে-যে কতদূর ঋণী, সুদর্শন সে সম্বন্ধে সচেতন। আর সেই সাত্যকির আজ এই দশা! পাশবদ্ধ পশুর মত সে যেন জালের সঙ্গে ক্রমশই আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়ছে। তবে এই কি তার ভবিতব্য?

কিন্তু অপরূপ সুন্দর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাত্যকির মুখ। পাপ-পঙ্কের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন থেকেও এমন হাসি কি কেউ হাসতে পারে!

বন্ধু, সব কথা জান না, তাই একটু কম করেই বলেছ তুমি। শুধু জুয়ার নরক নয়, আমার পুরানো পরিচিত যে-ক'টা নরক এখানে ছিল, এইটুকু সময়ের মধ্যে সব জায়গায় ঘুরে দেখে এসেছি। নিজকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম তোমার মত বন্ধুকে বুকভরা আলিঙ্গন দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছি কিনা। গিয়ে দেখি ওসব আমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। একদিন অশুচি বিষ্ঠা-ভোজী শুকরের মত যে-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে তৃপ্তি পেতাম, আজ তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম—এই আমি কি সেই আমি? কিছু না, কিছু না, ওসব রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত। ঘুম ভেঙে গেল, তার সঙ্গে সেই দুঃস্বপ্নও মিলিয়ে গেল।

কথা ফুটল না সুদর্শনের মুখে। গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে।

শরতের সোনালী রোদ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার উপর সুপ্রসন্ন নীল আকাশ থেকে কার স্নেহাশীর্বাদ ঝরে ঝরে পড়ছে। এমন একটা নির্মল দিন কতকাল পরে ওদের কাছে ফিরে এসেছে। ওরা দু'জন হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলল।

শোন সুদর্শন, এই পৃথিবীটা অনেক, অনেক, অনেক বড়। ওরা জানে না, যা বলে সব ভুল বলে। জনপদের পর জনপদ, নগরের পর নগর, বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড়, পৃথিবীর কোন সীমা নেই, তার আদি অন্ত খুঁজে পাবে না। আর সেই পৃথিবীর বুকে কত রকমের বিচিত্র মানুষ, তুমি তাদের কথা কিছুই জান না। তারা কেউ কৃষ্ণ, কেউ শ্যাম, কেউ পীত, কেউ পিঙ্গল, কেউ ধূম্রবর্ণ, কেউ তাম্রবর্ণ, কত মানুষ! আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে মহাসমুদ্রে বিন্দুর মত গৌরবর্ণ আর্য জাতি এখানে ওখানে বাস করছে। এক এক জাতির এক এক রকম ভাষা। পশুপাখির ভাষার মত তাদের কথাও তোমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হবে। তারাও তোমার কথা বুঝতে পারবে না। এদের কথা কিছুই আমরা জানি না।

জানব না কেন? যক্ষ-রক্ষ-দৈত্য-দানব-অসুর, কিন্নর, বিদ্যাধর শাস্ত্রে এদের সবারই উল্লেখ আছে। কিন্তু ওরা মানুষের মত হলেও মনুষ্যবর্গভুক্ত নয়। বনের মধ্যে আর এক রকম প্রাণী আছে' তাদের আকৃতিও কতকটা মানুষেব মতই, কিন্তু তারা মনুষ্যেতর প্রাণী। তবে অন্যান্য পশুদের চেয়ে ওরা অনেক উন্নত। এদের বুদ্ধিবৃত্তিও অনেকটা মানুষের মতই। এরা ঘরবাড়ি তৈরি করে, আগুন জ্বালায় আর পাথর ঘষে অস্ত্র বানায়। তা'ছাড়া এখানে ওখানে মনুষ্য বর্গভুক্ত নানা রকম অনার্য জাতিও আছে। এদের শাস্ত্র নেই, আচার নেই. ওরা পশুর মতই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। এদের কোন যজ্ঞ নেই। কে জানে এক কালে ওরা হয়তো বা আমাদের মতই মানুষ ছিল, পরে আপন কর্মফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই মানবে যে, পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলতে একমাত্র আর্যকেই বোঝায়।

সাত্যকি হেসে উঠল। কূপমণ্ডূক চেন সুদর্শন, আমাদের দশা হয়েছে তাই। কূপের বাইরে যে-বিরাট জগৎটা, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। এই মণ্ডূকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ মণ্ডূকগণ তাঁদের শাস্ত্রবাক্য নিয়ে মকমকান এবং মোটা হাতে রাজবৃত্তি আদায় করেন। এইভাবে একদল অন্ধ আর একদল অন্ধ-কর্তৃক নীয়মান হয়ে থাকে!

এটাই তোমার দোষ সাত্যকি। কথা বলতে বলতে তোমার আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অযোগ্য, ক্ষুদ্রমনা ও ক্ষুব্ধ প্রকৃতির লোক আছে মানি, কিন্তু অযোগ্যতা কার মধ্যে নেই? স্বয়ং দেবতারাও নিখুঁত বা নিষ্কলঙ্ক নন। কিন্তু তবুও এ কথা তুমি কখনই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র, আচার ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছেন। ভুলে যেও না, এই ব্রাহ্মণের কাছ থেকেই আমরাও বিদ্যা লাভ করেছি।

বিদ্যা না অবিদ্যা? তুমি কি নিজেকে বিদ্বান বলে মনে কর সুদর্শন? আমি কিন্তু করি না। আমি একদিন বিদ্যাই চেয়েছিলাম,

আমার কাছে তার চেয়ে বড় আর কিছুই ছিল না, কিন্তু আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে যে, গুরুদেব সেদিন বিদ্যার নাম করে আমাকে অবিদ্যাই গুলিয়ে খাইয়েছিলেন।

কেন, তোমার এই অসঙ্গত সন্দেহ কেন ?

কেন জান, এক বোঝা বিদ্যালাভের পর এবার পৃথিবীর সঙ্গে আমার মুখোমুখী পরিচয় ঘটল। গিয়ে দেখি আমার বিদ্যার সাহায্যে আমি যা জানি, কোনটাই তার সঙ্গে মেলে না। এতদিন আমি সোজা জিনিসকে বাঁকা, আর বাঁকা জিনিসকে সোজা বলে জেনে এসেছি। বল, ওর নাম কি বিদ্যা না অবিদ্যা ; একটু আগেই তুমি বললে যে, পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলতে এক মাত্র আর্যকেই বুঝায়। আগে আমিও ঠিক এই কথাই মনে করতাম। কেননা গুরুদেব আমাদের এই কথাই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আমি স্বচক্ষে দেখলাম আর্যদের চেয়েও আরও সব উন্নত জাতি রয়েছে। আমি তাদের মধ্যে থেকেছি, আমি তাদের দেখেছি এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছি। কিন্তু সে অনেক কথা, যদি কখনও সময় পাই, তখন বলব।

সাত্যকি, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারি না, কিন্তু আশ্চর্য কথা তুমি শোনালে। আচ্ছা, তাঁরা কি গৌরবর্ণ ?

না, তাঁরা তাম্রবর্ণ।

গৌরবর্ণ কি তাম্রবর্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় ?

না, বর্ণ দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় না।

তাদের বেদ আছে ?

না।

তবে ?

তাদের নিজেদের শাস্ত্র আছে। তাদের নিজেদের দেবদেবী আছে, তাঁদের তারা পূজো করে।

বেদের বাইরে কি কোন শাস্ত্র হতে পারে ?

পারে না, তাই তো এতদিন জানতাম। এই শিক্ষাই পেয়ে-

ছিলাম। কিন্তু সুদর্শন এখন আমাকে-যে আবার সব কথাই নতুন করে শিখতে হচ্ছে।

যুক্তি দিয়ে বোঝাও। 'বেদ বহির্ভূত শাস্ত্র'-কথাটা কি আত্ম-বিরোধী নয়?

না না, আজ যুক্তি নিয়ে কাটাকাটির খেলা নয়। সে যদি হয়, পরে হবে। আজ তোমায় শুধু কাহিনী শোনাব, দেশ-বিদেশ আর জাত-বিজাতের কাহিনী। এসব কাহিনী তোমার শাস্ত্রের মধ্যে পাবে না। এসব সত্যিকার কথা, শাস্ত্রের কথা নয়।

সুদর্শন তাকে বাধা দিয়ে বলল, তার মানে? শাস্ত্রের কথা বুঝি সত্যিকার কথা নয়? না, তুমি সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, সাত্যকি।

সাত্যকি হেসে বলল, আমি তো চিরদিনই এমনি। আমাকে কেউ কোনদিন সহ্য করতে পারে নি, একমাত্র তুমিই আমাকে সহ্য করে এসেছ। আমাকে সহ্য না করবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দেন নি।

সুদর্শন তার কথা শুনে না হেসে পারল না, বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, শোনাও তোমার কাহিনী।

এক দেশে গেলাম। সেখানে এক মজার রীতি। সেখানকার লোকেরা গরুকে পুজো করে। জিজ্ঞাসা করলাম, এই পুজোর বিধান তোমরা কোন্ শাস্ত্রে পেয়েছ? তারা উত্তর দিল, সে কি গো, গরু-যে আমাদের আদি মাতা। তারা আরও বলে, মরবার পর এই আদি-মাতা গরুর লেজ ধরে নদী পার হয়ে তারা স্বর্গে চলে যাবে।

সুদর্শন হেসে উঠল।

উঁহু, হাসবার কথা নয়। আমি যদি তখন তোমার মত অমন করে হেসে উঠতাম, তা হলে তারা হয়তো আমাকে মেরেই ফেলত। গরু নিয়ে বিদ্রূপ তাদের সহ্য হয় না। আর এক কথা, তাদের দেশে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরাও তো দুগ্ধবতী গাভীকে 'অঘ্নেয়' বলে বিধান দিয়েছেন।

না না, শুধু দুগ্ধবতী গাভী নয়, বৃষের মাংসও তারা খায় না।

বৃষের মাংসও খায় না! তবে তারা খায় কি?

কেন, অন্যান্য পশুর মাংস খায়। সে দেশে কেউ গো-হত্যা করলে তাকে নর-হত্যার মতই দণ্ড পেতে হয়। তা'ছাড়া, তার পরিবারকে এবং জ্ঞাতিবর্গকে এজন্য কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

এমন নির্বোধ জাতিও এই পৃথিবীতে আছে? একেবারেই বর্বর।

না না, বর্বর নয়, এরা উন্নত জাতি। এরা সুগৌর আর্যদেরই একটি শাখা।

এবার সুদর্শনের মুখ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই গম্ভীর ও থমথমে হয়ে উঠল।

ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি হেনে সে বলল, সত্যি করে বল, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছ না তো?

না, এসব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সাত্যকি বলে চলল: এক দেশ আছে, সেখানকার লোকেরা প্রাণী-হিংসাকে সবচেয়ে বড় পাপের কাজ বলে মনে করে। তাই তারা কোন পশু বা পাখির মাংস খায় না।

বল কি? তা হলে তারা বেঁচে থাকে কেমন করে?

তারা ফলমূল খায়, শস্যের দানা খায়, গো, মহিষ ও ছাগের দুগ্ধ পান করে। আর এই খেয়েই বেঁচে থাকে।

পশু-হত্যা করে না, তবে যজ্ঞ করে কেমন করে?

তারা তো যজ্ঞ করে না।

ও, তবে তারা বর্বর?

না না, বর্বর নয়, আমাদের মতই সভ্য জাতি। তবে জ্ঞান আর বুদ্ধির চর্চায় ওরা আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

ওদের বেদ আছে?

না, ওদের বেদ নেই।

তবু তুমি তাদের সভ্য বলছ?

হ্যাঁ, বলছি। তুমি দেখলে তুমিও তাই বলতে।

তারা কি গৌরবর্ণ?

না, শ্যামবর্ণ।

অদ্ভুত, অদ্ভুত। তুমি বলছ বলেই আমি বিশ্বাস করছি। আর কেউ বললে বিশ্বাস করতাম না।

আর এক কথা শোন। কৃষি-কর্ম করতে গেলে কীট-পতঙ্গ হত্যা করতে হয় বলে ওরা কৃষিকর্মকে পাপের কাজ বলে মনে করে।

কৃষি-কর্ম পাপের কাজ? তবে কি ওরা কৃষি-কর্মও করে না?

না, করে। ওদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যারা, পাপের কাজটা তাদেরই করতে হয়। আর উপরের দলের লোক যারা, তারা এই পাপ-কর্মটা এড়িয়ে যায়। অবশ্য তাই বলে পাপ-কর্মজাত শস্যাদি ভক্ষণে তারা কোনই আপত্তি করে না।

বাঃ, ভারী মজার কথা তো। পাপের বোঝাটা ওদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা বেশ আলগা থেকে থাকে।

মজার কথাই তো। কেন, আমরা কি করি এখানে? যত অশুচি আর আবর্জনা ঠেলার কাজ আমরাও তো শূদ্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছি। আর কৃষি-কর্মের কথাই যদি বল, আমরাও তো কৃষি-কর্মকে হালের বলদ আর শূদ্রদের উপরেই চাপিয়ে দিয়েছি। তুমি আমি কৃষি-কর্ম করি না। কিন্তু খাবার সময় ওদের চেয়ে কিছু কম করে খাই?

—আহা, আমাদের কথা আলাদা। আমাদের তো বর্ণাশ্রমের প্রথা-অনুসারে কর্মবিভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

ওদেরও তো তাই। বর্ণাশ্রমের পদ্ধতিটা কি আমাদেরই একচেটিয়া? ওটা আর কারু মাথায় আসতে পারে না?

সুদর্শনের মুখে আবার একটা গাম্ভীর্যের ছায়া ভেসে উঠল। সে

বলল, সাত্যকি, এই একটা বছরে তোমার অনেক পারিবর্তন হয়েছে। তুমি কথায় কথায় খোঁচা মারতে শিখেছ। আগে তো এমন ছিলে না।

সাত্যকি হেসে বলল, বোধ হয় ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা জেনো, আমি শুধু পরকেই খোঁচা মারি না, এ খোঁচা আমার নিজের গায়েও লাগে।

দু'জন যুবক বিপরীত দিক থেকে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিল। সুদর্শনের দিকে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরে সুদর্শন যে, অনেকদিন দেখি না তোমায়, কোথায় থাকো?

সুদর্শন আর সাত্যকি ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাল। ওরা সাত্যকিকে আগে লক্ষ করে নি। সাত্যকিকে দেখেই ওদের মুখের ভাব বদলে গেল। আর কোন কথা না বলে যেমন হন্ হন্ করে চলছিল, তেমনি করেই ওদের ছাড়িয়ে চলে গেল।

সুদর্শন আশ্চর্য হয়ে বলল, এ আবার কি? চিত্ররথ আর সুধন্বা না? কিন্তু ওরা ডাকলই কেন, আবার এমন করে হঠাৎ চলেই বা গেল কেন?

সাত্যকি হো হো করে হেসে উঠল।

বুঝতে পারলে না, চাঁদের মধ্যে কলঙ্কের মত তোমার সঙ্গে আমাকে দেখতে পেয়ে ওবা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। আর আমাকে-যে ওরা কত ঘৃণা করে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই ওরা এমন করে চলে গেল।

কেন, ঘৃণা কেন?

ঘৃণা কেন? তোমাকেও আবার বলতে হবে নাকি? কোন্ কথা তোমার জানা নেই? প্রথম কথা, আমার গায়ের রং তোমাদের মত গৌর নয়, আমি অনার্যা মায়ের সন্তান। গুরুগৃহে শিক্ষাকালে ওরা আর আমাদের অন্যান্য সহপাঠীরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত, সে কথা তোমার মনে নেই? দ্বিতীয় কারণ, আমি দ্যূতাসক্ত

ও দুশ্চরিত্র। ঘৃণা তো করতেই পারে। আমি নিজেই কি নিজেকে কম ঘৃণা করেছি? কিন্তু চিত্ররথ আর সুধন্বা, ওরাও আমাকে ঘৃণা করবে? শ্রুতকীর্তি আর তার এই দলবল, এদের কীর্তি-কাহিনী আমার তো কিছুই অজানা নেই। শূদ্র পল্লীর বউ-ঝিরা ওদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

না, সাত্যকি, আমি তোমার এ কথা মানতে পারি না। এ যদি তুমি শুনে থাক, ভুল শুনেছ।

শ্রুতকীর্তিকে আমি ভাল করেই জানি। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই মতে মেলে না। আর তার ব্যবহারটাও বড় রূঢ়। কিন্তু যা বলছ, সে কাজ তাকে দিয়ে সম্ভব নয়, কখনোই নয়।

কেন নয়?

আমি দেখেছি শূদ্রদের সে মোটে মানুষ বলেই মনে করে না, পশুর মতই ঘৃণা করে। সেই শূদ্র মেয়েদের নিয়ে—

পশুর মাংস কি আমরা খাই না?

কিসের সঙ্গে কি, এ কি মাংস খাওয়ার কথা হচ্ছে?

আচ্ছা, মাংস খাওয়ার কথা না-ই বা হোল। কিন্তু এমন মানুষ কি নেই যাদের পশুর সঙ্গে সঙ্গম করতে যাদের রুচিতে বাধে না?

ছি ছি, এ কি কুৎসিৎ কথা তোমার মুখে! এই বাৎসরিক কাল অনার্য সংসর্গের ফলে তোমার জিহ্বা এতই শ্লথ হয়ে পড়েছে, কোন কিছু বলতেই বাধে না। কোন আর্য সন্তান এমন কথা ভাবতেই পারে না।

সাত্যকি হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ সুদর্শন, আমি অনার্যা মায়ের সন্তান।

সুদর্শন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমায় ক্ষমা কর সাত্যকি, আমি ওভাবে কথাটা বলি নি।

ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার মুখের কথা দিয়েই আমি তোমাকে বিচার করি না, আমি তোমাকে চিনি। কিন্তু শাস্ত্রের

মধ্যেই ডুবে রইলে সুদর্শন, আসল পৃথিবীটার দিকে একবার চেয়ে দেখলে না। পশুর সঙ্গে সহবাসের কথা শুনে তুমি একেবারে আঁতকে উঠেছো। অথচ কত বিচিত্র ঘটনা ঘটছে এই পৃথিবীতে! তবে শোন, আমি এক সম্প্রদায়ের মানুষ দেখেছি, মৈথুন যাদের দেবার্চনার প্রধান অঙ্গ। তারা তাদের পর্বাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের দেবতার সামনে স্ত্রী-পুরুষেরা মিলিত হয়ে প্রকাশ্য ভাবে মিথুনরত হয়। এটাই তাদের ধর্ম।

হ্যাঁ, আমি জানি। শাস্ত্রে সেই সমস্ত জাতিকে শিশ্নদেব বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তো অন্ধ, অজ্ঞান, বর্বর জাতি, তাদের তো হিতাহিত জ্ঞান নেই।

তারা অন্ধ, অজ্ঞান ও বর্বর, কিন্তু তোমার এই চক্ষুষ্মান, প্রজ্ঞাবান ও সুসভ্য আর্যদের যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের দু'-একটি বৈদিক মন্ত্র যদি তোমাকে শোনাই, তবে তা সহ্য করতে পারবে?

তোমাদের বাড়ি থেকে বের হবার পর থেকে এ পর্যন্ত তুমি ক্রমাগত আমার সহ্যশক্তির পরীক্ষা করে চলেছ, আমি কি তাতে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছি?

সাত্যকি বলল, আচ্ছা তবে শোন, শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা থেকে এই দু'টি মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

এই স্ত্রীকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো। পর্বতে যেমন করিয়া ভার উত্তোলন করে। অনন্তর ইহার মধ্যদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

ঊর্ধ্বে এই পুরুষকে তুলিয়া ধরো। যেমন করিয়া পর্বতে ভারবস্তুকে উত্তোলন করা হয়। অনন্তর ইহার মধ্যদেশ চলিতে থাকুক।

এর অর্থ কি?

তুমি বৈদিক ভাষায় সুপণ্ডিত। এর অর্থ আমি তোমার কাছেই জানতে চাইছি।

এর অর্থ আমার অধিগম্য নয়।

এর অর্থ বুঝতে পারছ না, না? চেষ্টা করে দেখো, আমি তোমার

সাহায্যের জন্য যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বৃহদারণ্যক থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এসো, আমি ইহার জন্য একটি প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করি। তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন। তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার অধোদেশে মিলিত হইলেন। সেই কারণে স্ত্রীর অধোদেশে মিলিত হওয়া উচিত।

সেই স্ত্রীর উপস্থ বেদি, তার লোম যজ্ঞতৃণ, তার চর্ম অধিযবন, তার মুস্কদ্বয় মধ্যস্থ অগ্নি। বাজপেয় যজ্ঞকারীর কাছে জগৎ যত বৃহৎ, এই তত্ত্ব জেনে যে মৈথুন করে তার কাছেও এই জগৎ তত বৃহৎ। সে স্ত্রী দ্বারা নিজে শক্তিমান হয়।

আরও শোন ছান্দোগ্যের ঋষি কি বলছেন,

হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হইল যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হইল সমিধ। ওই আহ্বানই হইল ধূম। যোনিই হইল অগ্নিশিখা। প্রবেশ ক্রিয়াই হইল অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হইল বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা রেত আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতেই গর্ভ সম্ভব হয়।

তোমাকে বিশেষ চিন্তাকুল মনে হচ্ছে। এবার অর্থটা বোধ হয় কিছু স্বচ্ছ হয়ে আসছে, তাই নয় কি?

তুমি কোথায় পেলে এই মন্ত্র? এ মন্ত্র-যে বৈদিক মন্ত্র তারই বা প্রমাণ কি? আমি বহু যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান দেখেছি, কিন্তু কই, কোন দিন এসব মন্ত্র তো শুনি নি। তুমিই কি শুনেছ?

না, আমিও শুনি নি। এসব মন্ত্র এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর প্রচলন নেই। বোধ হয় আধুনিকদের রুচিতে বাধে, এ-সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে তাঁরা লজ্জা পান।

বেদ স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি, বিশুদ্ধ সত্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা। এ তো আর মানুষের হাতের ত্রুটিপূর্ণ কাজ নয় যে, তাতে লজ্জা পাবার, ঢেকে রাখবার বা অংশবিশেষ বর্জন করবার কথা উঠতে

পারে। প্রাচীন আর আধুনিকের ভেদ-জ্ঞান এ ক্ষেত্রে অচল। বেদ কি কাল্-নিরপেক্ষ নয়?

তোমার যুক্তিটা তেমন শক্তিশালী যুক্তি নয়। প্রজাপতির সৃষ্টি নিখুঁত, আপাতত তোমার এই কথাটা তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম। ঈশ্বর তোমাকে যাবতীয় পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের মত উলঙ্গ করেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তুমি স্থান-বিশেষ আবৃত না করে মনুষ্য সমাজে বেরোতে পার না, লজ্জা পাও। কেন, এ কথার উত্তর দাও।

এবার সুদর্শন না হেসে থাকতে পারল না। বলল, তোমার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠবার জো নেই, এ কথা আমি সব সময়ই স্বীকার করি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় সাত্যকি, এগুলি বৈদিক মন্ত্র নয়। বিকৃত-রুচি আর্য-ধর্মবিরোধী লোকেরা আমাদের হেয় করবার জন্য এ সমস্ত মন্ত্র রচনা করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়ায়। আর সত্য-সত্যই যদি বৈদিক মন্ত্র হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে মিথুনের রূপকের মধ্য দিয়ে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে।

রূপক-রূপক-রূপক! এই রূপকের কথা শুনে শুনে প্রাণ বেরিয়ে গেল আমার। তোমাদের জীবনের সবটাই কি রূপক? সত্য বলে কি কিছুই নেই? যে যখন যেখানে আটকে পড়ে যায়, অমনি সমা-ধানের জন্য রূপকের আশ্রয় খোঁজে। এই রূপকের প্রহেলিকায় পড়েই আমাকে একদিন গুরুর কৃপায় লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। গুরু রূপকের ব্যাখ্যা দিয়ে সত্যের মুখ চাপা দিয়ে বন্ধ করতে চাইলেন। আমি তাতে প্রতিবাদ করেছিলাম। এই আমার অপরাধ। মনে নেই তোমার?

মনে আছে বই কি। কিন্তু দোষ কিছুটা তোমারও আছে। গুরুদেবের সঙ্গে ওরকম উদ্ধত ভাবে কথা বলা সেদিন তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নি।

না, আমি তোমার কথা মানি না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি। তেমনি যুক্তি আর প্রতিযুক্তির ঘর্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

এর নাম ঔদ্ধত্য নয়। কিন্তু তুমি সব কথা জান না। সেদিনকার ঘটনার আগেকার একটা ইতিহাস আছে। আজ তোমাকে যে-মন্ত্র ক'টি শোনালাম, সেই মন্ত্র নিয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে আমি গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলাম। বললাম, গুরুদেব, এই মন্ত্রের তাৎপর্য আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন।

মন্ত্র উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি বললেন, এসব মন্ত্র তুমি কোথায় পেলে?

আমি তাঁর এই ক্রোধের কারণ বুঝতে পারলাম না, নম্র কণ্ঠেই বললাম, আমি যেখানে যা পাই, তাই সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই আমি এই মন্ত্র পেয়েছি। আমার এই কথায় অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। তিনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন—তুমি কি শাখামৃগ যে. বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে যথেচ্ছ বিচরণ করবে? আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি, তুমি একনিষ্ঠ চিত্তে আমার অনুসরণ করে চলবে। তোমাকে পথ ছেড়ে বিপথে যাবার অনুমতি কে দিয়েছে? কোন্‌টা তোমার শিক্ষনীয়, আর কোন্‌টা নয়, সে সম্বন্ধে আমিই তোমাকে নির্দেশ দেব।

আমি তাঁর এই আকস্মিক ক্রোধের কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু তবু আমি ধৈর্য হারাই নি, আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললাম, গুরুদেব, আমি জিজ্ঞাসু হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে এই মন্ত্রের যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও জিজ্ঞাসুকে কি কখনও প্রত্যাখ্যান করা চলে! কিন্তু তিনি আমার কথা যেন শুনেও শুনতে চাইলেন না। এই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেদিন থেকেই এত স্নেহের পাত্র আমি তাঁর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতেন না। কেন এমন হোল আমি কিছুই বুঝলাম না। স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনের মধ্যেও বিক্ষোভ জমে উঠতে লাগল। কিন্তু একটা আশ্চর্য কথা সুদর্শন, এ সম্পর্কে তুমি যে-দুটো কথা

বললে, তিনি কিন্তু একটারও ধার দিয়ে গেলেন না। এমন কথা তিনি বললেন না যে, এ মন্ত্র বৈদিক মন্ত্র নয়, অথবা যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের রূপক বলেও তিনি এর একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন না '

সুদর্শনের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। সাত্যকির কথা তার কানে যাচ্ছিল না। সে সাত্যকিকে হাতের ইশারা করে দেখাল, দেখ দেখ সাত্যকি, কে যাচ্ছেন দেখ।

সাত্যকি লক্ষ করে দেখে বলল, কে, উষস্তি চাক্রায়ন, না ?

হ্যাঁ, তিনিই। শিষ্য পরিবৃত হয়ে কোথায় যেন চলেছেন। কি আশ্চর্য মানুষ! মানুষ তো নন, নরদেহে দেবতা। দেশ-বিদেশে তাঁর এত খ্যাতি, রাজা তাঁর কথায় ওঠেন বসেন, গোকর্ণ প্রদেশের সমস্ত মানুষ তাঁর কথায় মন্ত্রমুগ্ধ! ভূমি, গাভী, ধন-সম্পদ যা চান তিনি তাই পেতে পারেন। তাঁকে কিছু দান করে ধন্য হবার জন্য রাজা থেকে আরম্ভ করে কত লোক তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। কিন্তু না, তিনি সকল কামনা-বাসনার উর্ধ্বে। তিনি কারু দান প্রতি-গ্রহ করেন না। রাজ্যের কল্যাণ আর সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজের কোন প্রত্যাশা নেই। এই সমস্ত মহামানবদের জন্যই আজ আর্যজাতির এই প্রতিষ্ঠা।

সাত্যকি বলল, হুঁ।

সুদর্শন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, হুঁ।

তার মানে, কথাটা যেন ঠিক তোমার মনোমত হোল না। তোমার হয়েছে কি সাত্যকি? তুমি দেখছি কারু মধ্যেই ভালো কিছু দেখতে পাও না। এ তোমাকে কোন্ রোগে ধরল! রাজ-পুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন অজাতশত্রু। এই একটি লোক যাঁর কোন শত্রু নেই, এবং যিনি কারু শত্রু নন। এমন লোকের বিরুদ্ধেও তোমার বক্তব্য আছে ?

আমি এতদিন বাদে দেশে এলাম। এখানকার খবরাখবর আমি কেমন করে জানব। তবে আসা মাত্রই নানা রকম কথা কানে এল। শুনতে পেলাম, রাজপুরোহিতের দল আর মন্ত্রীর দলের মধ্যে না'কি বিষম চুলোচুলি বেধে গেছে। আর দলাদলির সেই বিষ বেশ ভালমতই ছড়িয়ে পড়েছে।

সুদর্শন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, মিথ্যে কথা, রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন এ সমস্ত ঘৃণ্য দলাদলির বহু উর্ধ্বে। তাঁর নামে এ সমস্ত কথা প্রচার করা—ছিঃ, সাত্যকি, এ তোমার ভারী অন্যায়।

সুদর্শনের এই ধিক্কারে সাত্যকিকে মোটেই অনুতপ্ত বা লজ্জিত বলে মনে হোল না। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, অন্যায় আমার নয় সুদর্শন, অন্যায় তোমার। আমি শুধু বলেছিলাম 'হুঁ', একটি নির্দোষ 'হুঁ' মাত্র, কিন্তু তুমিই তো আমাকে খুঁচিয়ে তুললে। আর আমি যা বলেছি, আমার নিজের কথা তো নয়, যা শুনেছি তাই বলেছি। তাও আমি পথে-ঘাটে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে যাই নি, তোমার কাছেই শুধু বলেছি।

প্রচার তুমি কর নি, কিন্তু তোমার ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হয়, তুমি যেন এটা সত্যি বলে মনে মনে মেনে নিয়েছ। কিন্তু এটা কি অসম্ভব কথা নয়?

এইবার তুমি আমায় বিপদে ফেললে। কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব, তা কি আর এত সহজেই বলে দেওয়া যায়! তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সাত্যকির-যে একদিন এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটবে, তা কি তুমি কোনদিন সম্ভব বলে ভাবতে পেরেছিলে? এই সংসারের এমন বিচিত্র গতি যে, সময় সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়।

কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো, বিষয়-বাসনা যাঁর কাছে তুচ্ছ, তিনি কোন্ মোহে দলাদলির আবর্তে গিয়ে পড়বেন? তা ছাড়া তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন কে আছে? কার সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্ব

করবেন? কার ইঙ্গিতে এই রাজ্যের শাসনকার্য চলছে, তা কি আমরা জানি না?

এইবার তুমি ঠিক জায়গায় এসেছ। বিরোধের মূল হয়তো ওখানেই। আমি কিছু জানি না, কিন্তু তুমি নিজেই তো বলছ—রাজপুরোহিতের ইঙ্গিতে রাজ্যশাসন চলছে। এটা স্বাভাবিকও নয়, সঙ্গতও নয়। রাজ্যশাসনের জন্য রাজা আছেন, মন্ত্রী আছেন, রাজসভা আছে। প্রাচীনকাল থেকে এই রীতিই চলে আসছে। এখন রাজপুরোহিত যদি নিজের সীমা লংঙ্ঘন করে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে হাত দিতে আসেন, সেটা হবে তাঁর অনধিকার চর্চা।

কিন্তু যদি তিনি তা করেও থাকেন, তবে তা রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই করছেন।

এ সম্বন্ধে এক এক জন এক এক ভাবে চিন্তা করতে পারে। তুমি বলবে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, আর আমি বলব শক্তির লোভে। যার জন্যই হোক, কাজটা কিন্তু অনধিকার চর্চাই হবে। এটা খুবই স্বচ্ছ সত্য যে, রাজপুরোহিতের কাজ এটা নয়। কাজেই এই ভাবে যাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তারা স্বাভাবিক ভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এই ভাবেই তো আত্মকলহ আর দলাদলির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কিন্তু রাজা তো রাজপুরোহিতের একান্ত অনুগত, তা হলে পরস্পরের মধ্যে গোলমাল বাধবে কেন?

রাজা তো একাই নন, মন্ত্রী আছেন, সভাসদরা আছেন, অন্যান্য রাজপুরুষরা আছেন, তাঁদের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? হয়তো বর্তমান ব্যবস্থায়, তাঁদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে, হয়তো বা তাঁদের কথার কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না, হয়তো বা রাজপুরোহিতের নীতির সঙ্গে তাঁদের নীতি মিলছে না। এখন এই নিয়ে দু'পক্ষে যদি সংঘাতের সৃষ্টি হয়, সেটা কি একটা অসম্ভব কথা?

অনেকগুলি কল্পিত 'হয়তো'র কথা বললে। সে-সব অভিজ্ঞতা

আমার নেই কিন্তু আমাদের রাজ্যের তেমন কোন সমস্যা তো নেই, এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সুখে-শান্তিতে আছে। এখানে আত্মবিরোধ দেখা দেবে কেন ?

তোমাদের এখানে কোন সমস্যা নেই, না সুদর্শন ? শাস্ত্রের মধ্যে চোখ-কান ডুবিয়ে রাখলে কোথায় কি ঘটছে, কেমন করে জানবে ? বিধাতা চোখ-কান দিয়েছিলেন শুধু শাস্ত্রালোচনার জন্যই নয়. পথ-ঘাট দেখে চলবার জন্যও বটে ! তুমি জান, কর্ষকদের উপর রাজবলির ভাগ বাড়ানো হয়েছে ? এতকাল তাদের উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হোত, আগামী ফসল থেকে চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।

সে কি, ছয় ভাগের এক ভাগ—এই ব্যবস্থা তো অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। এই বিধিই তো স্মৃতিসম্মত।

আমিও সেই রকমই জানি। কিন্তু কর্ষকদের কাছে নাকি নূতন এই ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।

কেন, হঠাৎ এত দিনের এই প্রথার পরিবর্তনের হেতুটা কি ?

হেতুটা তো খুব পরিষ্কার—রাজকোষে ধনাগম বৃদ্ধি। কিন্তু মন্ত্রী এবং আরও কেউ কেউ নাকি এর বিরোধী। তাঁরা বলেন, আমাদের রাজার প্রপিতামহের আমলে এই রকম একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তার ফল হোল মারাত্মক। শূদ্র কর্ষকেরা ক্ষেপে গেল, সারা দেশময় শুরু হয়ে গেল মারামারি কাটাকাটি। শেষে দলে দলে শূদ্র দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই ঘা শুকোতে বহু দিন লেগেছিল। অনেক ঘা খেয়ে শেষপর্যন্ত আবার সেই সনাতন ব্যবস্থাকেই ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।

তা হলে আমাদের রাজাই বা এমন বিপজ্জনক পথে পা বাড়াচ্ছেন কেন ?

কেন, সে কি তুমি বোঝ না ? তুমি কি জান না, কার ইঙ্গিতে তিনি চলেন, কে তাঁর কর্ণধার ?

ও, তুমি রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছ? কিন্তু সবই তো তোমার শোনা কথা। শোনা কথার মূল্য কি?

হ্যাঁ, সবই আমার শোনা কথা। এই সব কথার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কিন্তু তা হলেও, সুদর্শন, পথ চলবার সময় চোখ-কান একটু খুলে চলাই ভাল।

কিন্তু তোমার এ কথা সত্য নয়। রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন সম্পর্কে এমন কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। রাজ্যের পক্ষে যা অকল্যাণকর, এমন কাজ তিনি কখনোই করতে পারেন না।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। তবে লোকে বলছে দু'পক্ষেই নাকি খুব তোড়জোর চলছে। আর ঘটনা যদি সত্য হয়, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্য বসে থাকবে না। যখন আসবে, হয়তো ঝড়ের মতই অতর্কিতে চলে আসবে। আমার মনে পড়ছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সৌভরী রাজ্যের কথা। সৌভরী রাজ্যের নাম তো জানই। আর্য জাতির একটি শাখা সেখানে বাস করে। বিদেশী পর্যটক বলে সবার কাছ থেকেই বেশ আদর-আপ্যায়ন পেলাম। ভাবলাম, কিছু দিন থেকে দেশটাকে ভাল করে দেখে যাব। কিন্তু হায় হায়, ক'দিন বাদেই সেই দেশ ছেড়ে পালাতে হোল।

কেন. উল্টোপাল্টা তর্ক জুড়ে দিয়েছিলে বুঝি? তোমাকে বিশ্বাস নেই।

আরে না, তা নয়। একটা নূতন জায়গায় গিয়ে আমি শুধু দেখি আর শুনি, সহজে কথা ছাড়ি না। জায়গাটা বড় মনে ধরে গিয়েছিল। ওই-যে তুমি এখানকার কথা বললে না, আমি ঠিক সেই রকমই মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম, ওখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সুখে-শান্তিতে আছে, কলহ-বিবাদের নাম-মাত্র নেই, এমন কি মেয়েরাও মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে না। কিন্তু আমি কি জানি ভিতরে ভিতরে এত! একদিন হঠাৎ দেখি কথা নেই, বার্তা নেই, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা পরস্পর গলা কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

ওখানকার মজা হচ্ছে এই যে, ওরা বাড়তি চেঁচামেচি করে না, নিঃশব্দে কাজ করে চলে। সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! বহু লোক হতাহত হোল। আমি যে-বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম, তারা বলল, তুমি বাপু সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে পালাও। এখানকার লোক জানে শোনে, তারা হুঁশিয়ার হয়ে গা বাঁচিয়ে চলতে পারে। কিন্তু তুমি বিদেশী মানুষ, জান না, শোন না, তুমি বোকার মত মারা পড়বে।

আমি বললাম, না, সে হচ্ছে না, ব্যাপারটার শেষ না দেখে আমি যাব না। ওরা বলল, না, তা হতে পারে ন · আমাদের দেশের মানুষ নিজেরা নিজেরা কাটাকাটি করে মরে মরুক, সেটা কোন লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বিদেশী লোক যদি আমাদের দেশে এসে এভাবে মারা যায়, তবে পৃথিবী শুদ্ধ আমাদের দুর্ণাম হবে। এই না বলে তারা আমাকে জোর করে তাদের রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে বার করে দিয়ে গেল।

সুদর্শন বলল, সাত্যকি, তোমার এই কাহিনী বিশ্বাস করা সহজ নয়। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় গলা কাটাকাটি করে মরছে, এটা কি একটা বিশ্বাস করবার মত কথা? ব্রাহ্মণরা যুদ্ধের জানে কি?

আরে না না, এখানকার ব্রাহ্মণদের মত নয়, ওরা অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ। ক্ষত্রিয়দের মতই তারাও ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধবিদ্যা করে থাকে।

কিন্তু বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁরাই হচ্ছেন সমাজপতি। ঈশ্বর সমাজ রক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরই উপরে ন্যস্ত করেছেন, তাঁরা এই সমাজ ধ্বংসী কাজে লিপ্ত হবেন, এ কেমন কথা।

তাই তো, এ কেমন কথা! কি বলব সুদর্শন, বিদ্যার অশেষ দোষ। শাস্ত্র যখন মন জুড়ে বসে থাকে, তখন সূর্যালোকও যেন সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় না। কাজেই প্রত্যক্ষ জিনিসও অপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ভার্গব পরশুরামের কথা তুমি কেমন করে ভুলে

গেলে? তিনি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুলের নিধন করেছিলেন, এ কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকবারই সম্ভাবনা, কিন্তু ঘটনাটা তো একেবারে মিথ্যা নয়। মনে করে দেখ, তাঁর সেই হিংস্র প্রবৃত্তির কথা। তাঁর নীতি ছিল, সর্পের শেষ রাখতে নেই। তাই ক্ষত্রিয় কুলের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত করে দেবার জন্য তিনি গর্ভবতী ক্ষত্রিয় বনিতাদের গর্ভ বিদারণ করতেন। আর পতিহীনা ক্ষত্রিয় বনিতারা আপনাদের এবং আপনাদের গর্ভস্থ সন্তানদের বাঁচাবার জন্য বন্যপশু-সঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত। সেসব করুণ কাহিনী নিয়ে কত গাথা রচিত হয়েছে, ছোটবেলায় সেসব গান তো আমরাও শুনেছি। অবশ্য পরবর্তী কালে সমাজপতিদের নির্দেশে সেসব গান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর পরেও সৌভরীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ যদি তোমার কাছে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয়, তবে আমার পক্ষে মৌনাবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় কি থাকে?

সুদর্শন চুপ করে রইল। এর উত্তরে কি বলবার আছে তার? কিন্তু মন কিছুতেই এগুলিকে মেনে নিতে চায় না, অথচ একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে পারে না। মন কত করে ঢেকে-ঢুকে চুপে আত্মবঞ্চনার আড়ালে বিশ্বাসের উপাদানে একটা কল্পিত শান্তি ও স্থিতির সুস্থির নিবাস গড়ে তুলেছিল। সাত্যকি কোথা থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে তার উপর প্রচণ্ড ঘা মারছে। প্রতিটি আঘাতে তার ঘরের ভিত্তি পর্যন্ত যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে।

দু'জনেই কতক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে সুদর্শন প্রথম মুখ খুলল।

অদ্ভুত তোমার পরিবর্তন সাত্যকি। যে-সাত্যকিকে আমি জানতাম, তুমি যেন সেই সাত্যকি নও। আগেও তুমি আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলে, যার জন্য আমি তোমার প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু আজ-যে তোমাকে আর চেনাই যায় না। আজও তোমার কথা আমাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু ওসব

কথা শুনতে আমার বড় ভয় হয়। আমি শান্তি চাই, স্থিতি চাই, কিন্তু তুমি যেন সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে, উলটে দিতে চাও। তোমার কথা শুনলে আমি যেন আর সুস্থির হয়ে দাঁড়াবার মত জায়গা পাই না। কিন্তু একটা কথা, তুমি তোমার নিজের জীবনে কি স্থিতি পেয়েছ, শান্তি পেয়েছ ?

সাত্যকি হাসল। তার হাসিটা যেন অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে উঠে এল। সে বলল, স্থিতি? শান্তি? তুমি তো জান না, সুদর্শন, একদিন কি ব্যাকুলতা নিয়েই না আমি স্থিতি চেয়েছিলাম, শান্তি চেয়েছিলাম ! কিন্তু সংসার আমাকে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। তার নিষ্ঠুর আঘাতে আমার সমস্ত আশা চুর চুর হয়ে ভেঙে পড়ল। কিন্তু আজ মনে হয়, এটাই ভাল হয়েছে। আজ তোমাদের এই স্থিতি আর শান্তিকে কেমন যেন ছেলেভুলানো খেলার মতই তুচ্ছ বলে মনে হয়। সংসার থেকে বাইরে এসে আমি আজ সংসারকে আরও স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে এইটুকুই আমি বলতে পারি, এর বেশী বলবার ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু তুমি এমন হলে কি করে ! আমরা একই সমাজে মানুষ হলাম, একই গুরুর কাছে একই শাস্ত্রের শিক্ষা পেলাম আমরা। অথচ কোথা থেকে তুমি এসব নূতন নূতন কথা নিয়ে এলে ! এসব কথা আমরা গুরুর মুখে শুনি নি. শাস্ত্রে এসব কথা নেই। আর তুমি যা বল, তার অনেক কথাই শাস্ত্রবিরোধী। এসব কথা আমি গ্রহণ করতেও পারি না, আবার একেবারে মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দিতে পারি না। আর সেজন্যই তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়। একটা কথা তুমি আমায় বল, এসব কথা কোথায় পাও তুমি? শুনেছি বেদ-বিরোধী ব্রাহ্মণ-বিরোধী অসুরদের স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে। শুক্রাচার্য সেই আসুর শাস্ত্রের প্রবর্তক। তুমি কি সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে ?

সাত্যকি হো হো করে হেসে উঠল, তুমি মিথ্যা ভয় করছ সুদর্শন,

আমি অসুর বা আর কারু শাস্ত্র পড়ি নি, আব কারু মন্ত্রে দীক্ষিতও হই নি। আমি শাস্ত্রের বন্ধনটাকে একটু ঢিলে করে দিয়েছি, এই মাত্র। তুমি দেখেছ, প্রচলিত মতামতের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ঠোকাঠুকি হয়েছে। সেজন্যই গুরুর কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠলাম। তিনি আমার জ্ঞানের অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর শাস্ত্রীয় শাসনের ভারে চেপে মেরে ফেলতে চাইলেন। আমি বিগড়ে গেলাম। আর তার ফলেই চূড়ান্ত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। সেদিন খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, সেটাই ছিল আমার মুক্তির দিন। তুমি হয়তো বলবে, গুরুর আরও তো কত শিষ্য ছিল, তারা সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে গুরুকে অনুসরণ করে চলত, কিন্তু তাদের সবার মধ্যে আমিই বা এমন উন্মার্গগামী হয়ে উঠলাম কেন? এ প্রশ্ন তুমি করতে পার। তার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সেই কথাটাই বলছি। আমার পিতাকে তোমার মনে পড়ে?

পড়ে বই কি।

বিদ্বান বললে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন বলে বিদ্যাচর্চার সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সহজ বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানটা ছিল প্রবল। আর তার চেয়েও প্রবলতর ছিল তাঁর দেখবার আর জানবার আকাঙ্ক্ষা। কে জানে, হয়তো জন্মসূত্রে আমার মধ্যেও তার কিছুটা এসে গেছে। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘরে বসে থাকতে দিত না। জীবনের একটা বৃহৎ অংশ তিনি যাযাবরের মতই পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর যেখানে যা পেয়েছেন তাকে আয়ত্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর গ্রহণশক্তি। আমার ছোটবেলায় তাঁর মুখে কত দেশের কত রকম মানুষের কত কাহিনী-যে শুনেছি! সেসব কথার পুরো তাৎপর্য বুঝবার মত শক্তি তখনও আমার হয় নি। গল্পের মতই শুনেছি। কিন্তু সেসব কথা ক'দিন মনে থাকে, ঝাঁপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে।

আমার বিদ্যাভ্যাসের সময় হয়ে এল, কিন্তু আমাকে গুরুগৃহে পাঠাবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না তাঁর। তিনি আমার মাকে বলতেন, ওরা বিদ্যা দানের নাম করে মানুষকে অন্ধ করে রাখে। ওদের ওখানে আমি ওকে পাঠাব না। আমি নিজেই ওকে শিক্ষা দেব, আর ওকে আমার মনের মত করে গড়ে তুলব। শুধু কথায় নয়, কাজেও তিনি তাই আরম্ভ করেছিলেন। আমার পড়াশোনায় মন ছিল, দ্রুত উন্নতি করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার মা মারা গেলেন। ফলে আমার পড়াশোনা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। আমার বাবার মন ভেঙে গিয়েছিল, কোন কাজেই তাঁর মন বসত না। সংসার তাঁর কাছে যেন তুচ্ছ হয়ে গেল। মা'র মৃত্যুতে আমি অনেক কেঁদেছি, কিন্তু কতদিন আর কাঁদতে পারে মানুষ! আমি ক্রমে ক্রমে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। বাবা একদিনও কাঁদেন নি, কিন্তু তাঁর মুখের হাসি আব ফিরে আসে নি। তিনি শুধু আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। কিছুকাল বাদে আমি পিতৃহীন হোলাম, সে তো তোমরা জান।

আমার এক পিতৃব্য আমাকে আশ্রয় দিলেন, আর আমাকে গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠালেন। আমি পড়াশোনাটা খুবই ভালবাসতাম। কয়েক বছর একেবারে ডুবে রইলাম। দেখতে দেখতে গুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়ালাম।

সুদর্শন হেসে বলল, সে কথা আমরা কেউ ভুলি নি। তুমি আমাদের সকলের মাথা ডিঙ্গিয়ে চলে গেলে। ফলে গুরুর প্রিয়পাত্র, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়ালে। এই-যে চিত্ররথ আর সুধন্বা তোমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, তার কারণটাও সেখানেই। আমি নিজেও এজন্য মনে মনে কম ঈর্ষা বোধ করতাম না।

তাই নাকি? তোমার পেটে পেটেও এত ছিল? কিন্তু নীচের সিঁড়িগুলি পেরিয়ে যখন শিক্ষার উঁচু স্তরে গিয়ে উঠলাম, তখন নানা

রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে সংশয় জাগাতে লাগল। শাস্ত্রে আমার অচলা শ্রদ্ধা, তবু মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি না। এ আমার কি হোল? মনকে অনেক শাসন করলাম, কিন্তু মন কিছুতেই মানতে চায় না। হঠাৎ একদিন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। পিতার কাছে যে-সব কথা শুনেছি—ভেবেছিলাম তার সবই বুঝি ভুলে গেছি। তা নয়, তার মধ্যে কোন-কোনটা মনের কোন গোপন কোণায় লুকিয়ে ছিল, এইবার তারা একে একে মাথা তুলে উঠতে লাগল। পিতার যে-সব কথার মানে তখন বুঝতে পারি নি, এখন তা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। এগুলি যেন এতদিন ভূমির নীচে উপ্ত বীজের মত দৃষ্টির অন্তরালে ছিল, এখন বর্ষণ পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে।

গুরুর কাছে এসব প্রশ্ন নিয়ে গেলে তিনি যেন কেমন কেমন করেন—কখনও প্রশ্ন করলেও যেন শুনতে পান না, না হয় একথা ও-কথা বলে পাশ কাটিয়ে যান। প্রথমে বুঝতে পারি নি, শেষে তাঁর মুখে অসন্তোষের ভাবটা এমন ভাবে প্রকট হয়ে উঠত যে, আমার কাছে তা আর চাপা রইল না। পরিষ্কার বুঝলাম, তিনি এসব প্রশ্ন এড়াতে চান। কিন্তু কেন? আমাকে এই উপেক্ষা কিসের জন্য? আমারও জিদ চেপে উঠল। আমি যখন তখন তাঁর উদ্দেশে প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে চললাম। শেষকালে এক একদিন তিনি বিষম চটে উঠতেন। আর তার ফলে শেষপর্যন্ত যা হোল, তা তো নিজের চোখেই দেখেছ।

সে গেল এক পর্যায়। তার পর গত দু'টি বৎসরে কত দেশ আর কত জাতি আর কত মানুষের সংস্পর্শে এলাম। দেখলাম নানা দেশের নানা রীতি। শুধু আর্যদেরই দেখলাম না, দেখলাম তাদের এ-পাশে ও-পাশে, চারদিক ঘিরে কত বিচিত্র জাতি তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে। তাদের যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্বণ, আর আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হলাম। তখন

বুঝলাম গুরু-দত্ত বিদ্যার সাহায্যে পৃথিবীর যে-রূপটা দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আসল পৃথিবীর কোনই মিল নেই। অথচ এগুলি তো আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। পিতার কাছে যে-সব কাহিনী শুনেছিলাম এসব তো তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর মুখে শোনা যে-সব কাহিনী ভুলে গিয়েছিলাম, আকাশের বুকে তারার মত তারা আমার মনের পটে একটির পর একটি করে ফুটে উঠতে লাগল। এ-সব দেখেশুনে পিতার মুখে শোনা সেই সব কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। মাত্র দু'টি বৎসর, এরই মধ্যে আমি যেন এক নূতন মানুষ হয়ে উঠলাম। আমার মধ্যে পিতা যে-বীজ বপন করেছিলেন, শুধু অঙ্কুরিত নয়, তা আজ পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবন্ত হয়ে উঠছে। একদিন তিনি বলেছিলেন, আমি ওকে আমার মনের মত করে গড়ে তুলব। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা হয়তো আজ কিছুটা পূর্ণ হয়েছে।

ওরা দু'জন গল্প করতে করতে তন্ময় হয়ে নগর ছাড়িয়ে শূদ্রপল্লীর ভিতরে এসে পড়েছে। হঠাৎ ওরা দু'জনেই একই সঙ্গে চমকে উঠে থেমে গেল। বা রে, এ কোথায় এসে পড়েছে তারা! চারদিকে— যে-দিকেই তাকানো যায়, শুধু সবুজের ঢেউ। যবের চারাগুলি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সবুজ হাসি হাসছে, যেন পৃথিবীর সোহাগী মেয়ে।

সুদর্শনের মনে পড়ল, হল-কর্ষণের দিন এই এখানে দাঁড়িয়েই সে ওদের উৎসব দেখেছিল। সে আর কতদিনের কথা! এরই মধ্যে চারাগুলি এত বড় হয়ে উঠেছে! সেই অপরূপ সকালটির কথা মনে পড়ছে তার। সেই গানের কলিটা সে এখনও ভুলতে পারে না, কানের কাছে যেন গুন গুন করে ফেরে—আমার হাতের যন্তর কেড়ে নিলি ও চোরঃ, ও চোরঃ, সোনার চুড়ি পড়িয়ে দেব সোনার হাতে তোর।

হাসি-গানে চঞ্চল, প্রাণরসে উচ্ছল কি জীবন্ত সেই মেয়েগুলি! মনে মনে সে তার বসুমতীকে এদের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেখল, উহুঃ, একেবারেই মানায় না, একটা অদ্ভুত রকমের ছন্দপতন।

এত মুগ্ধ হয়ে ওদিকে কি দেখছ, একবার তাকিয়েই দেখ না এদিকে। সাত্যকির হাতের ইশারা লক্ষ করে সুদর্শন তাকিয়ে দেখল, কাছেই একটা ক্ষেতে তিনটি মেয়ে বসে বসে আগাছা উপড়াচ্ছে। তিনটি মেয়েই ওদের কালো খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। মুখগুলি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। মেয়ে তিনটি ওদের দেখতে পায় নি। ওরা উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নীচু সুরে গান গাইছে। মনে হচ্ছে কাজ নয়, এ যেন একটা খেলা।

সুদর্শন বলল, দেখছ সাত্যকি, ওরা যেন মুক্ত প্রকৃতির মেয়ে, মাটির সঙ্গে, এই সকাল বেলার আলোর সঙ্গে, বাতাসের ভরে ঈষৎ কম্পমান চারা গাছগুলির সঙ্গে কেমন সহজ আর সুন্দরভাবে মিশে গেছে। আর আমাদের মেয়েরা গৃহপালিত মেয়ে, ওরা ঘরের শোভা, কিন্তু ঘরের বাইরে ওদের স্থান নেই।

ধন্যবাদ, এতক্ষণে একটা শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলেছ। আর সেই জন্যই কথাটা এমন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এদের দিনও শেষ হয়ে এল বলে। দেখে এলাম, কোন কোন জায়গায় শূদ্রদের ঘরে একটু গণ্যমান্য যারা, তারা তাদের উচ্চবর্ণের লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের মেয়েদের ঘরে আটকাতে শুরু করে দিয়েছে। এটাই নাকি উন্নতির লক্ষণ।

আচ্ছা, আমরা যদি রথের চাকাটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দি, কেমন হয় তবে? ধর, তোমার বউ আর আমার বউ খোঁপায় ফুল গুঁজে পরণের শাড়িটাকে এমনি করে হাঁটুর উপরে টেনে তুলে নিয়ে, খুরপি হাতে করে ওদের সঙ্গে যদি সারি বেঁধে বসে যায়, কেমন দেখাবে?

সাত্যকি হো হো করে হেসে উঠল। পাশেই এক দল শালিক কি একটা জটিল বিষয় নিয়ে জোর তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল, আচমকা এই উচ্চ হাসির শব্দ শুনে ওরা ভয় পেয়ে ফ্রিং ফ্রিং করে উড়ে চলে গেল।

মেয়ে তিনটিও হাসির শব্দে শালিকগুলির মতই চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুদর্শন আর সাত্যকির দিকে নজর পড়তেই ওদের চোখে কি এক ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল! পর মুহূর্তেই যেন প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওরা উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল। ওদের আঁচল লটপট করে বাতাসে উড়ছিল। একটি মেয়ের খোঁপায় গোঁজা অত সাধের ফুলটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সে একবার পেছন দিকে ফিরেও তাকাল না।

ওরা দু'জন অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাত্যকি বলল, কি হে, কি ব্যাপার?

সুদর্শন উত্তর দিল, বুঝতে তো পারছি না কিছু, তবে সন্দেহ হচ্ছে, ব্যাপারটা তেমন সুবিধার নয়। ওরা এমন ভয় পেয়ে গেল কেন?

ওখান থেকে শূদ্রদের বস্তি খুবহ কাছে, ডাক দিলে শোনা যায়। একটু বাদেই দেখা গেল বস্তির ভিতর থেকে ছোট-বড় সাত আট জন পুরুষ লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

সাত্যকি বলল, সুদর্শন, তোমার কথাই ঠিক, ব্যাপার সুবিধার নয়। ওদের বেশ উত্তেজিত বলেই মনে হচ্ছে। দেখ না, কেমন লাঠি বাগিয়ে ছুটে আসছে। এ রকম সঙ্গিন অবস্থায় স্থান ত্যাগ, অর্থাৎ পলায়নটাই কি যুক্তিযুক্ত নয়?

না না, পালাব কেন? ওদের আক্রমণের লক্ষ্য কি আমরা, না আর কিছু?

মনে তো হচ্ছে আমরাই।

কি যেন একটা ভুল বুঝেছে ওরা।

কিন্তু সেই ভুলটা শোধরাবার সময় পাওয়া যাবে তো?

বলতে বলতে ওরা সবাই কাছে এসে পৌঁছল। তাড়া করলে কেউ যদি পালায় তখন তার পেছন পেছন ধাওয়া করাটা বেশ সুবিধা-জনক, আনন্দদায়কও বটে। এ কথা কুকুর থেকে মানুষ পর্যন্ত সবারই জানা আছে। কিন্তু আক্রান্ত প্রাণী যদি না পালিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে,

তখন আক্রমণকারীকে সময় ·.' একটু দোটানার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। ওদের অবস্থা হোল তাই। ওরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর কি যেন একটু আলাপ করল। শেষে তাদের মধ্যে প্রবাণ একজন লোক সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কে? কি চান এখানে?

সুদর্শন উত্তর দিল, আমরা নগরেরই লোক। বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসেছি। কেন, আমাদের আসাতে তোমাদের আপত্তি আছে কিছু? আমরা কি বন্য পশু যে, আমাদের তাড়া করবার জন্য তোমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করে এসেছ?

কথাটা যেন ওদের মনে ধরল না। ও দব চোখে কেমন একটা সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ছায়া ভেসে উঠে.ছ। এটা কি একটা বেড়াবার মত জায়গা! কই, কেউ তো কোন দিন এখানে বেড়াতে আসে না। ওরা মনে মনে বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিল।

এমন সময় ওদের পেছন থেকে একটা লোক এক লাফে সুদর্শনের দিকে এগিয়ে এল। সুদর্শন হঠাৎ চমকে উঠে আত্মরক্ষার জন্য দু'পা পেছিয়ে এল। লোকটা এসেই সুদর্শনের পায়ের কাছে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে পড়ল। সুদর্শন আশ্বস্ত হোল, ভয়ের কোন কারণ নেই। যাক, তবু রক্ষা, এদের মধ্যে একজন পরিচিত লোক পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকটির মুখ চেনা-চেনা বলে মনে হলেও সে ঠিক চিনে উঠতে পারছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

আমাকে চিনতে পারলেন না! আমি সুদাস।

ওঃ হো, তাই তো। সুদাসই তো। সুদর্শনের মনে পড়ল, এই সুদাস তার শস্যক্ষেত্রে কত দিন কাজ করেছে! ওকে না চেনাটা তার অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু যে-রকম বাঘের মত এসে লাফিয়ে পড়ল, এতে কারু মাথা ঠিক থাকতে পারে!

মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। সুদাসের অনুসরণ করে ওরা একে একে সবাই প্রণাম করল। সেই প্রবীণ লোকটি হাত

জোড় করে বলল, আমরা না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছি, আপনারা কোন দোষ ধরবেন না।

আরে না না, তাতে কি হয়েছে! সুদর্শন আর সাত্যকি হেসে উঠল।

সুদাস, তোমার ঘর কোথায়, কত দূরে? সুদর্শন প্রশ্ন করল।

আরে, ওই তো, ওই-যে উঁচু বেলগাছটা দেখা যাচ্ছে।

চলো, তোমার বাড়িটা দেখে আসি।

আমার বাড়ি যাবেন—আপনারা? এত বড় সৌভাগ্যের কথা সে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর মহা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, চলুন, চলুন।

ওরা সুদাসের সঙ্গে ওর বাড়ির দিকে চলল, আর যারা ছিল, তারাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। তাদের সবার হাতে লাঠি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দু'টো লোককে যেন ওরা বন্দী করে নিয়ে চলেছে।

ওদের নানা ভাবে প্রশ্ন করে সুদর্শন আর সাত্যকি এবার আসল ব্যাপারটা জানতে পারল। উচ্চ বর্ণের কিছু কিছু গুণধর যুবক মেয়ের খোঁজে শূদ্রপল্লীর এপাশে ওপাশে শেয়ালের মত ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়, আর একটু সুযোগ পেলেই কোন একটা মেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই ভয়ে আজকাল বয়স্থা মেয়েরা বাড়ির বাইরে পথ চলতে ভরসা পায় না।

শুধু তাই নয়। মেয়ে ধরবার জন্য ওরা নানা কৌশলে ফাঁদ পাতে। এরা গরীব ঘরের মেয়ে, এরা তো কোনদিন ভাল জিনিসের মুখ দেখে না। নানা রকম সুখাদ্যের লোভ দেখিয়ে ওরা মেয়েদের টানে, আর মিষ্টি মিষ্টি করে কত কথা বলে। বলে, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে বিয়ে করব, তোমাকে রঙীন শাড়ি আর সোনার গয়না পরাব। এই কুঁড়ে ঘরে কেন পড়ে থাকবে? আমি তোমায় অট্টালিকায় রাখব। এমনি করে কানের কাছে মন্ত্র দেয়।

এদের সোজা সরল মেয়েগুলি ওদের এসব মন ভোলানো মিষ্টি কথায় ভুলে যায়, নির্বোধ পশুর মত ওদের ফাঁদে পা বাড়ায়। হঠাৎ একদিন দেখা যায় ঘরের মেয়ে ঘরে নেই। কোথায় গেল! খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, কিন্তু আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি নয়, দু'টি নয়, কত মেয়ে এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। শোনা যায় ওরা নাকি পরে এই মেয়েগুলিকে, যে-সব বৈশ্য মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের হাতে বিক্রি করে দেয়। আর সেই ব্যবসায়ীরা এই সব মেয়েদের দেশে দেশে চালান দেয়। এত বড় এই পৃথিবী, তার মধ্যে কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে! বালুভূমির মাঝে বালুকণার মত মিশে যায় ওরা, কেমন করে তাদের সন্ধান করবে! আর দৈবাৎ খোঁজ যদি মিলেও বা যায়, তবে যারা গাভী বা শস্যের বিনিময়ে ওদের কিনেছে, তারা ফিরিয়ে দেবে কেন? তাই কি কেউ দেয়?

সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, তোমরা রাজপুরুষদের কাছে জানাও না কেন?

সেই প্রবীণ লোকটি বলল, জানাই নি আমরা? কত বার জানিয়েছি, কিন্তু ওরা-যে সে কথা মোটে কানেই নিতে চায় না। কেউ কেউ বলে, উচ্চ বর্ণের সভ্য লোকেরা অস্পৃশ্য শূদ্র কন্যাদের উপর বলাৎকার করবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়।

সাত্যকি সুদর্শনকে জনান্তিকে বলল, সুদর্শন, এ সম্পর্কে তুমিও ঠিক এমনি একটি কথাই বলেছিলে, মনে আছে তো? কিন্তু এই সমস্ত লোকের কামাগ্নি অগ্নির মতই সর্বভুক। তারা কোন বাছ বিচার করে না।

সুদর্শন মাথা নীচু করে রইল।

প্রবীণ লোকটি বলে চলেছে, আবার কেউ বলে, আচ্ছা, অনুসন্ধান করে দেখা যাবে, তোরা এখন যা। আমরা তাদের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে ফিরে আসি, কিছুদিন বাদে আবার যাই, আবার ফিরে আসি। এই ভাবে দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর,

ওদের অনুসন্ধান করা শেষ হয় না। এদিকে একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। শেষে আমরাও হাল ছেড়ে দিই, বিচারের জন্য ওদের কাছে আর যাই না।

সুদাসের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। সমস্ত পাড়ার লোক সেখানে এসে জড় হয়েছে। পুরুষরাও, মেয়েরাও। আজকের দিনের ঘটনার নায়িকা সেই তিনটি মেয়ে—ওরাও এসে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। এ সম্পর্কে যার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাই সে বলছে। উচ্চ বর্ণের পক্ষ থেকে এমন দরদী শ্রোতা আর কখনও এরা পায় নি।

সুদাস বলল, মানুষ শেষে ক্ষেপে উঠল। কত দিন পারে এমন করে সহ্য করতে! আমরা শূদ্র হলেও মানুষ তো। কয়েক বছর আগে আমরা একটাকে ধরে আচ্ছা করে পিটুনি দিয়েছিলাম। কি যেন ওর নাম রে?

একজন উত্তর দিল—সুধন্বা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সুধন্বাই বটে। সেই পিটুনির ঠেলায় পক্ষকাল পর্যন্ত ওকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। তখন এই নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। সুধন্বা ব্রাহ্মণ সন্তান, শূদ্র তার গায়ে হাত তুলেছে, এ কি সর্বনাশের কথা! সুধন্বা বিছানা ছেড়ে উঠতেই বিচার-সভা বসল। এবার কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য বছরও লাগল না, মাসও লাগল না। সুধন্বা আমাদের মধ্যে চিনত শুধু পিপ্পলকে। সে তারই নাম করল।

বিচার-সভায় পিপ্পল সত্য কথা স্বীকার করল। বলল, আমাদের ঘরের মেয়ের উপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল, সেজন্যই আমি ওকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি, যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনও না করে।

তোমার সঙ্গে আর কে কে ছিল?

পিপ্পল বলল, আমি একাই ছিলাম, আর কেউ ছিল না।

সুধন্বা প্রতিবাদ করল, না আরও ক'জন লোক ছিল সঙ্গে।

কিন্তু পিপ্পলের মুখ দিয়ে আর কারু নাম বের করা গেল না।

পিপ্পলকে প্রশ্ন করা হোল, সুধন্বা-যে সেই মেয়ের উপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল, তার প্রমাণ কি, সাক্ষী আছে কেউ ?

পিপ্পল সাক্ষী হিসাবে সেই মেয়ের বাপ এবং আরও একজনের নাম করল। কিন্তু যারা বিচার করছিল, তারা বলল, শূদ্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তোমার কোন উচ্চ বর্ণের সাক্ষী আছে ?

পিপ্পল বলল, উচ্চ বর্ণের সাক্ষী আমি কোথায় পাব ?

পিপ্পলের যা কিছু বক্তব্য এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

এবার সুধন্বাকে প্রশ্ন করা হোল, তুমি-যে নির্দোষ, তুমি দিব্য করে এ কথা বলতে পার ?

সুধন্বা বরুণ দেবের নাম করে দিব্য করে বলল যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এইভাবে পিপ্পলের অপরাধ আর সুধন্বার নির্দোষিতা সুপ্রমাণিত হয়ে গেল। বিচারে পিপ্পলের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হোল।

মৃত্যুদণ্ড ! যেন আর্তনাদ করে উঠল সুদর্শন।

হ্যাঁ, বিচারের কাজ শেষ হতেই বিষ পান করিয়ে তাকে হত্যা করা হোল।

সুদর্শন প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে সাত্যকির মুখের দিকে তাকাল। সাত্যকি সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, শূদ্র যদি আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে সেই অপরাধে তার প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে। কেন, তুমি জান না ?

না তো।

আর পিপ্পলের এই মৃত্যুদণ্ডের কথা, তাও তোমার কানে যায় নি ?

না।

সাত্যকি হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

সুদাস বলল, এই ঘটনার পর থেকে ওরা একটু হুঁশিয়ার হয়ে গেল। কেননা, বিচারের ফল যা-ই হোক, আসল ব্যাপারটা বুঝতে কারুই বাকী ছিল না। আঃ, কি একটা ছেলে ছিল পিপ্পল ! অমন

ছেলে হয় না। আমাদের জন্যই সে প্রাণ দিয়ে গেল। তার কথা আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না। তারপর কিছুদিন বেশ কাটল। আমরা ভাবলাম, আগে যা হয়ে গেছে তো গেছে, আর এমন হবে না। কিন্তু হায় হায়, কিছুদিন থেকে আবার তাই শুরু হয়েছে। আমাদের ওরা শান্তিতে থাকতে দেবে না।

একজন বলল, আমরাও ঠিক করেছি, অনেক সয়েছি, আর সইব না। এমনিতেই তো সব দিক দিয়ে মার খেয়ে মরছি, আমাদের আর মরবার ভয়টা কি ?

দুঃখের কথা তো আর একটা নয়। কথায় কথা বেড়ে চলে, একটা থেকে আর একটায় গড়িয়ে যায়। চলতে চলতে শেষে সেই ছ'ভাগ আর চার ভাগের সমস্যাটা উঠে পড়ল। ওরা বুঝতে পেরেছে, এদের কাছে সব কথাই বলা চলে। সুদাসের মুখে ওরা শুনেছে সুদর্শনের মত এমন ভাল মানুষ নাকি আর হয় না। আর ভাল মানুষ যদি না-ই হবে, তবে এমন উঁচু ঘরের লোক হয়ে তাদের ঘরে এসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনবেই বা কেন ?

একজন জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বলিবৃদ্ধির ব্যাপারটা সম্পর্কে জানেন কিছু আপনারা ? বলির ভাগ যদি বাড়ায়, তবে শূদ্র বলতে আর কেউ থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে।

আপনারা তো উপরের মানুষ, উপরের খোঁজ-খবর রাখেন, সত্যি-সত্যই কি হবে বলুন তো ?

সুদর্শন বলল, আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

আর একজন একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, আমাদের কথা কেউ জানে না। যাকেই জিজ্ঞেস করি, সে-ই বলে জানি না।

সাত্যকি বলল, যাদের কাছে বললে কাজ হয়, সেখানে যাও না কেন ? তাদের গিয়ে চেপে-চুপে ধর, বুঝিয়ে বল তোমাদের অবস্থাটা। এতদিনের নিয়ম, এক কথায় উল্‌টে দেবে এটাই বা কেমন কথা ?

প্রবীণ ব্যক্তিটি উত্তর দিল, আমরা যেন বলি নি। বলতে বলতে

আমাদের মুখ তেতো হয়ে গেছে। গোপ আর স্থানিকদের কাছে এসব নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে তারা তো তেড়েই মারতে আসে। বলে, ব্যাটারা, রাজার আদেশ, এর উপর আবার কোন কথা আছে নাকি? আমরা রাজকর্মচারী, রাজা যেমন আদেশ করবেন, আমরাও তেমনি কাজ করব। তোদের যদি বলার কিছু থাকে, রাজার কাছে বল্ গে। রাজা যদি বলেন, কর্ষকের যা উৎপন্ন তা কর্ষকের হাতেই থাকবে, আমার ভাগ-টাগ আমি চাই না, বেশ কথা, তাই হবে, আমাদের আর কি!

তা, তোমরা রাজার কাছে গিয়েছিলে?

রাজার কাছে যাওয়া এত সহজ কথা কিনা। আমরা প্রথমে গেলাম মন্ত্রীমশাইর কাছে। মন্ত্রীমশাইর মনটা নরম, তিনি ধৈর্য ধরে আমাদেব কথাটা শুনলেন। কিন্তু হলে কি হবে, বুড়ো হয়ে গেছেন কিনা, এখন বোধ হয় তাঁর কথা কেউ মানে-টানে না। আমাদের সব কথা শুনে তিনি বললেন, তাই নাকি রে? এত সব কথা তো আমি জানি না। আচ্ছা, তোরা এখন যা, আসিস ক'দিন পরে।

আমরা তো মহাখুশী হয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম, এবার এর একটা বিহিত হবেই। কিছুদিন বাদে আবার দল বেঁধে গেলাম। আমাদেব দেখে মন্ত্রী মশাইর মুখখানা কেমন হয়ে গেল। বললেন, না রে বাবারা, আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। বুড়ো হয়ে গেছি, এখন আমার বনে যাবার সময় হয়ে গেছে। তোরা যা, রাজার কাছে যা।

কত করে বললাম, কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারলাম না। শেষে বুঝলাম, বেশী বলে আর কি হবে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনই হাত নেই। সবই আমাদের দুর্ভাগ্য, তা না হলে এমন হবে কেন?

রাজার কাছে গেলে না কেন?

যাই নি বুঝি? কতবার চেষ্টা করলাম, দেখাই করা যায় না। একদিন একটা পুরো বেলা হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবার পর ভিতর থেকে খবর নিতে এল একজন, কি হে, কি চাই তোমাদের?

আমরা বললাম, বলির ব্যাপারে মহারাজের কাছে আমরা আমাদের নিবেদন জানাতে চাই। আমাদের কথা শুনে সে লোক ভিতরে চলে গেল। কিছু বাদে ফিরে এসে বলল, যা যা, তোরা স্থানিকের সঙ্গে গিয়ে আলাপ কর গে, যা। মহারাজের এ ব্যাপারে কোন কিছু বলবার নেই। ব্যস, দেখুন দেখি কেমন ব্যাপার। স্থানিক বলছেন, রাজার কাছে যা, আবার রাজা বলছেন, স্থানিকের কাছে যা। আমরা তবে যাই কোথায়! এই তো অবস্থা।

শূদ্র-পল্লী থেকে ফেরার পথে সাত্যকি প্রশ্ন করল, কি হে সুদর্শন, বুঝলে কেমন ব্যাপারটা? জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সুখে-শান্তিতে আছে, তাই না?

সুদর্শন চুপ করে রইল। তার স্থির প্রশান্ত জীবনে সাত্যকি এ কি এক সংশয় ও অস্থিরতার ঢেউ জাগিয়ে তুলল! এক দিকে তার সমগ্র জীবন, আর এক দিকে আজকের এই বিচিত্র সকালটা। সে মনে মনে তৌল করে দেখতে লাগল, কোন্‌টা বেশী ভারী।

সাত

তারপর? বল না আজুলি, কি বলছিলি!

কি আর বলব রানীমা, মানুষের মনে আর সুখ নেই।

তা তো নেই। কেমন করেই বা থাকবে! কিন্তু বলছে কি তারা?

কি আর বলবে, বলার কিছু আছে! সবাই মাথা-কপাল চাপড়ায় আর বলে, কত জন্মের পাপের ফলে শূদ্রকুলে জন্মেছিলাম। এমনিতেই খেটে খেটে জীবন পাত করি কিন্তু দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই না। এর উপরে যদি চার ভাগের এক ভাগ শস্য রাজাকে দিয়ে দিতে হয়, তবে আর কারু সংসার-ধর্ম করতে হবে না।

তা তো বলবেই, কিন্তু আর কি বলছে বল না।

আর কিছু বলে না মা, কারু কি আর বলবার মুখ আছে! না না, এসব কথা থাক এখন। আমি বোকা-সোকা মেয়েমানুষ, আমি জানিই বা কি আর বুঝিই বা কি!

এই দেখ, দেখ. কেমন করে কথা চাপা দিচ্ছে। কেন, এই যে তুই বলছিলি যে, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বলির কথা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলেছে। এই নিয়ে দুটো দল হয়ে গেছে।

ও মা, এমন কথা আমি কখন বললাম! না মা, আমি গরীব মানুষ, এসব কথা দিয়ে আমার দরকারটা কি?

এই আজুলি, কথা উল্টাস্ নে। এই মাত্র না বললি?

ও মা, তাই বলেছি নাকি? যদি বলে থাকি, ভুল বলেছি। মাপ কর মা, এসব কথা নিয়ে বেশী বলাবলি ভাল নয়। এসব বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসে।

আহা, এ কথা তো তোর মধ্যে আর আমার মধ্যেই থেকে যাবে। এ সমস্ত কথা তো আর আমরা বাইরে বলতে যাচ্ছি না।

সে তো ঠিকই। কিন্তু দেখো মা, রাজার কানে এসব কথা যেন না ওঠে।

তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি? এ হচ্ছে আমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা। এসব কথা পুরুষদের কানে তোলার দরকারটা কি?

আজুলি সুদক্ষিণার কথায় একটু আশ্বস্ত বোধ করে গলার স্বরটা একটু নামিয়ে এনে বলল, গ্রামের অবস্থা বড় সুবিধার নয় মা। সারা গ্রামে শুধু এই কথা নিয়েই বলাবলি, আর কোন কথা নেই।

রাজার আদেশ বুঝি মানতে চাইছে না কেউ?

ও মা, কেমন করে কথা বল তুমি, শুনলে ভয় করে আমার। রাজার আদেশ মানবে না কেন? দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আর মানুষের মধ্যে রাজা। তার কথা মানতেই হবে যে। রাজার কথা না মেনে পারে কেউ! কথা তা নয়। আসল কথা কি জান, কেউ কোন দিশা পাচ্ছে না, যার যেমন খুশি বলছে। এই নিয়ে পঞ্চজন বসল বুদ্ধি ঠিক করতে। কিন্তু তারা বুদ্ধি দিয়ে বেড় পায় না। এক এক জন এক এক কথা বলে, পঞ্চজন আর একমত হতে পারে না।

পঞ্চজন কি রে?

আহা, তোমরা এত কথা জান, আর পঞ্চজন জান না? পঞ্চজন হচ্ছে আমাদের মহৎরা, যারা আমাদের সমাজের মাথা। পঞ্চজন একমত হতে না পেরে সাধারণকে ডাক দিল।

সাধারণ কে রে আজুলি? মানুষের নাম সাধারণ—এ আবার কেমন নাম?

আহা, কেমন মানুষ গো তুমি! সাধারণ নাম হবে কেন? সাধারণ কি একটা মানুষ নাকি? সাধারণ জান না? ঐ-যে বলে না, সর্বসাধারণ, গ্রামের মধ্যে যত মানুষ আছে, সবাইকে নিয়ে, এ হচ্ছে তাই।

ও বুঝলাম, তারপর?

সাধারণ বসল। সভায় পঞ্চজন বলল, সাধারণ, তোমরাই হচ্ছ মূল।

তোমরা আমাদের পঞ্চজনের আসনে বসিয়েছ। তোমাদের অনুমতি নিয়েই আমরা ভালমন্দ যেমন বুঝি, সেই মত কাজ করি। তবে আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত ভাল ছাড়া মন্দ করি না।

সাধাবণ বলল, ঠিক ঠিক।

পঞ্চজন বলল, আমাদের সাধ্যে যতদূর কুলায়, ততটুকুই আমরা কবি, তার বেশী করতে পারি না। আমবা পঞ্চজন যতক্ষণ পারি, একমত হয়েই চলি। কিন্তু যখন আমরা এক এক জন এক এক দিকে তাকিয়ে কথা বলি, এক জনের সঙ্গে আর এক জনের গলা মেলে না, তখন আমরা সাধারণের কাছে এসে সে-কথা নিবেদন করি। আমবা বলি, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা শেষ হয়ে গেছে, এবার তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে কোন্‌টা করা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত তার মীমাংসা কর।

সাধারণ বলল. ঠিক ঠিক।

তারপর যে-যার মনের কথা খুলে বলতে লাগল। যে-যেমন বুঝল তেমনি বলল। বলি বাড়ার কথা শুনবার পর থেকেই জোয়ান মরদেরা সব ক্ষেপে আছে। কথা বলতে কেউ কিছু কম করে বলল না মন খোলসা করেই বলল। কিন্তু তাদের চেয়েও বেশী তেতে উঠেছে ঘবেব মেয়েরা। নিয়ম হচ্ছে, এক জনের পর এক জন বলবে, যার যা কথা স্পষ্ট করে বলবে। কিন্তু আমরা মেয়েরা অত সব নিয়ম-টিয়ম মেনে চলতে পারি না। ঘরেও না, সাধারণের সভার মধ্যেও না। মেয়েরা এক সঙ্গে এক ঝাঁক পাখির মত কলকলিয়ে উঠল।

সুদক্ষিণার মুখ বিস্ময়ে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে। সে ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, সে কি রে, তোরা মেয়েরাও সেই সাধারণের সভার মধ্যে গেলি!

আজুলিও তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, বা রে, আমরা যাব না? আমাদের বাদ দিয়েই সাধারণ বসবে? তোমাকে বললাম না, গ্রামের মধ্যে যত মানুষ আছে সবাইকে নিয়ে এই সাধারণ।

তা তো বলেছিস। কিন্তু তাই বলে মেয়েরাও সেখানে যাবে? এক দঙ্গল অচেনা পুরুষের মাঝখানে গিয়ে তোরা বসলি, আর গলা ছেড়ে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বললি, তোদের লজ্জাও করল না?

ও মা, সাধারণের সভায় যাব, যে-যার মনের কথা খুলে বলব, এর মাঝে আবার লজ্জার কথাটা আছে কি! আর অচেনা পুরুষ আছে তো আছে, কি হয়েছে তাতে? ওরা কি আমাদের খেয়ে ফেলবে নাকি? লজ্জার কথাই যদি থাকবে, তবে সাধারণ আমাদের ডাকবে কেন?

তোদের স্বামীরাও এজন্য কিছু বলে না?

স্বামীরা? তারা আবার কি বলবে? তাদের বলবার আছেটা কি? স্বামী আর স্ত্রী, সে যে-যার ঘরে ঘরে। এ তো আর ঘর-সংসারের ব্যাপার নয়, এ হচ্ছে সাধারণ। এখানে তুমি তোমার কথা বলবে, আমি আমার কথা বলব।

আজুলি কথাটাকে জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু সুদক্ষিণার মাথায় ব্যাপারটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না। এমন সভা তো উচ্চ বর্ণের মধ্যেও আছে। সমাজের গুরু-লঘু বহু বিষয় সম্পর্কেই সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে তো শুধু পুরুষেরাই উপস্থিত থাকতে পারে। মেয়েদের প্রবেশ নেই। নিষেধ আছে কি নেই, তাই বা কে জানে, এ প্রসঙ্গে কোন কথাই ওঠে না। আর ঘরের মেয়েদের সেই সভার মধ্যে নিয়ে বসিয়ে দিলে কি হোত তাদের দশাটা? নির্বোধ গরুর মত ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু সে নিজেই তো পিত্রালয়ে থাকতে কত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা, এমন কি তর্কবিতর্কও করেছে। সে কথাটাও মনে মনে ভেবে দেখল সুদক্ষিণা। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। লোকজনে গিজ গিজ করছে সভা, তার মধ্যে মেয়েদের কি ঠিক মানায়? কিন্তু সমাজের নীচের স্তরের এই শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিতা, অন্ধ

বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল এই কালো মেয়েগুলি কোন্ সাহসে এতগুলি পুরুষের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাবে নিজেদের মতামত ঘোষণা করে। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শোনে। সুদক্ষিণার সমাজের পুরুষেরা কি মেয়েদের এই মর্যাদাটুকু দেবে? কক্ষণও না। এ যেন এক নতুন জগতের কাহিনী। বিস্ময়ে ভরে ওঠে সুদক্ষিণার মন। আর সেই বিস্ময়ের সঙ্গে ঈষৎ শ্রদ্ধার ভাবও যেন মিশে থাকে।

সুদক্ষিণার মনের এত কথা আজুলি কেমন করে জানবে! সে তার কথা অনর্গল বলে চলেছে। কথা বলাব তোড়ে ওর আগেকার সেই আড়ষ্টতাটা কেটে গেছে। যে-সমস্ত কথা বলা উচিত নয়, সেই সমস্ত কথাও সে বলে চলেছে।

হ্যাঁ, মেয়েরা কলকলিয়ে উঠল। পঞ্চজনের মধ্য থেকে একজন একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থার কথা তুলেছিল। বলেছিল, ওদের কথাও থাক, আমাদের কথাও থাক। চার ভাগের এক ভাগের বদলে পাঁচ ভাগের এক ভাগের প্রস্তাবটি নিয়ে যদি আমরা উপস্থিত হই, ওরা হয়তো রাজি হয়ে যেতেও পারে। বিপদে পড়লে অনেক ছেড়ে দিয়েও তখনকার মত একটা রফা করে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু এই কথাটা মাটিতে না পড়তেই মেয়েরা এক ঝাঁক পাখির মত একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠল। আর সেই কলকলানির তলায় ওর কথাটা চাপা পড়ে গেল।

মেয়েরা বলল, ওসব চলবে না। আমাদের মেয়েদের কথা সব্বার আগে শুনতে হবে। পুরুষরা কি জানে, তারা তো শুধু খাওয়ার সময় এসে খায় আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। ঝামেলা তো সব আমাদেরই পোয়াতে হয়। পেটে যখন আগুন জ্বলে, তখন বাচ্চারাই হোক, বাচ্চার বাপরাই হোক, সবাই এসে আমাদের উপরেই হামলা করবে—কি লো, রান্না হয়েছে? ঘরে কিছু আছে কি নেই, সে খোঁজ

তো কেউ নেয় না। এখন ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হয়, তাতেই আমরা কুলিয়ে উঠতে পারি না। এর পরে যদি পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়, তখন কেমন করে চলবে? পাঁচ ভাগের কথাটা যে বলছে সে এই কথাটা আগে বুঝিয়ে দিক।

প্রায় সবাই তাদের কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিক ঠিক।

পঞ্চজনের মধ্যে সবচেয়ে বুড়ো যে, সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কি করবে তবে, সেই কথাটাই বল। একসঙ্গে অনেকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠল, না, আমরা চার ভাগের এক ভাগ দিতে পারব না।

পারব না, বললেই তো আর হবে না। রাজার কথামত ভাগ না দিলে রাজার লোকেরা এসে জোর করে শস্য লুটে নিয়ে যাবে, গরু-বাছুর কেড়ে নেবে, আমাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে—তখন? তখন কি করা যাবে? আমাদের বাপ-দাদার মুখে শুনেছি, এর আগেও নাকি একবার ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। রাজা বলল, চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। কৃষকেরা সেই আদেশ মানল না, তারা বলে দিল চার ভাগের এক ভাগ কেউ দেবে না। দিল না তো দিলই না। তারপর তাই নিয়ে বেধে গেল ভীষণ হাঙ্গামা। সে এক সর্বনেশে ব্যাপার। কত লোক মারা পড়ল, কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, আর কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল! এখন তোমরা সবাই বিবেচনা করে বল, আমরা কি করতে পারি? রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াব, এমন শক্তি কি আমাদের আছে?

একটা জোয়ান ছেলে লাফিয়ে উঠল, না, আমরা দেবো না, তার চেয়ে সব শস্য পুড়িয়ে ফেলব।

তাতে লাভটা কি হবে?

একজন বলল, আমরা তা হলে এদেশ ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় যাবে? যেখানে যাবে, সেখানেই রাজা, আর সেখানেই এইসব উৎপাত। গরীবের সুখ কোন জায়গাতেই নেই।

কিন্তু কি হয়েছিল তারপর, সেই কথাটা বলুন, আর একজন উঠে

দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল। সেই-যে রাজা বলেছিল, চার ভাগের এক ভাগ দিতেই হবে, আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলেছিল ছয় ভাগের এক ভাগের বেশী কিছুতেই দেবে না, এদের মধ্যে কার কথা টিকল শেষে? রাজা কি তার সেই চার ভাগার নিয়ম চালু করতে পেরেছিল?

না না, অনেকগুলি লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

বুড়ো কিন্তু তাতেও দমল না। সে আবার বলল, কিন্তু সেজন্য কত লোক মরেছে, কত লোকের সর্বনাশ হয়েছে, আর কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সে কথাটাও ভেবে দেখো। কথাটা যে তুলেছিল, সে-ই এই কথার উত্তর দিল। বলল, কষ্ট না করলে কোন্-টাই বা পাওয়া যায়? আমরা যদি কষ্ট করে চাষ না করি, বীজ না বুনি, শস্য কি আপনা থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে? তারা কষ্ট করেছিল, তারা প্রাণ দিয়েছিল, তার ফলেই তো আমরা তিন পুরুষ ধরে সুখ ভোগ করে এলাম। এখন আমরা যদি কোন রকম বাধা না দিয়ে ওরা যা বলে তাই মেনে নিই, তা হলে আমাদের পরে যারা আসছে, তাদের দশাটা হবে কি? আর রাজাও বুঝে নেবে এগুলি মানুষ নয়, গরুভেড়ার সামিল, এদের চাপ দিয়ে যা খুশি তাই করানো যায়। তখন যদি চার ভাগার বদলে তিন ভাগার নিয়ম চালু করে, তখন আপনারা কি করবেন? তার কথা শুনে লোকের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তারা বলল, ঠিক বলেছে, এতক্ষণে আসল কথাটা বলেছে। উৎসাহের চোটে আরও কয়েক জন লাফিয়ে উঠল। একজন বলল, ঠিক বলেছে, ওদের চার ভাগার নিয়ম আমরা কিছুতেই মানব না। কষ্ট পেতে তো আর কম পাচ্ছি না। এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে সব দিক দিয়েই মার খাচ্ছি। এখন আমরাও একবার দেখে নিতে চাই, ওরা কত মার মারতে পারে। তবে এবার আর কুকুর-বিড়ালের মত পড়ে পড়ে মার খাব না। আমরা সমস্ত শূদ্র যদি এক হতে পারি, ওরা আমাদের কি করতে পারবে!

চার দিকে কোলাহল পড়ে গেল, ঠিক বলেছে। এত লোকে এত কথা বলল, কিন্তু এর মত দামী কথা আর কেউ বলে নি। এর পর যদি ওরা চার ভাগার জায়গায় তিন ভাগা, শেষে তিন ভাগার জায়গায় দু'ভাগার নিয়ম চালু করে, তখন আমরা করব কি? এই লোকই সার কথা বলে দিয়েছে।

তখন খোঁজ পড়ল, এই সার কথাটা যে বলেছিল, সেই লোকটা কে? খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, সবাই খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এত লোকের ভিড়ের মধ্যে সবাইকে তো আর ভাল করে দেখা যায় না। তবে পুব-উত্তর কোণ থেকে কথাটা আসছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেখানে গিয়ে খোঁজ করে জানা গেল, ওখানেই বসেছিল সে। ওখানকার একজন বলল, এই তো গো, এই জায়গাটায় বসেছিল। ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা একটা কাপড় পরে এসেছিল। কেমন জবুথবু হয়ে এক কোণে বসেছিল। মাথাটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। আমরা ভাবলাম জ্বরজ্বারি হয়েছে হয়-তো! আমরা মন দিয়ে কথা শুনছিলাম, ওর দিকে অত লক্ষ করি নি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলল। আমাদের মত অশুদ্ধ কথা নয়, ব্রাহ্মণরা যেমন করে বলে, একেবারে সেই রকম। কথাটা শেষ হবার সময় ওর মাথা থেকে কাপড়টা একটুখানি খসে পড়েছিল। ওরে বাপ রে বাপ, আগুনের মত টকটকে রং আর মাথা ফুঁড়ে আলো বেরোচ্ছে। দেখে আমার চোখ ঝলসে গেল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেল। প্রথমে ভাবলাম, আমি বুঝি মরে গেছি। শেষে দেখলাম, না, মরি নি। কিন্তু কোথায় গেল সেই লোকটা! এই মাত্র ছিল যে। তখনই আমার সন্দেহ হোল, এ তো মানুষ নয়। মানুষ হলে কি কখনও এমন করে হাওয়া হয়ে যেতে পারে! একে ওকে ডেকে দেখালাম, তারা বলল, তাইতো, আমরাও তো দেখেছি, লোকটা গেল কোথায়!

আর একজন বলল, ঠিক বলেছো, ঠিক সেই সময় একটা ঈগল

পাখির ডাক শুনলাম। আমি চমকে উঠে চেয়ে দেখি একটা ঈগল পাখি শোঁ করে উপরে উঠে গেল। আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল। এত বড় ঈগল আমি কোনদিন দেখি নি।

কাছাকাছি যারা ছিল তাদের মধ্যে দু' একজন বলল, তারাও একটা ঈগল পাখির মত ডাক শুনেছিল। তখন আর কারু মনেই সন্দেহ রইল না যে সেই মানুষটি আসলে মানুষ নয়।

সুদক্ষিণা এতক্ষণ নিমগ্ন চিত্তে আজুলির এই গল্প শুনছিল, এর মাঝখানে একটি কথাও বলে নি। আজুলির শেষ কথাটি শুনে সে চমকে উঠে বলল, মানুষ না, তবে কি রে?

আজুলি কৃতাঞ্জলি হয়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে গভীর কণ্ঠে বলল, দেবতা গো, দেবতা।

সুদক্ষিণা বলল, দূর বোকা, দেবতা কি কখনও শূদ্রদের দেখা দেন।

আজুলির কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল। দেবতারা-যে শূদ্রদের দেখা দেন না, এ কথাটা ওর জানা ছিল না। কেমন করেই বা জানবে! শাস্ত্র-কথা শুনবার সুযোগ তো ওর হয় নি। সে বলল, সন্তান যদি কালোকুচ্ছিত হয় বাপ-মাও তাকে দেখতে পারে না, না রানীমা?

কিন্তু শূদ্রের প্রাণের এই গোপন কান্না সুদক্ষিণা কেমন করে শুনবে? তার মনটা তখনও আজুলির গল্পের মধ্যেই ডুবে ছিল। আজুলির মুখে শোনা এই কাহিনী থেকে অনেক তথ্য সে জানতে পেরেছে। কিন্তু আজুলি যাকে দেবতা বলছে সে কে? আগুনের মত টকটকে রং, মাথা ফুঁড়ে আলো বেরিয়ে আসছে,—এ কে? এতগুলি লোকের মাঝখান থেকে কেমন করেই বা অদৃশ্য হয়ে গেল!

আজুলি আবার বলল, বোধ হয় ঠিকই বলেছ মা। তাই তো, দেবতা দেখা দিয়েও দেখা দিলেন না। আমাদের লোকেরা কিন্তু

এতেই খুব সাহস পেয়ে গেছে। তারা বলছে দেবতা আমাদের সহায় আছেন, তবে আর আমাদের ভয় কি? কথাটা সুদক্ষিণার মনটাকে নাড়া দিয়ে তুলল। সে আজুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তা হলে তোমাদের লোকেরা চার ভাগার আদেশ মানবে না, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এটাই ঠিক করেছে বুঝি?

এবার আজুলি চমকে উঠল। এ কি, কি করেছে সে! গল্পে গল্পে সমস্ত কথাই তো বলে দিয়েছে। সে তো জানত, এসব কথা বলা উচিত নয়। তার স্বামী তাকে বার বার করে বলে দিয়েছিল, রাজবাড়িতে এসব কথা যেন কখনো না বলে। আর তার উত্তরে সে বলেছিল, হ্যাঁঃ, আমি তেমনি বোকা মেয়ে কিনা। আর এখন? কোন কথাই তো সে বলতে বাকী রাখে নি। যা জানত সবকিছুই বলে দিয়েছে। এখন কথাটা যদি রাজার কানে ওঠে তবে উপায়? কি আশ্চর্য, এমন মারাত্মক ভুল সে কি করে করল! এখন একমাত্র উপায় রানী যদি তাঁর কথা রাখেন, রাজার কানে এসব কথা না তোলেন।

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে সে সুদক্ষিণার তুই পা জড়িয়ে ধরল। সুদক্ষিণা চমকে ওঠে একটু পেছিয়ে গিয়ে বলল, এ কি রে, এ কি করছিস্?

মা, আমি কি সর্বনাশ করলাম! এসব কথা কেন আমি বললাম! আমাকে রক্ষা কর মা, রাজার কানে যেন এসব কথা না যায়।

আজুলি সুদক্ষিণার তুটো পা শক্ত করে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আরে, না না, আমি কোন কথা বলব না, কিছু ভয় নেই তোর। সুদক্ষিণা অনেক করে আশ্বাস দিল ওকে, তবু ওর কান্না থামে না।

এবার অনুপায় হয়ে সুদক্ষিণা কড়া করে ধমক দিল, থাম্ বলছি,

কান্না যদি না থামাবি, তবে আমি রাজার কাছে গিয়ে এক্ষুণি সব কথা বলে দেব।

অব্যর্থ ওষুধ! সঙ্গে সঙ্গে আজুলির কান্না থেমে গেল।

গভীর রাত্রিতে টিপি টিপি পায়ে সাত্যকি ওর ঘরের দরজায় এসে টোকা মারল। —উলুপী ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ ওর শয্যার কোন ভাগীদার নেই। তাই অনেক দিন বাদে আজ ও বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। টোকার শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। আঃ, এত রাত্রিতে কে আবার জ্বালাতন করতে এল, আর আমার সয় না। একবার ভাবল ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকবে, হয়তো সারা না পেয়ে ফিরে চলে যেতেও পারে।— যায় যাক, যেখানে খুশি যাক, গোল্লায় যাক হতভাগার দল। সে কি মানুষ নয়, একটা রাত্রিও কি সে একটু শান্তিতে থাকতে পারবে না!

ঠক্ ঠক্ ঠক্—সেই পরিচিত তিন টোকার শব্দ। সচকিত হয়ে উঠল উলুপী। আর সে শুয়ে থাকতে পারল না। উঠতেই হোল বিছানা ছেড়ে। মনে মনে বলল, ঠক্ ঠক্ ঠক্, এবার তোমায় চিনেছি। দরজা খুলে দিতেই সাত্যকি এসে ঘরে ঢুকল।

বাতিটা জেলে উলুপী সাত্যকিকে বসতে দিল।

তারপর, এত রাত্রিতে যে?

কি করব, প্রথম রাত্রিতে তোমার ঘরে লোকজন থাকে যে।

শুধু প্রথম রাত্রিতেই? আর বাকী রাত আমার ঘর নিরালা থাকে? আমার কি একটু শান্তি আছে?

বর্তমানে আমাকে লক্ষ্য করেই কি তুমি এ কথাটা বলছ?

ছি ছি, তোমাকে কেন বলব? তুমি তো আর আমার খদ্দের নও। দেখ সাত্যকি, আমার জীবনটা নিয়ে শুধু বিকিকিনির খেলা। আপন বলতে কে আছে, এক তুমি ছাড়া! তাও তো আমার কথা

তোমার মনেই থাকে না। তিন তিনটা বছর কোথায় কোথায় কাটিয়ে এলে, আমার কথা মনেও পড়ত না।

না না, পড়ত বই কি।

উলুপী হেসে উঠল, খুব কথা বানাতে শিখেছ। বেশ, মাঝে মাঝে এরকম তুটো-একটা মিষ্টি কথা বানিয়ে হলেও বোলো। কিন্তু শুনছি, তুমি নাকি আজকাল ভাল হয়ে গেছ। 'আজকাল নাকি তোমাকে আর অস্থানে কুস্থানে দেখা যায় না। খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি যদি এত ভাল হয়ে যাও, আমার চলবে কি করে? আচ্ছা, থাক গে এখন আমার কথা, তোমার কথা বল।

সেদিন তোমাকে যে-খবরগুলি নিতে বলেছিলাম, তার কিছু করতে পেরেছো?

ও, সেই কথা! সেইজন্য আজ এত রাত্রিতে উলুপীর কথা মনে পড়ল? কিন্তু আগে বল, এসব খবর দিয়ে কি করবে তুমি? তোমার এ আবার কোন্ খেয়াল?

আমার বহু উদ্ভট খেয়ালের মধ্যে এও একটি।

না গো না, এত সহজ করে আমাকে বুঝিয়ে দিও না। তুমি বলার আগে থেকেই আমি একটু একটু ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। ব্যাপারটা বড়ই জটিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি তো এতদিন বাদে বিদেশ ঘুরে এই সেদিন মোটে এলে। এরই মধ্যে এর ভিতরে জড়িয়ে পড়লে কেমন করে?

কে বলল আমি জড়িয়ে পড়েছি? আমি তো দূর থেকে দাঁড়িয়ে একটু দেখতে চাইছি মাত্র। কিন্তু তোমার কথায় মনে হচ্ছে, তুমি সামনে বসেই সব দেখতে পাচ্ছ। আমি যখন বলেছিলাম তখন কিন্তু এতটা আশা করে বলি নি।

তা আর কেমন করে বলবে? তুমি তো আর জান না সম্প্রতি শ্রুতকীর্তি আমার কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা করছে। সে যখন আসে, তু'-চার জন বন্ধু-বান্ধবও আসে তার সঙ্গে।

এখানে বসে সুরা পান করে, আর নিশ্চিন্ত ভাবে মন খুলে অনেক কিছু আলাপ করে। সে সময় আমাকেও কাছে বসে তাদের আনন্দ দান করতে হয়। তখন কানটাকে একটু সজাগ রাখলেই চলে।

মন্ত্রীর কথা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়, না?

উলুপী চমকে উঠল, তুমি কেমন করে জানলে?

জানি না, অনুমান করছি মাত্র।

শুধু মন্ত্রী নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে আরও অনেকের কথাই ওঠে। অনেকের নামই শুনি, তাদের মধ্যে দু'-এক জন ছাড়া আর কারু নাম তো জানি না, কাজেই নামগুলি মনে থাকে না। তোমার যখন এতই দরকার, এখন থেকে নামগুলি মনে রাখতে চেষ্টা করব।

সেনাপতির সম্পর্কে কোন কথা হয়?

তা তো লক্ষ করি নি।

শূদ্র কর্ষকদের বলি-বৃদ্ধির ব্যাপার নিয়ে?

ও বাবা, তাও তোমার অজানা নয়? এ নিয়ে তো প্রায়ই কথা-বার্তা বলতে শুনি। কিন্তু সাত্যকি, সত্য করে বল দেখি, এটাও কি তোমার অনুমান?

না, অনুমানের চেয়ে কিছুটা বেশী।

আচ্ছা, সাত্যকি, আর এক কথা, এ কি শুধুই তোমার কৌতূহল? সত্যি করে বলবে কিন্তু।

না উলুপী, তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। কৌতূহল-যে নেই তা নয়। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, বহু লোকের কল্যাণ-অকল্যাণ আর জীবন-মরণ এই সবকিছুর সঙ্গে জড়িত। শুধু দর্শক হয়েই থাকতে ইচ্ছা করছে না।

তুমি ঠিকই বলেছ। ওদের কাছে যে-সব কথা শুনি, তাতে সেই রকমই তো মনে হয়। কিন্তু তুমি কি করতে পারবে? কতটুকু ক্ষমতাই বা আছে তোমার।

কি, ক্ষমতা? কিছু না। কিন্তু ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই

সাত্যকিকে দিয়েই অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি।

উলুপী হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

কি হোল, হাসছ যে?

একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কি এমন কথা?

শ্রুতকীর্তি আশ্বাস দিয়েছে আমাকে, ওর নাকি শীগগিরই সুদিন আসবার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাটা যদি পূর্ণ হয়, ও আমাকে বিয়ে করবে। তুমি কি বল? খুশি হবার মত কথা নয়?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু ওর-যে আবার একটা বউ আছে।

থাক গে বউ। অধিক থাকতে দোষ নেই। বলেছে, আমাকে প্রধানা করবে। কিসের প্রধানা গো?

প্রধানা? প্রধানা মন্ত্রীপত্নী হতে পারে।

উলুপী অবাক হয়ে সাত্যকির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বলল, তুমি আশ্চর্য মানুষ তো!

কেন, কি করলাম?

মন্ত্রীপত্নী, এ কথাটা তুমি কেমন করে বললে? শ্রুতকীর্তি এক দিন নেশার ঘোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি যখন মন্ত্রী হব, তুমি হবে মন্ত্রীপত্নী।

সাত্যকি হেসে বলল, বাঃ, বেশ তো, শ্রুতকীর্তির পাশে তোমাকে ভালই মানাবে।

উলুপীও হেসে উত্তর দিল, তা তো মানাবে। আপাতত তার একটা কাজ করে দেবার জন্য ক'দিন ধরে আমার পেছনে উঠে-পড়ে লেগেছে।

কি এমন কাজ?

রাজপুরীতে একটি দাসী চাই। রানীদের প্রসাধনের কাজ করতে হবে। ও বলছে আমাকে সেই জায়গায় গিয়ে কাজ করতে।

প্রসাধনের কাজ তো আমি ভাল করেই জানি, কত লোকের জন্য নিজেকে সাজিয়ে এসেছি, আজও তাই করতে হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীন বৃত্তি আমার, আমি কেন যাব পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে? শ্রুতকীর্তি লোভ দেখাল, তিন লহর সোনার হার দেবে। সোনার লোভে নয়, আমার নিজেরও একটু শখ আছে। রাজা-রানীর কথা তো গল্পেই শুধু শুনেছি। একবার নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছা হয়, সত্য-সত্যই তারা কেমন—আমাদের মতই মানুষ না আলাদা রকম কিছু। শখও আছে আবার সাহসও পাচ্ছি না। লোক তো বড় সহজ নয়, কোন ভাল মতলব নিয়েও ডেকে ওখানে পাঠাচ্ছে না। কে জানে কোন্ বিপদে নিয়ে ফেলবে! আমি বললাম, তোমার উদ্দেশ্যটা কি সেইটে খুলে বল না। ও বলল, উদ্দেশ্য একটা আছে বই কি। আমার একটু সুবিধা হয়। আর আমার সুবিধা হলে তোমারও সুবিধা। কিন্তু আগে তুমি রাজি হও, তার পর সব কথা বলছি। আমি বললাম, কোন কিছু না জেনে শুনে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে আমি রাজি নই।

সাত্যকি হেসে বলল, বাঃ, শ্রুতকীর্তি পালাটা বেশ জমিয়ে তুলেছে তো। তুমিই বা এমন করছ কেন? রাজি হয়ে যাও, পালাটা আরও একটু জমুক। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে! ঢুকে পর ভিতরে, অনেক মজা দেখতে পাবে।

উলুপীর চোখ দুটো উত্তেজনায় চক চক করে উঠল। বলল, তুমি বলছ? তুমি যদি বল, আমি রাজি হয়ে যাব। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, তবে মনে হবে একটা মজার খেলা খেলতে চলেছি।

আমি বলছি, তুমি রাজি হয়ে যাও।

আমিও বলছি, আমি রাজি।

সাত্যকি প্রশ্ন করল, উলুপী, তুমি উষস্তি চাক্রায়নের নাম জান?

রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন?

হ্যাঁ।

বাঃ, কি-যে একটা কথা বল! রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়নের নাম জানে না, গোকর্ণ প্রদেশে এমন কে আছে। তাঁর পুণ্যেই তো গোকর্ণ প্রদেশের এত সমৃদ্ধি। শুনেছি তিনি নররূপী দেবতা। কিন্তু তাঁর কথা কেন?

শ্রুতকীর্তি আর তার দলবল যে-সব লোকের কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে, তাদের মধ্যে উষস্তি চাক্রায়নের নাম শুনেছ কোনদিন?

কই, না তো! ওদের পাপ মুখে তাঁর নাম উচ্চারণ করবে, এতই ওদের সাহস! জিভ খসে পড়ে যাবে না!

আপনার শ্বশুর স্বর্গত মহারাজ তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমার প্রতি আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—মন্ত্রী, আমার পুত্র বৃষকেতু আর আমার রাজ্য এই দু'য়ের ভার আমি তোমার উপর ন্যস্ত করে গেলাম। আমি তাঁর সেই শেষ আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলাম। সেদিন থেকে সেই পবিত্র ন্যাস রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে দেখি, আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। এখন বুঝতে পারছি, আমার শক্তি কত সীমাবদ্ধ। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, বিপদ এগিয়ে আসছে, অথচ তাকে বাধা দেব সে শক্তি আমার নেই। মহারাণী, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির সামনে আমি একান্ত অসহায়।

সুদক্ষিণা সেই ভাঙা মনে উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করে বলল, এমন করে ভেঙে পড়বেন না। এখন-যে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সময়। আপনারা কি খবর পাচ্ছেন না, শূদ্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

পাই বই কি। গোপ ও স্থানিকেরা নিত্য নূতন সংবাদ নিয়ে আসছে। অসন্তোষের মাত্রা-যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, এসব সংবাদ

থেকেই তা বোঝা যায়। স্বর্গত মহারাজ বলতেন, আমার রাজ্যের শান্তি নির্ভর করে আমার শূদ্র কর্ষকদের শান্তি ও সন্তোষের উপর। তাতে যদি আঘাত পড়ে, আমার রাজ্যের শান্তিও সেই সঙ্গেই ভেঙে পড়বে। সে কথা-যে কত দূর সত্য, এখন তা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব, মহারাজ তাঁর বলি-বৃদ্ধির সঙ্কল্পে অটল হয়ে আছেন, এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথাই শুনতে চান না। আবাব আরও একটা কথা শোনা যাচ্ছে, কোন এক দেবতা নাকি শূদ্রদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাদের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সাহায্য পেয়ে শূদ্রদের সাহস নাকি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কি-যে হবে এর পরিণতি, জানি না।

আপনারাও এই দেবতার গল্পে বিশ্বাস করেন নাকি?

বিশ্বাস করি না, আবার করিও। অবিশ্বাসেরই বা কি আছে! সত্য আর ন্যায়ের মর্যাদা ভঙ্গ করলে তার প্রতিফল সবাইকেই পেতে হয়। এখানে ছোট-বড় ভেদ নেই। অন্যায়-অত্যাচার কত কাল সয়? দেবতারা কি অন্ধ? তাঁদের দৃষ্টিতে কোন কিছুই চাপা থাকে না। যজ্ঞের ধোঁয়া দিয়ে তাঁদের চোখ অন্ধ করে রাখা যায় না।

নাগরিকদের প্রধানরা কি বলছেন এ সম্বন্ধে?

তাঁরা অধিকাংশ যে-যার নিজ নিজ স্বার্থের চক্রে আবদ্ধ হয়ে ঘুরে চলেছেন। তাঁদের দৃষ্টির ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কর্ষকদের বলিবৃদ্ধি হলে তাঁদের করবৃদ্ধি হবে না, আর বলিবৃদ্ধি না হলে তাঁদের করের বোঝাটা কিছুটা বাড়তে পারে, এই একটা কথা তাঁরা ভাল করে বুঝে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে একটু দূরদর্শী যাঁরা, তাঁরা অবশ্য বলি-বৃদ্ধির পক্ষে নন। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে শোনা গেল রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন বলিবৃদ্ধির পক্ষে, সেদিন থেকে এঁরাও তাঁদের সুরটা একটু নামিয়ে এনেছেন। এটাও অবশ্য দূরদর্শিতারই লক্ষণ।

আচ্ছা মন্ত্রীমশাই, লোক বলে উষস্তি চাক্রায়নের অসীম শক্তি,

তিনি যা বলেন তাই ফলে, তিনি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে কারু দিকে. তাকান সে ভস্ম হয়ে যায়। এ কথাগুলি কি ঠিক?

কেমন করে বলব মা, এসব ঘটতে তো কোনদিন দেখি নি। তবে তাঁর দৃষ্টির সামনে পড়লে অনেক লোক-যে ভেড়া বনে যায়, এটা দেখেছি। তবে আমার একটু সুবিধা, বয়সের দরুন আমার দৃষ্টি এতই ঝাপসা হয়ে গেছে যে, তাঁর কঠিন দৃষ্টিও আমার উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যা বলেন তাই ফলে, কথাটা ঠিক কিনা। কথাটা-যে একেবারে মিথ্যা, তাও বলতে পারি না। মহারাজকে সামনে রেখে তিনি নিজের ইচ্ছামত যা করবার তাই করে চলেছেন। আমি আর আমার মত অক্ষম আর নির্বোধ কয়েকটি লোক সময় সময় তাঁর কথার প্রতিবাদ করি। কিন্তু সেই প্রতিবাদে কোনই ফল হয় না। তাঁর যা করবার তিনি করেই চলেন।

কিন্তু এই ভাবেই কি চলবে? এর কোন প্রতিকার নেই? রাজ্য-শাসনের কাজ ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের নয়। আমার পিত্রালয়ে থাকতে সেখানেও দেখেছি ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণের এই দ্বন্দ্ব। ব্রাহ্মণেরা যখন তখন নিজেদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে রাজকার্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে আসে। কর্মবিভাগই যদি না-ই রইল, তবে বর্ণাশ্রমেরই বা অর্থ কি?

কিন্তু এখানে তো তা নয়, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন চিহ্নই এখানে নেই। রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন রাজসভায় সকলের সামনে প্রায়ই এ কথা বলে থাকেন, আমি একান্নাহারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, আমাকে তোমরা রাজকার্যের আবিলতার মধ্যে টেনো না। তোমরা আমার শান্তি ভঙ্গ কোরো না, আমাকে আমার ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম নিয়ে রত থাকতে দাও।

বেশ তো, তিনি তাঁর ক্রিয়াকর্ম নিয়েই থাকুন, তাঁকে বাধা দিচ্ছে কে?

না, বাধা দেবার লোক আছে। স্বয়ং মহারাজ এবং অন্যান্য সভাসদরা তখন ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করেন, প্রভু, আপনি আমাদের এমন করে ছেড়ে যাবেন না। আপনার উপদেশ ছাড়া আমরা কর্ণধার-হীন তরণীর মত বিপথে ভেসে যাব। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর অবশেষে তিনি তাঁদের প্রার্থনার সম্মতি দেন। এর পর তিনি তাঁর রাজপুরোহিতের আসনে বসে রাজকার্যে মন্ত্রণা দিয়ে চলেন, আর আমি রাজসিংহাসনের পাশে মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করে হাত গুটিয়ে বসে থাকি। এই অভিনয় অনেকদিন থেকেই চলে আসছে।

কিন্তু এত দিনেও এদের চোখ ফুটছে না?

সবাই-যে সম্মোহিত হয়ে আছে, তাও নয়। কেউ কেউ আছে, এই অবস্থাটা যাদের পক্ষে সুযোগ এবং এই সুযোগটাকে তারা তাদের কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে। তবে সম্প্রতি এক দল ক্ষত্রিয় যুবক একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারা বলছে, এতকাল যে-সকল বিষয়ে তাদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, ব্রাহ্মণ যুবকেরা তার মধ্যে অসঙ্গত ভাবে ভাগ বসাচ্ছে। আর এসব ক্ষত্রিয় যুবকরা আমার কাছে এসে ঘোরাঘুরি করছে। এভাবে যদি আর কিছুদিন চলে, তবে আমাকে অচিরেই ওদের বিষ নজরে পড়ে যেতে হবে। এমনিতেই আমার মতামতের জন্য ওরা আমার উপর খুবই অপ্রসন্ন।

আপনারও কি তবে ভয়ের কারণ আছে?

আছে বই কি মা। কিন্তু সেজন্য আমি ভাবি না। জীবন দিয়েও যদি মহারাজকে এই জাদুকর ব্রাহ্মণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ, স্বর্গত মহারাজ আমার উপর যে-দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তা পালন করতে পারছি না। কিন্তু তা হলেও আমি ছাড়ব না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব, তার পর ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

আমি কি আপনার কোন কাজেই লাগতে পারি না?

আপনি কি আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন? আপনি কি করছেন না করছেন আমি কি তার কিছুই জানি না মনে করছেন? কিন্তু বড় দুঃসাহসের পথে পা বাড়িয়েছেন মা। আপনার জন্য আমার বড় ভয় হয়। আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন, আপনি রাজরানী। আঘাত যদি কখনও আসে বড় হাতেই আসবে।

কিন্তু ভয় করে বসে থাকবার সময় কি এখন আছে? আপনাকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করছি। শ্বশুর আপনার উপর যে-দায়িত্বের ভার ন্যস্ত করেছেন সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করে আপনি নিজের ভয়ের কথা ভুলে গেছেন। আর আমার স্বামী আর এই রাজ্য-সম্পর্কে আমার কি কোনই দায়িত্ব নেই?

মন্ত্রী ভাবতে লাগলেন, এ কথার কি উত্তর দেবেন।

আপনি কি মনে করেন, উষস্তি চাক্রায়ন সত্য-সত্যই জাদু জানেন?

না মনে করে উপায় কি? আমাদের মহারাজ তো এমন ছিলেন না কোনদিন। পিতার মৃত্যুর পর থেকে আমিই তো তাঁকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছি। কিন্তু সেই মানুষের মনের গতি আজ কি? কারু কথাই আজ তাঁর কাছে কথা নয়। একমাত্র উষস্তি চাক্রায়নের কথাকেই অন্ধের যষ্টির মত আঁকড়ে ধরে আছেন। এ যদি জাদু না হয় তবে জাদু আর কাকে বলব! তা নইলে আপনার মত মেয়ে, আপনিও ফিরিয়ে আনতে পারছেন না তাঁকে।

মাথা নীচু করে বসে রইল সুদক্ষিণা। মনে মনে ভাবছিল, কিছুটা দোষ হয়তো তারও আছে। মেজো রানী আর সেজো রানীর হাতে রাজাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে এ রকম আলগা হয়ে না থাকলে এ কথাটা আজ হয়তো শুনতে হোত না—তুমিও তো ফিরিয়ে আনতে পারছ না তাঁকে। জাদু কি শুধু উষস্তি চাক্রায়নেরই আছে? তার কি সেদিন যৌবনের জাদু ছিল না? আজও কি নেই? এ জাদু কি সহজ জাদু? কিন্তু আজ আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। তারা আজ পরস্পর থেকে বহু দূরে সরে গেছে।

কতক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুদক্ষিণা মন্ত্রীকে প্রশ্ন করল, এমন কোন যাগ-যজ্ঞ কি নেই, যা দিয়ে আমার স্বামীকে আবার তাঁর নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায়?

মন্ত্রী একটু ভেবে বললেন, হয়তো আছে, কিন্তু রাজপুরোহিতের বিধান ছাড়া যজ্ঞ করবে কে? সে অধিকার কারু নেই।

এবার গাঢ় হয়ে এল সুদক্ষিণার কণ্ঠস্বর

এমন কোন মন্ত্রবিদ নেই যে এই জাদুকে ভেঙে চুরমার করে উড়িয়ে দিতে পারে?

এমন কোন্ মন্ত্রবিদ আছে যে, উষস্তি চাক্রায়নের বিরুদ্ধে মন্ত্র প্রয়োগ করতে সাহস করবে?

সমস্ত পথ বন্ধ, কিছুই করবার উপায় নেই। উষস্তি চাক্রায়ন এমনি অপ্রতিহত ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে থাকবেন, আর তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছু পরিচালিত হবে। তাঁর এই মায়া-চক্রের বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই! কথাটা যতই ভাবতে লাগল ততই অস্থির হয়ে উঠল সুদক্ষিণা। একটা চাপা ক্রোধ তার মধ্যে গর্জে গর্জে উঠতে লাগল। তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। সে নয়, কে যেন তার ভিতর থেকে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল, এমন কেউ কি নেই যে উষস্তি চাক্রায়নকে হত্যা করতে পারে? মানুষের কথা নয়, এ যেন ক্রুদ্ধ সাপের চাপা গর্জন।

মন্ত্রী বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছেন?

সুদক্ষিণা মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে বলল, না না, ও কিছু নয়।

ওদিকে শকটচালক তখন বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, মা, চলুন, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!

সেনাপতি প্রবীর বলল, সমস্ত নগরবাসীর মধ্যে এই নিয়েই কানাকানি চলছে। আমার সৈন্যদের মধ্যেও তাই। সবাই বলছে

শূদ্রদের মধ্যে এক দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। কোন্ দেবতা, তার নাম জানে না কেউ। কেউ বলছে রাত্রি বেলায় দেবতা যখন আসেন তখন আকাশ লাল হয়ে ওঠে। নগরের কেউ কেউ নাকি এটা লক্ষ করেছে। কেউ বলছে, আকাশ থেকে বৃষ্টির মত অস্ত্র বর্ষণ হয়। শূদ্রেরা সেই সব অস্ত্র গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। কেউ বলে দেব, কেউ বলে দেবী। আবার কেউ বলে দেবীও নয়, একটা ঈগল পাখি। তাকে চোখে দেখা যায় না, শুধু তার ডাক শোনা যায়। কত জনে কত কথা বলছে! সৈন্যদের মধ্যে তো দস্তুর মত ভয় ঢুকে গেছে। কেউ কেউ বলছে, শস্যের ভাগ নিয়ে যদি গোলমাল বাধে তা হলে তারা তাদের ওখানে গিয়ে হামলা বন্ধ করতে পারবে না। সেই দেবতা নাকি এবার নিজেই সমস্ত শস্য পাহারা দেবেন। তাঁর সামনে মরতে যাবে কে? সৈন্যদের নিয়ে-যে কি সমস্যায় পড়েছি। ওদের সামলে রাখাই-যে কঠিন। শ্রুতকীর্তি, তুমিই বল না, শূদ্র-পল্লীর আসল খবরটা কি? তোমার চরেরা কি বলে?

শ্রুতকীর্তি বলল, শুনছি তো কত কথাই। সত্য-মিথ্যা কে বলবে! তবে এটা ঠিক, সাহসটা ওদের খুবই বেড়ে গেছে। বলি-বৃদ্ধির ব্যাপারটা নিয়ে আগে ওদের মধ্যে দু'টো মত দেখা দিয়েছিল, এখন সবাই একমত হয়ে গিয়েছে। এ-গ্রাম আর ও-গ্রামের কথা নয়, গ্রামের পর গ্রাম, সব জায়গাতেই এই একই অবস্থা। কর্ষকেরা গোপনে গোপনে জমায়েত হচ্ছে, আর সেই জমায়তের মধ্যে ওরা ওদের সেই পবিত্র অস্থি-খণ্ড ছুঁয়ে শপথ করছে যে, বলি যদি বাড়ানো হয়, তবে ওরা বলি মোটে দেবেই না।

বল কি, অবস্থা-যে তা হলে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জীবনে এমন কথা তো কখনও শুনি নি। বহুকাল আগে এই রকম একটা ব্যাপার নাকি আর একবার ঘটেছিল। সেদিন আবার ফিরে আসবে নাকি? গুরুদেব কি বলছেন? এ সমস্ত খবর দিয়েছ তাঁকে?

আমি দেব খবর, তবে তিনি খবর পাবেন? গুরুদেব ঘরে বসেই সব খবর পান। তিনি কিন্তু এসব দেব-দেবীর কথা মোটে বিশ্বাসই করেন না। তিনি বলেন, এ সমস্তই মন্ত্রীর দলের নষ্টামী। ওরাই শূদ্রদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে এই সমস্ত করাচ্ছে।

এই নখদন্তহীন অথর্ব মন্ত্রী! এসব তারই গোপন চক্রান্ত? বলছ কি তুমি, এটা কি একটা বিশ্বাস করার মত কথা?

আমি তো কিছু বলছি না, বলছেন স্বয়ং গুরুদেব। এই চিন্তাটা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু তুমি মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র, মন্ত্রীর খবর তুমি রাখ না?

কিছু কিছু খবর রাখি বই কি। বৃদ্ধকে বাইরে থেকে সহজ বলে মনে হলেও মোটেই সহজ নন। নানারকম সন্দেহজনক লোক তাঁর কাছে যাতায়াত করে। লোকে বলে রাজপুরীর শকটকেও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়।

রাজপুরীর শকট? রাজা নিজে আসেন?

সেটা কি একটা সম্ভব কথা? রাজারা কি কখনও নিজের মন্ত্রীর বাড়ি যান? প্রয়োজন পড়লে মন্ত্রীরাই রাজার কাছে গিয়ে থাকেন।

তবে?

তবে? সেটাই তো প্রশ্ন। আরও একটা জিনিস লক্ষ করার ব্যাপার। রাজপুরীর শকটটা আজকাল যেন একটু বেশী ব্যস্ত বলেই মনে হয়। এখানে ওখানে, নানা জায়গাতেই তাকে এখন দেখা যাচ্ছে।

তোমার কথাগুলি হেঁয়ালির মত। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তোমরা কি সন্দেহ করছ যে, মন্ত্রী ভিতরে ভিতরে রাজাকে টানছে।

। না, তা মনে করি না। রাজা বড় শক্ত খুঁটিতে বাঁধা পড়ে গেছেন। তাঁর আর নড়বার উপায় নেই।

তবে ?

তবে ? সেটাই তো কথা

সুদর্শন এসে ডাকল, সাত্যকি, তুমি তৈরি তো ? কালই কিন্তু আমাদের যাত্রার দিন।

যাত্রার দিন ? কালই ? কোথায় ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সাত্যকি।

বা রে বা, আচ্ছা লোক তো তুমি ! তীর্থ-ভ্রমণে যাত্রার প্রস্তাবটা তুমিই তো প্রথম তুলেছিলে। তুমিই তো আমার মনে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললে। দিনক্ষণ সব স্থির হয়ে গেল, আমিও এদিকে আমার সংসারের ব্যবস্থাটা গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে এনেছি। আজ বাদে কাল যাত্রার লগ্ন, আর তুমি এখন প্রশ্ন করছ, কিসের যাত্রা, কোথায় যাত্রা ?

সাত্যকির এবার মনে পড়ে গেল। সে অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকে বলল, তাই তো ! এ কথাটা-যে সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। কেমন করেই বা মনে থাকবে ! হঠাৎ শূদ্রদের ব্যাপারটার মধ্যে এমন করে জড়িয়ে পড়ে গেল যে, তখন কি আর কোন কথা মনে থাকে ?

সে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, আমি-যে ভাই ভীষণ ব্যস্ত, আমার তো এখন যাবার উপায় নেই।

ব্যস্ত ? তোমার আবার কিসের ব্যস্ততা ?

আরে ভাই, সে অনেক কথা। পরের ধান্ধায় জড়িয়ে পড়েছি।

তোমার এই ব্যস্ততার শেষ হবে কবে ?

সাত্যকি একটু ভেবে বলল, দু' মাসও হতে পারে, ছ' মাসও হতে পারে, আবার তার বেশীও হতে পারে।

বাঃ, চমৎকার ! তোমার মত খামখেয়ালী লোকের পাল্লায়

পড়লে এই দশাই হয় তার। আমার খুব শিক্ষা হোল এবার। কিন্তু আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি। এখন আর মন বদলাতে পারব না। তোমার যখন নিকট ভবিষ্যতে আশা নেই, তখন আমি কালই যাত্রা করব।

সাত্যকি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, কি আর করা যাবে, তাই যাও। এর পরের বার যাব তোমার সঙ্গে।

আবারও তোমার সঙ্গে! হেসে উঠল সুদর্শন, কিন্তু তুমি আমার পথের সন্ধানটা বলে দাও। কোন্ পথ দিয়ে কোথা যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আমি যাব উত্তর দিকে, যেমন আমাদের কথা ছিল। সেখানে কোথায় কোন্ তীর্থ আছে, দেখবার মত কি কি আছে, সব কথাই আমায় বলে দাও।

হ্যাঁ, সবই বলছি। কিন্তু একটা কথা, চম্পাবতী নগরীর সেই মহাজ্ঞানী স্ত্রীলোকটি, যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম, তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে। অনার্য বলে তাঁকে তুচ্ছ করে চলে যেও না। বিপুল জ্ঞান আর শক্তির আধার সেই রহস্যময়ী নারী। তাঁর মত মানুষ কোথাও আমি দেখি নি। তাঁকে না দেখলে তোমার ভ্রমণ ব্যর্থ হবে।

নগরীর নাম চম্পাবতী, তাই না?

হ্যাঁ।

আর তাঁর নাম?

অম্বশলা।

আট

গো-পালকেরা এসে কাঁদতে কাঁদতে খবর দিল, দস্যুরা ওদের গাভী হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। রাজ-গোশালার বাছা বাছা গাভীগুলি দস্যু এসে হরণ করে নিয়ে যাবে, এ কেমন কথা! তবে আর গাভীর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী পাঠিয়ে লাভটা কি! আর এবারই তো প্রথম নয়। দস্যুদের সাহস ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। আগে নগরীর বহির্দেশের তৃণ-প্রান্তর থেকে ছোঁ মেরে ছুটো-পাঁচটা নিয়ে সরে পড়ত। এবার নগরীর প্রান্তদেশে এসে শতাধিক গাভী তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

গো-শালার অধ্যক্ষ তর্জন করে উঠলেন, তোরা কি সব ঘুমোচ্ছিলি নাকি? তোদের হাতে অস্ত্র ছিল না? এ অস্ত্র কি শুধু অঙ্গসজ্জা করবার জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে?

ওরা বলল, আমরা কি করব, ওরা-যে সব ঘোড়ায় চড়ে আসে। আর সে কি এক একটা ঘোড়া! আমরা কি ওদের নাগাল পাই? আর ওদের ঘোড়ার খুরে বিদ্যুতের বেগ, মুহূর্তের মধ্যে আসে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ওরা আমাদের গাভীগুলির পেছন দিক থেকে ঘেরাও করে ধরল। আমরা হৈ হৈ করে ছুটলাম। কিন্তু আমরা ওদের কি করতে পারি! আমাদের একজন ওদের তরোয়ালের ঘায়ে মারা পড়ল আর ছু'জন ওদের ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়ে জখম হয়ে গেল। ওদের তাড়া খেয়ে গাভীগুলি প্রাণভয়ে সমুখ দিকে ছুটতে লাগল, আর ওরা পেছন দিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, যেন ওদের নিজেদের গাভী।

ছুটো-চারটে গাভীর কথা নয়, পুরো একদল গাভী কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর। এবার নগরীর প্রান্তদেশে

এসে হামলা করেছে 'এর পরে নগরীর মধ্যে ঢুকে-যে রাজ-গোশালা ভেঙে গাভী নিয়ে যাবে না তারই বা বিশ্বাস কি? এমন হলে রাজা আর রাজ্যের মর্যাদা বলতে কিছু থাকে! প্রতিবেশী দস্যু জাতির অভাব নেই। দুর্বলতা টের পেয়ে গেলে তারা একে একে সবাই এসে হামলা করবে।

এই ঘটনার কয়েক দিন বাদেই এই নিয়ে রাজসভা বসল। এই সমস্যার একটা আশু সমাধান অবশ্যই দরকার। কিন্তু গাভী-হরণটাই একমাত্র ব্যাপার নয়, তার চেয়েও বৃহত্তর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গো-পালকদের মুখে জানা গেছে, এই দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ নয়, তারা আর্যদের মতই সুগৌর। এ কথা কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে না। দস্যু কি কখনও গৌরবর্ণ হতে পারে! এমন কথা কেউ কোনদিন শুনেছে! কেউ কেউ বলে গো-পালকেরা আতঙ্কের ফলে উলটো-পালটা দেখেছে। আবার কেউ বলে আপনাদের ভীরুতাকে চাপা দেবার জন্যই ওরা বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলে লোকের কাছে ধোঁকা দিতে চায়। সেজন্যই এই দস্যুদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর আনবার জন্য গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল। গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে ফিরেছে। গুপ্তচরের সংবাদটা উপর মহলে খুবই আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

রাজসভায় দাঁড়িয়ে গুপ্তচর সবিস্তারে সমস্ত কথা বলল:

গো-পালকেরা যা বলেছে তা অসত্য নয়, দস্যুরা আমাদের মতই গৌরবর্ণ। ওদের রাজ্যের নাম দেবগৃহ। সে আমাদের এখান থেকে তিন দিন তিন রাত্রির পথ। আর ওরা নাকি ঘোড়ায় চড়ে দুই প্রহরের মধ্যে এসে পৌঁছতে পারে।

বড় অতিথিবৎসল জাতি। বিদেশী অতিথি বুঝতে পেরে ওরা আমাকে খুবই আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে গ্রহণ করল। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, তারা আমাদের মতই আর্য ভাষায় কথা বলে। আমার কথাবার্তা বলতে বিশেষ অসুবিধা হোল না।

সভ্যসদেরা বিস্ময়ধ্বনি করে উঠল।

ওরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম, আমি বহু দূর দেশের অধিবাসী। তীর্থ পর্যটন করতে করতে পথ হারিয়ে এখানে চলে এসেছি। আমি ব্রাহ্মণ।

ওরা প্রশ্ন করল, ব্রাহ্মণ কি? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনারা আর্য ভাষাভাষী, অথচ ব্রাহ্মণ কাকে বলে জানেন না? ওরা বলল, না, আমরা ব্রাহ্মণ বুঝি না। আমি তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বর্ণাশ্রমের এই চার পর্যায়ের কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু ওরা নির্বোধের মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন আমার সন্দেহ হোল যে, আর্য ভাষাভাষী হলেও ওরা হয়তো প্রকৃত আর্য নয়।

আমি ওদের রাজার নাম জানতে চাইলাম। ওরা বলল, রাজা কি? আমাদের রাজা-টাজা নেই। আমি প্রশ্ন করলাম, রাজা নেই, তবে তোমাদের রাজ্যশাসন করে কে? ওরা বলল, আমরা রাজাও বুঝি না, রাজ্যও বুঝি না, আমাদের ওসব নেই।

তবে তোমরা কার কথা মেনে চল? কে তোমাদের পথ দেখায়?

ওরা বলল, আমাদের গণপতি আছে, সমিতি আছে, সভা আছে। তাদের মতেই আমরা চলি।

আরও অনেক কথা বলল ওরা, আমি সে-সব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ওদের দেব-দেবী নেই? একজন সভাসদ প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, আমাদের মতই ওরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ করে।

যজ্ঞ করে?

হ্যাঁ, যজ্ঞ করে।

ওরা পশু বলি দেয়? যজ্ঞের অগ্নিতে পশুর অস্ত্র দগ্ধ করে?

হ্যাঁ, করে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়?

হ্যাঁ, দেয়।

আশ্চর্য। ব্রাহ্মণ নেই অথচ যজ্ঞ আছে। তা হলে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রাহ্মণের কাজ কে করে?

আমি ওদের যজ্ঞানুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখেছি। ওদের যজ্ঞে হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। ওরা পুরুষ ও স্ত্রী সবাই মিলে বেদির চার দিকে ঘিরে বসে মন্ত্র পাঠ করে আর গান করে।

সে যজ্ঞের ফল কি? সে যজ্ঞের আহুতি কি দেবতারা গ্রহণ করেন?

সে কথা আমি কেমন করে বলব? তবে এই ভাবেই ওরা যজ্ঞ করে থাকে। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম. তোমাদের পুরোহিত নেই?

ওরা বলল, পুরোহিত কি?

আমি তখন বললাম, দেবতা আর তোমাদের মধ্যবর্তী কে?

ওরা বলল, কেন, আমাদের গণপতি।

একজন প্রশ্ন করল, ওদের সৈন্য দেখলেন? সৈন্যসংখ্যা কত হবে?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের সৈন্য নেই?

ওরা অমনি করেই নির্বোধের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, শেষে বলল, আমরা সৈন্য বুঝি না।

আমি বললাম, তা হলে তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ করে কারা?

ওরা বলল, কেন, আমরা সবাই যুদ্ধ করি, শুধু স্ত্রীলোকেরা করে না, অল্প বয়সীরা করে না, আর বৃদ্ধরা করে না।

যুদ্ধে তোমাদের পরিচালিত করে কে?

কেন, আমাদের গণপতি।

গণপতি—গণপতিই ওদের সব। রাজাই বলুন, পুরোহিতই বলুন আর সেনাপতিই বলুন, গণপতি ছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে না।

ওদের পুরুষেরা পশুচারণ করে, আর প্রতিবেশী জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করে তাদের ধন কেড়ে নিয়ে আসে।

ওরা কৃষিকর্ম করে না?

করে, তবে আমাদের মত নয়, যৎসামান্য করে। কিন্তু পুরুষেরা কৃষিকর্মের ধার দিয়েও যায় না। যা করবার মেয়েরাই করে। ওদের লাঙ্গল নেই। সেজন্য চাষের কাজে পশুর ব্যবহারও নেই।

একেবারে বর্বর! একজন উক্তি করল।

ওরা কিন্তু নিজেদের আর্যই বলে থাকে। আর আর্য যদি না-ই হবে, তবে বৈদিক মন্ত্র কেমন করে পাবে? তা'ছাড়া অনার্যের জিহ্বা দিয়ে কি কখনও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হতে পারে! সভায় উপস্থিত একজন পণ্ডিত বললেন, এদের বলা হয় ব্রাত্য। অনার্য সংসর্গের ফলে সনাতন বেদ-বিধি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এদের এই দুর্দশা হয়েছে। অনার্য সংস্পর্শ দোষে পরজন্মে এরা শূদ্রানীর গর্ভে জন্মলাভ করবে।

অনেকেই মাথা নেড়ে এই কথাটার সমর্থন করল।

গুপ্তচর ব্রাহ্মণ বলে চলল, কিন্তু এরা ভীষণ দুর্ধর্ষ জাতি, প্রতিবেশী জাতিগুলি এদের ভয়ে থর থর করে কাঁপে। ওরা যার দিকে লক্ষ করে ছুটবে, তার আর রক্ষা নেই। ওদের উচ্চ রণহুঙ্কার আর ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনি শুনে প্রতিপক্ষের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কোন কোন জাতি ভয়ে ওদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। আবার কতকগুলি জাতি ওদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

একদিন শুনলাম, গোকর্ণ প্রদেশের নাম করে ওরা হাসাহাসি করছে। গোকর্ণ প্রদেশের নাম শুনেই আমি চমকে উঠলাম। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা যে-দেশের কথা বলছ, সে দেশ কোথায়? ওরা বলল, এখান থেকে এক প্রহরের পথ।

সে দেশ কেমন?

অপূর্ব সে দেশ। সে দেশের নদীতে বার মাস জল থাকে। সে দেশের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত শস্য ফলে। গো-চারণের জন্য তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তরের অভাব নেই। কিন্তু সে দেশের লোক নির্বোধ, দুর্বল আর ভীরু। ওখানকার পুরুষেরা মেয়েদের মত কৃষিকর্ম করে। ওদের পশুচারণের বুদ্ধি নাই। আর এমন নির্বীর্য-যে ওরা লুণ্ঠন করতেও জানে না। বীরের ধর্ম-অনুসারে অপরের ধন কেড়ে নিয়ে আসবে দূরে থাক, ওরা নিজেরটাও রক্ষা করতে পারে না। আমরা যখন ওদের গাভী কেড়ে নিয়ে আসি, ওরা তখন ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। প্রজাপতি এই সমস্ত দুর্বল জাতিকে আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এতদিন বাদে ওদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। ওরা এখনও জানে না যে, ওদের ধ্বংসের দিন আসন্ন। এই বলে ওরা হো হো করে উচ্চ হাসি হেসে উঠল।

স্বজাতির নিন্দা শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি কৃষ্ণবর্ণ, না আমাদের মতই গৌরবর্ণ? ওরা বলল, গৌরও আছে, কৃষ্ণও আছে। কিন্তু আমাদের এই তরবারি আর ভল্ল গৌর আর কৃষ্ণের বাছ-বিচার করবে না।

আমি বললাম, ওরা কি আমাদের মতই আর্য?

ওরা বলল, হতেও পারে, না-ও হতে পারে। সে চিন্তা করে কি লাভ? আমাদের এমন দুরবস্থা যে, পুরুষ প্রতি একটা করে মেয়ে জোটে না। তাই একটা মেয়ে নিয়ে দশটা পুরুষ টানাটানি করে। তার ফলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। ও দেশ আমাদের হাতে এলে পর তখন মেয়ের আর অভাব থাকবে না। গৌরবর্ণের পুরুষ যেগুলি তাদের একটাকেও রাখব না, ওদের মেয়েগুলি সব আমাদের হাতে চলে আসবে। আর আমাদের মেয়েদের চাইতে ওরা দেখতে শুনতে অনেক ভাল। আমাদের মেয়েরা কৃষিকাজ করবার ফলে বড় রুক্ষ আর শক্ত হয়ে যায়।

ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। তবু কোন মতে বলে ফেললাম, তোমরা কবে পর্যন্ত ও দেশে যাচ্ছ? ওরা বলল, লোক তো একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু আমাদের গণপতি বলেছেন, ধৈর্য ধর, নূতন দেশে গিয়ে বসতি করব, হুট করে গেলেই হয় না। উপযুক্ত লগ্ন আসুক। সেই লগ্ন এলে পর ইন্দ্রের যজ্ঞ হবে। সেই যজ্ঞ যদি সুসম্পন্ন হয়, তবে এমন কোন জাতি নেই যাকে আমরা ভেঙে চূর্ণ করতে না পারব।

এই বিবরণ শুনে সমস্ত সভা ঠাণ্ডা হয়ে যেন জমে গেল। কারু কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্রাহ্মণ আরও বলল, ভেবেছিলাম আরও কিছুদিন ওখানে থেকে ওদের রীতি-নীতি আর কার্যকলাপ ভাল করে দেখে-শুনে আসব। কিন্তু এই সমস্ত কথা শোনার পর আমি আর ওখানে বসে থাকতে পারলাম না। ওদের সেই লগ্ন কখন-যে এসে পড়বে ঠিক আছে কিছু! কোনমতে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি। সব কথাই আপনাদের বললাম, এখন আপনারা যা ভাল বিবেচনা করেন করুন।

সভাসদেরা বিষম চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন বিপদ-যে তাদের মাথার উপর ঝুলছে, এ কথা কে-ই বা জানত! কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থাকবার পর সবাই এক সঙ্গে সশব্দ হয়ে উঠল। দেবগৃহ থেকে যে-অশ্বারোহী দানবগুলি ছুটে আসছে তাদের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাওয়া যাবে, সেই প্রশ্ন নিয়ে সবাই কোলাহল করে উঠল। তাদের সবার দৃষ্টি রাজার মুখের দিকে। রাজা বৃষকেতু তার রাজত্ব-কালের মধ্যে আর কখনও এমন সমস্যার সম্মুখীন হন নি। তিনি হতাশ দৃষ্টিতে সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেনাপতি গভীর-ভাবে চিন্তা-নিবিষ্ট, তিনি কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সকলের চোখে-মুখে উদ্বেগ আর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, কিন্তু উত্তর দেবার মত কেউ নেই।

কেউ যখন প্রতিকারের কোন পথ দেখাতে পারছে না, তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, দেবগৃহের এই দস্যুদের যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তা

হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে রাজ্যের মধ্যে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ কথা আপনাদের কারুই অজানা নেই যে, বলিবৃদ্ধির ফলে শূদ্রপল্লীর লোকেরা বিক্ষুব্ধ। অথচ তারাই আমাদের সম্মুখের পদাতিক বাহিনী, আক্রমণকারীদের প্রথম আঘাতটা তাদের উপর এসে পড়বে। এদের অসন্তোষ যদি মিটিয়ে ফেলা না যায়, তা হলে তার পরিণতি-যে কি হতে পারে, সে কথা ভাবতেও আমার আতঙ্ক হয়। তারা-যে সদলবলে আক্রমণকারীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে? সেজন্যই আমার কথা হচ্ছে, বলিবৃদ্ধির আদেশ বাতিল করে দিয়ে এই মনোমালিন্যের অবসান করা হোক। দ্বিতীয় কাজ, দেশকে রক্ষা করবার জন্য সর্বভাবে প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু প্রথম কাজটি না করলে দ্বিতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। আমাদের পথ খুবই পরিষ্কার, একটি ছাড়া দু'টি পথ নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

বলিবৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করাবার জন্য মন্ত্রী প্রথম থেকেই চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু রাজাকে তিনি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি, আর সেজন্য সভাসদ্‌দের অধিকাংশকেই তিনি স্বপক্ষে টানতে পারেন নি। কিন্তু আজ এই নতুন পরিস্থিতির সামনে প্রায় সবাই অতি সহজেই তাঁর পক্ষে চলে এল। মনে মনে নয়, তারা সশব্দে এই প্রস্তাবকে অনুমোদন জানাল। শুধু অনুমোদন নয়, অবিলম্বে মন্ত্রীর এই প্রস্তাব মত কাজ করার জন্য তারা রাজাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওদের সেই ভীষণ লগ্ন কখন এসে যায় বলা যায় কি? রাজা বিচলিত হয়ে সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেনাপতি তখনও চিন্তামগ্ন, তিনি ভাল বা মন্দ কোন কথাই বললেন না। রাজা 'বিবেচনা করে দেখবেন' বলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করলেন। বিবেচনা করবার অর্থটা কি সে কথা বুঝতে কারু বাকী ছিল না। উষস্তি চাক্রায়ন কোনদিনই রাজসভায় উপস্থিত থাকেন না।

তোমার বুকে আমরা নাচি, গাই, কোলাহল করি; আর রণক্ষেত্রে আমাদের রণহুঙ্কার আর ঢক্কা-নিনাদ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। হে পৃথিবী, তুমি আমাদের শত্রুদের বিতাড়ন কর। তুমি আমাদের শক্তি দাও, দীর্ঘায়ু দাও।

যে যা-ই বলুক না কেন, সুদর্শন এতদিন তার এই গোকর্ণ প্রদেশকেই পৃথিবী বলে জেনে এসেছে। মানুষের কথা আর শাস্ত্রের কথা কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু গোকর্ণ প্রদেশ আর এখানকার মানুষগুলি তার কাছে প্রত্যক্ষ, এদের মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা নেই, তবে এবার সাত্যকি তার মনে বহু প্রশ্ন আর সংশয় জাগিয়ে তুলেছে। যেটা সহজ ছিল তা জটিল হয়ে উঠেছে। তাই সে নিজের চোখে পৃথিবীকে দেখতে বেরিয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীর পথে চলতে গেলে এত-যে বাধা তা কি সে জানত! প্রতি পদে দুর্যোগ আর মৃত্যুর আশঙ্কা। একদিন বনের পথে চলতে চলতে এক দল রাক্ষসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাগ্যিস ওরা তাকে দেখতে পায় নি। সে সড় সড় করে একটা প্রকাণ্ড গাছের উপর উঠে বসল। সে-যে এত ভাল গাছে চড়তে পারে, এ কথা তার নিজেরও জানা ছিল না। ভয়ে তার প্রাণ ধুকপুক করতে লাগল। ঘন পাতার আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে সে দেখতে লাগল ওরা কি করে। ওরা-যে রাক্ষস, সে কথা সে আগে বুঝতে পারে নি, ওদের কার্যকলাপ দেখে বুঝল।

অর্ধ-উলঙ্গ কুড়ি-বাইশ জন একটা অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে ঘিরে বসেছিল। সুদর্শন ভাবল, ওরা যজ্ঞ করছে। ওদের মাঝখানে কে যেন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল। আর সবাই আমোদে মেতে আছে, তার মধ্যে এমন করে চেঁচায় কে! একটু পরেই সে দেখতে পেল ওদের মাঝে একটা লোক বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সে-ই অমন করে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল না। একবার চেঁচিয়ে উঠতেই ওদের মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে উঠে একটা

মোটা দণ্ড দিয়ে ওর মাথার উপর বার কয়েক ঘা মারল। ব্যস, ওর চেঁচানি একদম থেমে গেল।

আহা! লোকটাকে মেরেই ফেলল যে, কাঁতরে উঠল স্থদর্শন। এবার সে মনে করল কোন অপরাধের জন্য সম্ভবত ওর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তাদের দেশেও আছে। কিন্তু প্রাণদণ্ডের এ-রকম অসভ্য বিধান তাদের মধ্যে নেই। তারা খড়গাঘাতে মারে, বিষ খাইয়ে মারে, শূলদণ্ডে প্রোথিত করে মারে, অগ্নিতে দগ্ধ করে মারে, কিন্তু বন্য পশুর মত এ-ভাবে পিটিয়ে মারাটাকে স্থদর্শন সমর্থন করতে পারল না। কিন্তু এরা তো অনার্য, স্থসভ্য আর্যবিধি কেমন করেই বা জানবে!

দেহটাকে যখন ওরা আগুনের মধ্যে ফেলে দিল, সে ভাবল হয়তো ওরা মৃতের সংকার করছে, আর একবার ভাবল যজ্ঞাগ্নিতে মনুষ্যবলি নয় তো? কিন্তু ওরা তো অনার্য, ওদের আবার যজ্ঞ কি? একটু বাদে ওরা যখন অগ্নিপক্ক দেহটাকে আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে খেতে শুরু করল, প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে তখন আর বাকী রইল না। ভয়ে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল, আর তার কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে গাছের শাখা-পল্লবগুলি কাঁপতে লাগল। এবার সে বুঝতে পেরেছে, মানুষের মত দেখতে হলেও ওরা আসলে রাক্ষস। রাক্ষস না হলে মানুষ খাবে কেন? এই রাক্ষসের কত কাহিনী তার জানা আছে। কিন্তু রাক্ষসদের যেমন বিকট আকৃতি থাকবার কথা, এদের তো তেমন নয়। ঘোর কুৎসিত ও কৃষ্ণবর্ণ হলেও এদের দেখতে অনেকটা মানুষের মতই। কিন্তু এটা এদের যথার্থ রূপ কিনা তা-ই বা কে জানে! রাক্ষসেরা তো মায়ারূপী, হয়তো বা মানুষ শিকারের জন্য মানুষের মূর্তি ধরে বসে আছে।

তার মনে সন্দেহ হোল, হয়তো সে পথ ভুল করে রাক্ষসদের দেশে এসে পড়েছে। রাক্ষসেরা খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে সেখানেই পড়ে ঘুম দিল। স্থদর্শন গাছ থেকে নেমে অতি সন্তর্পণে এগোতে এগোতে

শেষে ভোঁ করে ছুট মারল। তার পর যেদিকে দু' চোখ যায়, সেই দিকে চলতে লাগল। পিতৃ-পুরুষের পুণ্যের ফলে সে এবার তার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

তারপর পথের দিশা হারিয়ে এদিকে ওদিকে নানা জায়গায় ঘুরে মরতে লাগল। কত জায়গায় কত রকমের মানুষ! নানা রংয়ের নানা ঢংয়ের চেহারা, এদের কারু কথাই সে বোঝে না, তার কথাও কেউ বোঝে না। আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতে হয়। কোথাও অতিথিকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে, কোথাও হয়তো লাঠি-ঠ্যাঙ্গা নিয়ে তাড়া করে আসে। এই পৃথিবীর চরিত্র বুঝে ওঠা ভার।

এই ভাবে নিরুদ্দেশের মত এখান থেকে ওখানে আর ওখান থেকে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক নগরে এসে পৌছল। পথশ্রমে আর ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে সে আর চলতে পারছিল না। নগরের দ্বারদেশে এক ঘনপত্র কেশর গাছ, ফুলের ভারে তার পল্লবগুলি নুয়ে পড়েছে। গাছের গোড়া ঘিরে বাঁধানো বেদী। তার উপর টুপটাপ করে ফুল খসে খসে পড়ছে। কেশর কুসুমের মদির গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সুদর্শনের আর চলবার শক্তি নেই। সে বিশ্রামের জন্য সেই বেড়ার উপর বসে পড়ল। বসতে বসতে ঘুমে তার চোখ ভেঙে এল। দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সেই বাঁশির শব্দ শুনতে শুনতে সুদর্শন ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের কয়েকটা ঢেউ পর পর তার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। ঘুমের মধ্যেই সে শুনতে পেল সেই বাঁশির শব্দ যেন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সে ভাবল, আমি কি ঘুমে না জাগরণে? কিন্তু এর উত্তর সে খুঁজে পেল না। বাঁশির শব্দ আস্তে আস্তে থেমে গেল। এবার একেবারে কানের কাছে শোনা গেল কার নূপুরের ঝিনি ঝিনি আর কাঁকনের ঠিনি ঠিনি। এ শব্দ সুদর্শনের অপরিচিত নয়। যে-দিন দীর্ঘরাত্রি জাগরণের ফলে দৈবাৎ ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়, সেদিন বসুমতী এমনি করেই তার ঘুম

ভাঙায়। চোখ না মেলেই সুদর্শন বলল, বসুমতী, আমি বড় ক্ষুধার্ত।

উত্তরে কে যেন মধুর হাসি হেসে উঠল, আর তেমনি মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হোল, আহার্য প্রস্তুত, আপনি উঠুন।

এ তো বসুমতীর কণ্ঠস্বর নয়, সুদর্শন চমকিত হয়ে চোখ মেলে তাকাল। চেয়ে দেখল, এ কে? এ তো বসুমতী নয়। এ এক অপরিচিতা যুবতী। স্মিতমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পেছনে আরও কয়েকটি যুবতী, বংশীবাদক্, রাজপুরুষ বেশধারী কয়েকজন লোক আর রক্ষীদল। সুদর্শন ধড়ফড় করে উঠে বসল, তারপর সদ্য ঘুমভাঙা অর্ধজড়িত স্বরে প্রশ্ন করল, ভদ্রে আপনার পরিচয় জানতে পারি?

আমি এ দেশের রানী। আপনি কে?

আমি আপনার অতিথি। আমি ক্ষত্রিয়।

আমার অতিথি? হ্যাঁ, ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন, আমার জন্যই পাঠিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই আমি চিনতে পেরেছি। হে অতিথি, আমি আপনাকে গ্রহণ করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

এই কথা বলেই রানী সুদর্শনকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে তাকে দুই হাতে বরণ করলেন। অবাক হয়ে ভাবল সুদর্শন, এ দেশে অতিথি সম্বর্ধনার এটাই কি রীতি?

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সখীরা কলকলিয়ে হেসে উঠল। এক সঙ্গে সবগুলি বাঁশি বাজতে লাগল, চারদিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল।

সুদর্শনকে কেউ কোন কথা ভাবতে দিল না, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ দিল না। রানীর সখীরা সুদর্শনকে ধরে শকটের উপর রানীর পাশে বসিয়ে দিল। সুদর্শন সসম্ভ্রমে সরে বসতে চাইল। কিন্তু না, রানী সরে যেতে দিলেন না, তার একটা হাত নাগিনীর মত

তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সখীরা আবার কলকলিয়ে হেসে উঠল। সুদর্শন বসে বসে ঘামতে লাগল।

অতিথির মত নয়, রাজার মত সম্বর্ধনা পেল সুদর্শন। প্রাসাদ-সংলগ্ন কক্ষে তার-বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবার সুদর্শন সব কথা জানতে পারল। রানী স্বয়ংবরা হয়েছেন, স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছেন তাকে। আর সে না বুঝে নিঃশব্দ থেকে তাকেই প্রকারান্তরে স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্ষুদ্র রাজ্য কন্দলী। গোকর্ণ প্রদেশের চেয়ে অনেক ছোট, তুলনাই হয় না। তিন বছর আগে এখানকার রাজা পরলোকগত হয়েছেন। বিধবা রানী এক বৎসর অশৌচ পালনের পর স্বামী নির্বাচন করবেন। গত দু'বছর ধরে রানী তাঁর স্বামীর জন্য সন্ধান করে ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর মনোমত স্বামী পান নি। আজ তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। সেজন্যই কন্দলী নগর উৎসব-সজ্জায় সেজেছে।

কন্দলী যেমনই হোক, রাজ্য তো বটে। আর রাজ্য যত ছোটই' হোক না কেন, রাজা রাজাই। রাজা হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু তবু সুদর্শন তার কর্তব্য স্থির করতে পারছে না। রানী সুপর্ণাকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। ক্ষত্রিয় পুরুষ, অতিরিক্ত একটা কেন, একশত বিয়েও করতে পারে যদি তাদের রক্ষা করে চলবার সামর্থ্য তার থাকে। কিন্তু সুপর্ণাকে বিয়ে করলে এখানেই থেকে যেতে হবে। তার মানে তাকে তার জন্মভূমি কর্মভূমি গোকর্ণ প্রদেশ ছেড়ে চলে আসতে হবে। সেটা কেমন করে সম্ভব? অথচ ঘটনার জাল এমনভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছে যে, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

কিন্তু হঠাৎ একটা সংবাদ সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের অবসান ঘটাল। কথায় কথায় সুপর্ণার মুখ থেকে জানা গিয়েছে যে, তার আর সুদর্শনের একই গোত্র। সর্বনাশ, সমগোত্রীয়ের মধ্যে বিবাহ কেমন করে হতে পারে! এ বিবাহ বৈধ নয়। দেবতারা আর পিতৃপুরুষেরা কখনোই

এই বিবাহকে সিদ্ধ বলে গ্রহণ করবেন না। এর পরিণাম ভয়াবহ। সুদর্শন বেঁকে বসল।

সুপর্ণা অনেক করে তাকে বোঝাল, এ তোমাদের ভ্রান্ত সংস্কার। দেখ, আমাদের ছোট ছোট সমাজ। আমরা যদি বিয়ের ব্যাপারে গোত্র-বিচার করে চলি, তবে এখানে পুরুষেরা পত্নী আর মেয়েরা স্বামী পাবে না। আর পুরুষ-নারীর মিলন যদি না হয়, সন্তান সৃষ্টি কেমন করে হবে? যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এটা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

সুদর্শন দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল—না, এ বিবাহ হতে পারে না। এ বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

সুপর্ণা আরও একটু কাছে সরে এল। তার দুই চোখে কামনার আগুন জ্বলে উঠল। সে বলল, এমন কোন শাস্ত্র নেই যা তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে। তুমি আমার। তোমার ওই মুখমণ্ডল আমার, তোমার ওই বাহুযুগল আমার, তোমার ওই বক্ষদেশ আমার, তোমার সর্বাঙ্গ আমার। প্রজাপতি আমার জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

না, তুমি আমার স্ব-গোত্রা, তুমি আমার বিবাহযোগ্যা নও। তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আমার দেশে ফিরে যাই।

সুপর্ণা হেসে উঠল, পরিত্যাগ করব? তোমাকে? অসম্ভব। কোথায় যাবে তুমি? এইখানে, আমার এই বুকে তোমার স্থান। তুমি যদি দূর সমুদ্রের পরপারে চলে যাও, আমি তোমাকে টেনে নিয়ে আসব, তুমি যদি গিরিশিখরে চলে যাও, আমি তোমাকে টেনে নিয়ে আসব। আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। আমি অকর্ষিত পতিত ভূমি। তুমি আমায় শস্যবতী করে তুলবে। আমি যজ্ঞাগ্নি, তুমি আমায় ঘৃতাহুতি দেবে।

রানী, তুমি আমার স্ব-গোত্রা—আমার সহোদরা তুল্যা, তোমার এই পাপ কামনা আমি পূর্ণ করতে পারব না। এই পাপকার্য আমরা

কেমন করে লুকিয়ে রাখব! তুমি কি জান না, মরুৎগণ সর্বত্র সঞ্চরণশীল, কোন কিছুই তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না?

প্রিয়, আমি তোমার প্রেমে অধীর, তুমি আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আমি আমার এই দেহকে তোমার দেহের কাছে উৎসর্গ করব। এসো বন্ধু, রথচক্র যেমন বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে আসে, তেমনি করে আমরা পরস্পর মিলিত হই।

দেবতাদের চোখে পলক পড়ে না। কি আলোকে, কি অন্ধকারে, কি উচ্চ, কি নিম্ন প্রদেশে, কি নিকটে, কি দূরে সর্বত্র তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত। আমি তাঁদের সদা জাগ্রত দৃষ্টিকে ভয় করি। না যুবতী, তুমি তোমার জন্য অন্য পুরুষ মনোনয়ন কর, আর রথচক্রের বেগে তার সঙ্গে মিলিত হও।

তুমি কি প্রস্তরখণ্ড, তোমার দেহে কি রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় না? রমণীর স্পর্শ কি তোমাকে উন্মাদ করে তোলে না? তুমি কি জান না, যে-পুরুষ কামার্তা নারীকে প্রত্যাখ্যান করে, দেবতারা তাকে কখনও ক্ষমা করেন না? লতা যেমন করে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে, তেমনি করে গাঢ় আলিঙ্গনে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি কেমন করে আমাকে এড়িয়ে চলে যাবে?

আতঙ্কে কেঁপে উঠল সুদর্শন। মরুৎগণ দেখছেন, দেবতারা দেখছেন, পিতৃগণ দেখছেন। আর তাঁদের দৃষ্টির সামনে এই নির্লজ্জা পাপিনী এ কি পাপকর্মে রত? সে জোর করে তার আলিঙ্গন থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিল।

সর্পিনীর মতই গর্জে উঠল সুপর্ণা। কামনার আগুন রোষাগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আমি কি এতই সুলভ? এতই অবহেলার পাত্র? এই কি তোমার আর্য রীতি? এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে যখন আমি তোমাকে সর্বসমক্ষে স্বামী বলে বরণ করলাম, তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করলে কেন? আর আজ তুমি আমাকে সমস্ত সমাজ আর

প্রজাপুঞ্জের কাছে লাঞ্ছিতা আর হাস্যাস্পদা করবে? সে হবে না। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমার স্বামী হয়ে এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে। তারপর যেদিন তোমার ঔরসে আমার গর্ভে প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম নেবে সেদিন যদি যেতে চাও, চলে যেও। কিন্তু তার আগে তোমার মুক্তি নেই।

সুপর্ণার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল সুদর্শন। এ দেশের মেয়েরা যেন কেমন। গোকর্ণ প্রদেশের মেয়েরা কাদামাটির মত কোমল আর নমনীয়। ওদের দিয়ে যেমন খুশি পুতুল বানানো চলে। কিন্তু এ দেশের মেয়েদের বিনয় নেই, স্ত্রীসুলভ লজ্জা নেই। এরা যেন নিজের শক্তিতে নিজেরা গড়ে ওঠে। রাজপথ দিয়ে পুরুষের মতই ওরা স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করে, ওদের কোন কুণ্ঠা নেই, সঙ্কোচ নেই। ওরা সব কাজে হাত লাগায়, ওরা সব কথায় কথা বলে। সুপর্ণা সেই জাতের মেয়েদের রাণী।

তার পরদিন সুপর্ণা আর সুদর্শনের কাছে এল না। সারা দিন সারা রাত নানা চিন্তায় তার মাথা ঘুরতে লাগল। সে তার রূপ যৌবন আর রাণীর ঐশ্বর্য দিয়ে সুদর্শনকে আকর্ষণ করতে পারল না। হার মানতে হয়েছে তাকে। তার মর্যাদায় বড় কঠিন আঘাত পড়েছে।

কিন্তু হার মেনেও হার মানল না সে। সুদর্শনকে জয় করবেই, যেভাবেই হোক! যুদ্ধ জয় করতে হলে, যার যা শক্তি সেইটাই তাকে প্রয়োগ করতে হয়। রাণী সুপর্ণা সুদর্শনকে বন্দী করে রাখতে পারে, কিন্তু বলপ্রয়োগ করে তো আর মন জয় করা যায় না। অন্তরঙ্গ সখীরা বুদ্ধি দিল, মন্ত্র দিয়ে বশ কর, কাম-বাণে বিদ্ধ কর, কামোন্মত্ত বৃষের মত সে তোমার পেছন পেছন ধাবিত হবে।

সখীরা সবাই মিলে অন্তপুর প্রাঙ্গণে সুদর্শনের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটি কুশপুত্তলী রচনা করল। তারপর তারা কতগুলি তীর ধনুক ফলাকা আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত করে তুলল। সেই মন্ত্রপুত তীর আর ধনুক তুলে দিল রাণী সুপর্ণার হাতে।

নগ্নদেহা, আলুলায়িত কেশী সুপর্ণা সর্পিনীর মত গ্রীবা বাঁকিয়ে ধনুকে তীর যোজনা করল। সখীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। সুপর্ণা মন্ত্র পড়ে চলল :

যে-কামনা আমার মনকে চঞ্চল করে তুলেছে, সে কামনা তোমার মনকে অস্থির করে তুলুক। তোমার শয্যা তোমার কাছে অগ্নিশয্যা হয়ে উঠুক। কামের প্রচণ্ড এই তীরে আমি তোমাকে বিদ্ধ করছি, বিদ্ধ করছি। কামের এই তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, তোমার মর্মদেশ বিদ্ধ করে আগুন হয়ে জ্বলবে। সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তুমি ছুটে এসো আমার কাছে, কামনার তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে ছুটে এসো। আর সমস্ত নারীর কথা ভুলে গিয়ে একান্ত ভাবে আমার হও —আমার হও, আমার হও, আমার হও! তুমি আমার পাশে শয়ন কর, আর তোমার নগ্নদেহ দিয়ে, আমার নগ্নদেহকে আবৃত কর।

হে মরুৎগণ, তোমরা তাকে প্রমত্ত করে দাও, প্রমত্ত করে দাও। হে বায়ু, তুমি তাকে প্রমত্ত করে দাও, প্রদত্ত করে দাও। হে অগ্নি, তুমি তাকে প্রমত্ত করে দাও, প্রমত্ত করে দাও। আমার কামনায় সে জ্বলে পুড়ে মরুক।

আমি তোমার কেশমূল থেকে পদনখর পর্যন্ত সর্বাঙ্গে কামের তীব্র যাতনা ঢেলে দিলাম। হে দেবগণ, আমার সহায় হও, তোমরা তার উপর কামাগ্নি বর্ষণ কর। আমার কামনায় সে জ্বলে পুড়ে মরুক।

তুমি যদি এক যোজন দূরে চলে যাও, তুমি যদি পঞ্চযোজন দূরে চলে যাও, তুমি যদি অশ্বের এক দিনের পথ দূরে চলে যাও, তবু আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। আমার এই অমোঘ মন্ত্র তোমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে আমার এই শয্যার পাশে, যেখানে আমার গর্ভে তুমি আমাদের সন্তানের জন্ম দেবে।

সুপর্ণা উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়ে চলল আর সেই কুশপুত্তলীর বুক লক্ষ্য

করে তীর ছুঁড়তে লাগল। পর পর পাঁচটা বাণ মারবার পর সুপর্ণা ক্ষান্ত হোল। শিকারীরা বন্য পশুকে বিদ্ধ করে যেমন উল্লাস ধ্বনি তোলে, সখীরা তেমনি মিলিত কণ্ঠে উল্লাস ধ্বনি তুলল।

তার পর সখীরা সবাই মিলে গান করতে করতে সুপর্ণার গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিল। স্নানান্তে তাকে মনোহর বসন ভূষণে সজ্জিত করল। তার চোখের তলায় এঁকে দিল মায়া কজ্জল, কপালে পরিয়ে দিল মন্ত্রপূত সিঁদুরের ফোঁটা, সুগোল সুঠাম দুই পয়োধরে এঁকে দিল সুগন্ধী চন্দনের পত্রলেখা, আর লাক্ষারসে লাল করে দিল দু'টি পদতল।

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে এল। তখন অন্ধকারের যাদুর আশ্রয় নিয়ে অলি গুঞ্জনের মত নূপুরের মৃদু নিক্কণ তুলে, অঙ্গে সৌরভে বাতাসকে সুরভিত করে দিয়ে রাণী সুপর্ণা তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলল। এই মন্ত্রের যাদু ভেদ করে বেরিয়ে যাবার শক্তি কারু নেই। মন্ত্রের গুণে সুপর্ণাকে ঘিরে রূপের অগ্নিশিখা জ্বলছে। আপনার রূপে সে আপনি মোহিত হয়ে গেল। তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না যে, মুগ্ধ পতঙ্গের মত সুদর্শনকে এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। তখন—তখন কি করবে সে? সুদর্শনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে সে তাকে হাসিমুখে গ্রহণ করবে। সুদর্শন-যে তার সন্তানের পিতা, সে সন্তান একদিন আসবেই।

ঘরে ঢুকে কি দেখল সুপর্ণা? দেখল ঘর খালি, সুদর্শন নেই। নেই, নেই, কোথাও নেই। বুঝতে কিছু বাকী রইল না। মুহূর্তের জন্য পাথরের মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পরক্ষণেই ভেঙে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সখীরা এতক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে গেছে। একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, যেখানেই যাক, যত দূরেই যাক, এই মন্ত্রের টানে ফিরে আসতেই হবে তাকে। না এসে উপায় নেই। সুপর্ণা এ কথায় কোনই সান্ত্বনা পেল না। মানুষ আর মন্ত্রের উপর বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হোল, আর সবই আছে,

শুধু একটা মানুষ নেই, আর তারই জন্য সমস্ত সংসার তার কাছে যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে।

সুদর্শন তখন অন্ধকার পথে এগিয়ে চলেছে। আকাশে অজস্র তারা, সেই তারার আলোয় পথের রেখা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজ রাত্রিতে কোন আশ্রয় মিলবে না। পথে পথেই রাত কাটাতে হবে। একবাব মনে হোল কি মূঢ় সে, কেন এমন সুখ আর সম্ভোগের উপকরণ ছেড়ে চলে এল! পরক্ষণেই আত্মধিক্কার জাগল মনে—ছি, ছি, এ কি কুৎসিত তার চিন্তা! দেবতাদের ধন্যবাদ, তাঁরা তাকে স্ব-গোত্রা-গমনের মহাপাপ থেকে রক্ষা করেছেন।

বিচিত্র এই পৃথিবী। পদে পদে নূতন নূতন দৃশ্য আর নূতন নূতন মানুষ। পিছনে পড়ে রইল কন্দলী আর সুপর্ণা। সামনে আরও কত কি আছে, কে জানে! আর কত দূরে সেই চম্পাবতী? সাত্যকি বলে দিয়েছে এই চম্পাবতীতে না গেলে তার ভ্রমণই নিষ্ফল। কে যেন আছে চম্পাবতীতে? কি যেন তার নাম? অদ্ভুত একটা নাম, মনেই থাকে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে—অম্বশলা।

দশ

এখন এই রাজ্যের নাম চম্পাবতী, কিন্তু তাই বলে চিরদিন তা ছিল না। আগে এর নাম ছিল—আন্দ্রাপান্টি।

আন্দ্রাপান্টি! এ কেমন উদ্ভট এক নাম! আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সুদর্শন, এর মানে আছে কিছু?

অশ্বথলা হেসে বলল, বা রে, উদ্ভট আবার কোথায়? ভারী মিষ্টি নাম তো! এর মানে আছে কি না? মানে আছে বই কি। এর মানে শান্তির দেশ। শুধু শান্তি নয়, সমৃদ্ধিরও দেশ ছিল এক দিন। কিন্তু বিদেশী দস্যুদের আক্রমণে শান্তিও গেল, সমৃদ্ধিও গেল—সব গেল, কিছুই রইল না। রইল শুধু অতীতের বেদনাবহ স্মৃতি। কিন্তু কালনেমির আবর্তনের সাথে সাথে সেই স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে এল।

কিন্তু আন্দ্রাপান্টি তো আর্যভাষা বলে মনে হচ্ছে না।

সে তো নয়ই। এই আন্দ্রাপান্টি নগর যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে কোন্ যুগের কথা, সে কথা কেউ বলতে পারে না। তখন কোথায় ছিল আর্য আর আর্যভাষা! সেই আন্দ্রাপান্টি আকারে বর্তমান চম্পাবতীর দ্বিগুণ ছিল। নগর উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করা ছিল। কর্ষকেরা হাল চাষ করতে এখনও মাঝে মাঝে সেই প্রাচীরের ধ্বংস চিহ্ন খুঁজে পায়। শুধু প্রাচীরের কথাই নয়, চম্পাবতীর সর্বত্র সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। এই-যে রাজপথ দেখছেন এর পাশ দিয়ে প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী চলে গিয়েছে। আমার পিতার মুখে শুনেছি, আন্দ্রাপান্টির লোকেরা নাকি এই পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে নগরের দূষিত পদার্থ ও আবর্জনা থেকে নগরকে মুক্ত রাখত। কিন্তু এখনকার লোকেরা এর যথার্থ ব্যবহার জানে না, তাই এগুলি যত্নের

অভাবে ভেঙেচুরে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। আজকের চম্পাবতীকে দেখে কেউ কি বলতে পারবে যে, এই নগর এক দিন সুরম্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ ছিল ? কিন্তু নগরের যে-কোন জায়গায় মাটি খুঁড়তে গেলেই তার কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

ওই-যে শুকিয়ে যাওয়া প্রণালীটা দেখছেন, ওটা দিয়ে আজকাল আর কোন ঋতুতেই জল চলাচল করে না। কিন্তু আমাদের প্রাচীন লোকেরা বলেন এটা নাকি আগে সকল ঋতুতেই জলে পরিপূর্ণ থাকত। এই প্রণালী নদীর মতই প্রশস্ত ও গভীর ছিল। আর এর তীরে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। নানা দেশের বাণিজ্যতরী এখানে এসে ভিড়ত আর এখানকার বাণিজ্যতরীগুলিও এখান থেকে যাত্রা করে দেশ বিদেশে গিয়ে মালপত্র বিকিকিনি করত।

কি আশ্চর্য সব কথা আপনার মুখে শুনছি। আজ ক'দিন হোল চম্পাবতী নগরে এসেছি। বিদেশী অতিথি বলে কত লোক কৌতূহলী হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এ দেশের কত কথা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ হয়, কিন্তু সেই প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরীর কথা কেউ তো আমার কাছে ঘুর্ণাক্ষরেও প্রকাশ করে নি! আন্দ্রাপান্‌টির নাম আপনার মুখেই আজ প্রথম শুনলাম।

এখানে এইটাই স্বাভাবিক। আপনি নতুন এসেছেন, হঠাৎ বুঝতে পারবেন না। যাদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নিজেরাই জানে না, নয়তো কাউকে জানতে দিতে চায় না।

আমি আপনার কথার সঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারছি না। আপনি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। যারা আন্দ্রাপান্‌টি নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, চম্পাবতীর আর্যেরা কি তাঁদেরই বংশধর ?

তা কেমন করে হবে! আন্দ্রাপান্‌টি নগরের প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা তাঁরা তো আর্য ছিলেন না। সে সময় কোথায় ছিল আর্যজাতি ? পৃথিবীর এই অংশে তাদের নামও তো জানত না কেউ।

এ আপনি কি বলছেন? অনার্য জাতি—যারা জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা কেমন করে এমন সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তুলবে? সারা পৃথিবীতে এই আর্য জাতির মধ্য থেকেই তো জ্ঞানের আলো প্রথম বিচ্ছুরিত হয়ে উঠেছিল। দেবগণের অনুগৃহীত এই আর্যজাতি সেই আলোয় অন্ধকার পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। এ কথা তো আপনি নিশ্চয়ই মানবেন।

অশ্বত্থলা হেসে উঠল। সেই তীক্ষ্ণ হাসির ঘায়ে সুদর্শন মুষড়ে পড়ল। অশ্বত্থলার কথাগুলি তীক্ষ্ণ। তাব চেয়েও তীক্ষ্ণ তার এই হাসি। সে হাসতে হাসতে বলল:

আর্য ঋষিগণ এই মতই প্রচার করে থাকেন বটে। আর এই জন্যই চম্পাবতীর আর্যদের মুখ থেকে আপনি আন্দ্রাপান্‌টির নাম শুনতে পান নি। কিন্তু আপনি তো আগেই বলেছেন, আন্দ্রাপান্‌টি আর্যভাষার শব্দ নয়। এ কথা ঠিকই বলেছেন। তারা যদি আর্যই হবেন তবে তাঁরা নগরী গঠন করে তাঁর এমন নাম দেবেন কেন?

সুদর্শন একটু চিন্তা করে শেষে বলল, তা হলে আপনি বলতে চান তারা অনার্য জাতি?

না, এমন কথা আমি কখনোই বলতে পারব না। অনার্য জাতি বলে কোন জাতি নাই।

ওই মিথ্যা নামটা আপনারাই সৃষ্টি করেছেন, তার পর সেটাকে জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যে-জাতির সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন, তার নাম ছিল বুক্কন।

বুক্কন? এমন নাম তো কোনদিন শুনি নি। কোন শাস্ত্রে তো তাদের নামের উল্লেখ নেই। আচ্ছা থাক সে কথা, আপনি বলুন কেমন করে আন্দ্রাপান্‌টির পতন ঘটল। আর কি হোল সেই বুক্কন জাতির?

শান্তির দেশ শান্তিতেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় ঈশান কোণ থেকে ঝড়ের মত দলে দলে নেমে এল দুরন্ত দস্যুর দল। ক্ষুধিত

বৃকের মত পালের পর পাল ওরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বুক্কনরা কৃষি ও শিল্পজীবী শান্তিপ্রিয় জাতি। আর ওরা লুণ্ঠনজীবী দুর্ধর্ষ জাতি। ওরা বার ব'র আমাদের উপর এসে ভেঙে পডত। আমাদের প্রাচীর ওদের ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু বেশী দিন পারল না। একদিন ওদের একটা দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সেই দিনই পতন হোল' মহানগরীর। তারপর সে কি ধ্বংসের লীলা! ওই দুর্ধর্ষ বর্বরদের হাতে প্রাচীর গেল, আট্টালিকা গেল, নগরীর ধন-সম্পদ গেল—সব গেল। বর্বরেরা গড়তে পারে না কিছু, তাই ভাঙার উৎসাহ ওদের বেশী। প্রাচীর, অট্টালিকা, উদ্যান, স্নানাগার, সব কিছু ভেঙে চুরমার করল ওরা। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করল।

শুধু ধ্বংস করেই ওদের মনের সাধ মিটল না, রক্তের নেশায় মেতে ওরা নগরবাসীদের হত্যা করে চলল। বুক্কনরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য দলে দলে দক্ষিণ দিকে ছুটল। তারা সব কোথায় গেল, সেখানে গিয়ে তাদের গতি কি হোল, এসব কোন খবরই আমরা জানি না। কিন্তু এত হত্যাকাণ্ডের পরেও অল্পসংখ্যক বুক্কন অদৃষ্টের উপর নির্ভব করে এখানেই থেকে গেল।

তারপর কি হোল সেই দস্যুদের?

দস্যুরা এখানেই স্থায়ী হয়ে থেকে গেল। তারা কৃষিও জানত না, যন্ত্রের কাজও জানত না, তারা জানত শুধু পশুচারণ আর লুণ্ঠন। এই দুই বিদ্যা নিয়েই তারা এসেছিল। কিন্তু এখানে দীর্ঘকাল বাস করবার ফলে তাদের বৃত্তি ও স্বভাবের পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এখানকার বুক্কন ও প্রতিবেশী অন্যান্য জাতিগুলির দৃষ্টান্ত দেখে তারাও কৃষি ও যন্ত্রের কাজ অভ্যাস করতে লাগল। এই ভাবে দীর্ঘকাল বসতি করার মধ্য দিয়ে যে-নগরী তারা ধ্বংস করেছিল, ক্রমে বুক্কনদের সাহায্য নিয়ে তাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে লাগল।

সুদর্শন প্রশ্ন করল, কিন্তু চম্পাবতীর আর্যেরা তখন কি করছিল? কোথায় ছিল তারা? কোথা থেকেই বা এল?

বাঃ! এখনও বুঝতে পারেন নি? সেই বর্বর দস্যুদের বংশধররাই তো চম্পাবতীর আর্যেরা।

চমকে উঠল সুদর্শন, এ কি অসম্ভব কথা! সে উত্তেজিত হয়ে এ কথার প্রতিবাদ করে বলল—আর্যেরা বর্বর দস্যুদের বংশধর, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসব কথা আপনি কোথায় পেয়েছেন?

অশ্বত্থলা সুদর্শনকে উত্তেজিত দেখে নিঃশব্দে একটু হাসল। সুদর্শন অশ্বত্থলার এই হাসিটিকে বড় ভয় করে। এই হাসি কথা না বলেও অনেক কথা বলে, আর এমন কথা বলে যে, তার উত্তরে কোন কিছু বলবারও সুযোগ পাওয়া যায় না।

সুদর্শন বুঝল এই হাসিটুকু দিয়েই অশ্বত্থলা তার নিজের উক্তির সমর্থন করছে। সুদর্শনের গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠল। সে ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, আপনি শাস্ত্রবিরোধী কথা বলছেন। দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ, কুরূপ ও অনার্য ভাষাভাষী।

অশ্বত্থলা উত্তর দিল, হ্যাঁ, আর্যদের রচিত শাস্ত্রে এই কথাই আছে বটে। এখানকার আর্যরাও সেই কথাই বলে থাকেন। তাদের শাস্ত্রের বিপরীত কথা যারা বলে, তারা তাদের মুখ চাপা দিয়ে দেন। সেজন্যই আপনি এখানে এসে আন্ত্রাপান্‌টি নগরের নাম শুনতে পান নি। আপনি এদেশে নবাগত, এসব কথা বোঝা আপনার পক্ষে খুবই কঠিন। এ কথা জানবেন, কৃষ্ণবর্ণই হোক, আর গৌরবর্ণই হোক, দস্যু দস্যুই। কিন্তু সেই দস্যুরা যখন এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল, তখন তাদের দস্যু নাম মুছে গেল। এতকাল যাদের স্থিতি ছিল না, তারা এবার স্থিতি লাভ করল, আর প্রতিবেশী অন্যান্য জাতিদের মত কৃষিচর্চা, যন্ত্রচর্চা আর শাস্ত্রচর্চায় মন দিল। নগর ধ্বংসের সেই বর্বর আর বীভৎস কাহিনী চাপা দিয়ে তারা নূতন এক পুরাণের সৃষ্টি করল। সেই পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, আর্যেরা অনাদিকাল ধরে এইখানে বসবাস করে আসছে।

ব্রাহ্মণ আর গায়করা আর্যজাতির কল্পিত গৌরব কাহিনী রচনা

করে সেই পুরাণ সৃষ্টি করে তুলেছেন। আধুনিক আর্যদের মধ্যে অনেকেই সেই পুরাণে বর্ণিত কাহিনীকেই অবিসংবাদিত সত্য বলে মনে করেন। বিদেশী পর্যটকেরা এলে সেই সব কাহিনী তাঁরা তাদের শোনান আর অজ্ঞ বুরুনদের সেই কথাই তাঁরা বোঝান। বিচিত্র এই পৃথিবীর খেলা! বাহুবল সত্যকে চাপা দিয়ে দেয়, আর মিথ্যা সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কাহিনীর ধারা সুদর্শনের মনকে টেনে নিয়ে চলেছিল, কৌতূহলের কাছে উত্তেজনা হার মানল। সে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, আর সেই বুরুনরা?

বুরুনরা? নগরের প্রান্তদেশে জীর্ণ কুটিরের আশ্রয়ে আজ তারা দীন হীন জীবন যাপন করছে। এক দিন যারা এই রাজ্যের প্রভু ছিল, আজ তারা দাস। সুসভ্য আর্যদের দৃষ্টিতে আজ তারা বর্বর। মিথ্যা নয়, আজ তারা সত্যসত্যই বর্বরের দশায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু কে তাদের বর্বরে পরিণত করেছে?

বুরুনরা দেখতে কেমন? সুদর্শন প্রশ্ন করল।

কৌতুকের চাপা হাসি দেখা দিল অশ্বত্থলার মুখে। বুরুনরা কেমন, দেখতে চান? আমি আপনার এই ইচ্ছা পূর্ণ করছি। এই-যে আমি আপনার সামনে বসে আছি, আমার মুখের দিকে তাকান। বুরুনরা অবিকল এই রকম। কেমন মনে হচ্ছে?

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুদর্শন অশ্বত্থলার মুখের দিকে তাকাল। এতক্ষণ সে ভাল করে লক্ষ করে দেখে নি। মনে হয়েছিল মেয়েটি লাবণ্য বর্জিত অতি সাধারণ একখানি মুখ। যৌবন তার নির্ধারিত সময় মত এসেছে. কিন্তু এ মেয়ে সে সম্পর্কে উদাসীন। সে যেন পরম অবহেলার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছে এবং পরক্ষণেই তার কথা বিস্মৃত হয়ে কঠিন শাস্ত্র-চর্চার মধ্যে ডুবে গিয়েছে। রূপের প্রভা নেই, যৌবনের উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু তবু কি অপূর্ব প্রতিভার আলোকে প্রদীপ্ত প্রতিভার আলোকে প্রদীপ্ত সেই মুখ! জীবনে কত মেয়ে দেখেছে

সুদর্শন, কিন্তু এমন একখানি মুখ সে কোনদিন দেখে নি। অশোভনতার কথা ভুলে গিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দেখলেন তো?

অশ্বত্থলার কথায় যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু চোখের ঘোর তখনও কাটে নি। বিহ্বল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, আপনি বুক্কন—অনার্য বুক্কন?

হ্যাঁ, আমি অনার্য বুক্কন।

আপনার এত নাম, এত খ্যাতি!

তাই না কি? কিন্তু তবু আমি বুক্কন—অনার্য বুক্কন।

লোকে বলে আপনি না কি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শিনী?

লোকে তাই বলে নাকি? হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে কিছু কিছু চর্চা করেছি বটে।

অনার্যা হয়েও আপনি বেদ অধ্যয়ন করতে গেলেন কেন? বুক্কুনদের নিজেদের ধর্ম-কর্ম নেই?

সে অনেক কথা। যদি শুনতে চান এখন নয় পরে বলব। কিন্তু আপনি আমার সম্পর্কে এসব কথা কেমন করে জানলেন?

আমি আমার স্বদেশ গোকর্ণ প্রদেশে বসে আপনার খ্যাতির কথা শুনেছি।

সে কি! কেমন করে? কার মুখে?

আমার বন্ধু সাত্যকি আপনার সঙ্গে পরিচিত। তার মুখে আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। আর সেজন্যই আমি উৎসুক হয়ে আপনাকে দেখতে আর আপনার কথা শুনতে এই চম্পাবতী নগরে এসেছিলাম। আমার এখানে আসবার আর কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি আপনাকে বৃদ্ধা সাধিকা বলে মনে করেছিলাম।

এবার মোহ ভঙ্গ হয়েছে তো? হেসে উঠল অশ্বত্থলা। তারপর

বলল, হ্যাঁ, আপনার বন্ধু সাত্যকিকে আমার ভাল করেই মনে আছে। তিনি পরম জ্ঞানী। আমার শ্রদ্ধার পাত্র। এখানে তিনি আমার অতিথি হয়েই ছিলেন। আপনি তাঁর বন্ধু, আমাকে দেখতে এসেছেন, আমার বহু ভাগ্যের কথা। কিন্তু কই, ক'দিন হয়ে গেল আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, আপনি তো একবারও আমাকে সে কথা বলেন নি তো। আর যদি আমার জন্যই এসে থাকেন, তবে আমার গৃহে না এসে অন্যত্র আছেন কেন? আমি আহ্বান করছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করুন।

আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল সুদর্শনের মন। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? এই অনূঢ়া যুবতী নারী একা এই গৃহে বাস করে। তার মত যুবকের পক্ষে এখানে রাত্রি যাপন করা নিতান্তই অশোভন। লোকে কি বলবে!

না না, তা কি হয়! দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে আপত্তি জানাল সে।

কেন হয় না? প্রশ্ন করল অম্বশলা।

কারণটা বলতে তার মুখে বেধে গেল। সে মাথা নত করে নিরুত্তর হয়ে রইল।

অম্বশলা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ছবিটা দেখতে চেষ্টা করছিল। তার ঠোঁটের কোণে একটি বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ও, সঙ্কোচ হচ্ছে বুঝি? কেন, আপনি যেমন ভেবেছিলেন, আমি তেমন বয়োবৃদ্ধা নই, এইখানেই কি আপনার আপত্তি? কই, আমার মনে তো কোন ভয় বা সঙ্কোচ নেই।

আপনি কি লোকচক্ষুকেও ভয় করেন না? এটা কি দৃষ্টিকটু হবে না?

না, ওসব কিছুই হবে না। লোকে আমাকে চেনে। আমার গৃহে বিদেশী অতিথিরা মাঝে মাঝেই দয়া করে আমার আতিথ্য

গ্রহণ করেন। দেখে দেখে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কেউ কিছু মনে করবে না।

সুদর্শন মৌনী হয়ে রইল। এই মৌনতা সম্মতির লক্ষণ।

আতিথ্য গ্রহণের পরের দিন অশ্বথলা আর সুদর্শন বসে কথা বলছিল।

সুদর্শন প্রশ্ন করল, তার পর?

অশ্বথলা বলল, ছোটবেলা থেকেই আমার পিতা ছিলেন এই রকমের মানুষ। সংসারের কোন কাজেই তাঁর মন বসত না। ধর্মের বিচিত্র পথ আর বিচিত্র মত তাঁর মনকে আকৃষ্ট করত। যেটা জানা যত বেশী কঠিন, সেইটার পেছনেই তিনি তত বেশী ঘুরে মরতেন। যখন তাঁর বয়স পনেরো কি ষোল, তিনি এখানকার এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে গিয়ে ধরে বসলেন, আমি আপনার কাছে বেদ অধ্যয়ন করব।

ব্রাহ্মণ বললেন, সে কি রে, বেদ পড়বি কি? অনার্যের পক্ষে বেদ পাঠ-যে নিষিদ্ধ।

পিতা প্রশ্ন করলেন, কেন?

ব্রাহ্মণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, অনার্যেরা আর্য নয়, তাই।

পিতা বললেন, এটা কোন কথাই নয়।

ব্রাহ্মণ বললেন, এইটাই একমাত্র কথা। এ ছাড়া আর কোন কথা নেই, ভাগ!

কি আর করবেন পিতা, ভেগে এলেন তাঁর কাছ থেকে।

তার পর বছর দুই কাটল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, পিতা উধাও। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, কোথাও তাঁকে খোঁজ করে পাওয়া গেল না। বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, কিন্তু কোন সন্ধান নেই। বাড়ির লোকেরা তাঁর আশা ছেড়ে দিল। সবাই বলল,

এ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই মরে গেছে। বেঁচে থাকলে কি একবার দেখা দিত না!

পাঁচ-ছয় বছর বাদে সবাই যখন সমস্ত আশা-ভরসা প্রায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, এমন সময় পিতা হঠাৎ এক দিন এসে হাজির হলেন। খবর পেয়ে সমাজের লোকেরা দল বেঁধে দেখতে এল। সবাই জিজ্ঞাসা করল, কি রে, কোথায় ছিলি এতদিন? পিতার মুখে একটি মাত্র কথা—দেশ ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম।

ভ্রমণ করতে গিয়েছিলি তো বলে গেলি না কেন? এতগুলি বছর দেশ থেকে বাইরে, এ আবার কেমন ভ্রমণ? কোথায় ছিলি, কি করলি এতকাল? কত লোকের কত রকম প্রশ্ন। কিন্তু পিতা ঐ এক কথার বেশী দু' কথা বললেন না।

পরে আমি পিতার মুখে শুনেছি, বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাছে ছাত্র বলে গ্রহণ করতে না চায়, সেজন্য আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গুরুরা বলেছেন, তোমার গায়ের বর্ণ এমন কেন? তুমি তো আর্য নও। সবাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষপর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে উপনীত হলেন এক গুরুর গৃহে। কোন কথা না বলে দুই পা জড়িয়ে ধরলেন তাঁর। কোমলপ্রাণ গুরু বিচলিত হয়ে বললেন, কি চাও বৎস! কি তোমার অভিরুচি?

আমাকে বিদ্যা দিন।

কোন্ বিদ্যা চাও তুমি?

আমি চাই পরমা বিদ্যা। আমি ভূমাকে চাই। স্বল্পে আমার সুখ নেই।

চমকে উঠলেন গুরু। তিনি বললেন, বৎস, তোমার বর্ণে প্রকাশ, তুমি আর্য সন্তান নও। আমি তো তোমাকে সেই বিদ্যা দান করতে পারি না।

পিতা নিষ্কম্পা কণ্ঠে বললেন, গুরুদেব, আপনি ভুল করছেন, আমি ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় পিতা আর অনার্যা মাতার সন্তান। পিতৃ পরিচয়ে আমি আর্য—বেদাধ্যয়নের অধিকারী।

সুদর্শন প্রশ্ন করল, এ কথা কি সত্য?

না, সত্য নয়, বাবা গুরুকে মিথ্যা বাক্যে প্রবঞ্চিত করলেন। আর সেইদিনই গুরু প্রসন্ন হাস্যে তাঁকে শিষ্য বলে সম্ভাষণ জানালেন। অদ্ভুত মেধাশক্তি ছিল আমার পিতার। গুরুকে বিস্মিত করে দিয়ে জ্ঞানের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন, অন্যান্য শিষ্যেরা বহু পেছনে পড়ে রইল।

সহপাঠীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। বিদ্যার ক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানি কাটাবার জন্য তারা আমার বাবাকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করত। গুরুর অনুপস্থিতিতে তারা তাঁকে অনার্য কুক্কুর বলে সম্বোধন করত। অধ্যয়নের সময় তাদের কাছে বসতে দিত না। গুরু অনেক কিছুই লক্ষ করতেন, কিন্তু শিষ্যদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে একান্তে ডেকে সান্ত্বনা দিতেন, উপদেশ দিতেন। পিতা আর সব কিছু ভুলে গিয়ে তাঁর জ্ঞানসাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, এ-সমস্ত তাঁকে যেন স্পর্শও করতে পারত না।

সুদর্শনের মনে পড়ে গেল সাত্যকির কথা। গোকর্ণ প্রদেশের গুরুগৃহের কথা এখনও সে ভুলে যেতে পারে নি। অনার্যেরা কি সর্বত্রই আর্যদের কাছ থেকে এই ব্যবহারই পেয়ে থাকে? কেন এমন হয়?

এই ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। আমার পিতা উত্তরোত্তর উন্নতি করে চললেন। শিষ্যের প্রশংসা গুরুর মুখে আর ধরে না। তিনি রাজসভায় সকলের সামনেই ঘোষণা করতেন যে, এতদিনে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর শূন্য স্থান অধিকার করার মত লোক তৈরি হয়ে উঠছে। গুরুর মুখের এই অপরিমিত

প্রশংসা শিষ্যের পক্ষে কাল হয়ে উঠল। মন্ত্রীপুত্র পিতার সহপাঠী। সে আমার পিতার বিরুদ্ধে মন্ত্রীর মন বিষিয়ে তুলতে লাগল। কয়েক জন সভাসদও সেই সঙ্গে যোগ দিল। ফলে ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। তারা বলাবলি করতে শুরু করে দিল, আমার পিতা আর্য বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃত পক্ষে অনার্য। গুরুর চক্ষে ধুলো দিয়ে সে এই জঘন্য অনাচার সাধন করে চলেছে। কিন্তু গুরুর মুখের সামনে এ কথা বলবার মত সাহস কারু ছিল না। তারা গোপনে পিতাকে হত্যা করবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করতে লাগল।

পিতা এসব ব্যাপারে কোন খবরই রাখতেন না। কিন্তু কেমন করে গুরুর কানে এই খবরটা এসে পৌছল। অস্থির হয়ে উঠলেন গুরু। সন্তানের চেয়েও প্রিয় তাঁর এই শিষ্য, গুপ্তঘাতকদের হাত থেকে তাঁকে তিনি কেমন করে বাঁচাবেন? আর কোন উপায় না দেখে একদিন তিনি তাঁর কাছে সব কথা খুলে বললেন। আর বললেন, তুমি এই মুহূর্তে এই দেশ ছেড়ে পালাও! আমার সন্তান হত্যা আমি চোখের সামনে দেখতে পারব না।

বিদায়-কালে প্রণাম করতে গিয়ে শিষ্য গুরুর পায়ের উপর ভেঙে পড়ল। তাঁর দু'পায়ের উপর মাথা রেখে বলল, গুরুদেব, আপনার মত গুরুকে আমি প্রতারিত করেছি, যাবার সময় এ কথাটা যদি বলে না যাই, তবে চিরজীবন আমাকে বিবেকের দংশনে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে। আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি না। আমার এই প্রতারণার জন্য অভিশম্পাত দিতে হয় দিন, আমি মাথা পেতে নেব।

গুরু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, এসব কি কথা বলছ তুমি! তোমার মত শিষ্য আমি জীবনে কখনও পাই নি। তুমি আমাকে প্রতারিত করতে পার এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। কি হয়েছে তুমি খুলে বল।

পিতা স্থির কণ্ঠে বললেন, ওরা আমার সম্বন্ধে যা প্রচার করছে,

তা মিথ্যা নয়, আমি সত্য-সত্যই অনার্য। আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান বলে নিজের যে-পরিচয় দান করেছিলাম তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ কাহিনী বলতে বলতে পিতা আমাকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আমার এই কথা শোনামাত্রই গুরুদেব ক্রোধে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু কই, ক্রোধের সামান্য চিহ্নটুকুও ফুটে উঠল না। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর কি দেখলাম জান? দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখ যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল! তিনি বৃদ্ধ হলেও স্বাস্থ্যবান, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি যেন স্থবির হয়ে পড়লেন। দেখলাম তাঁর হাত-পা কাঁপছে। ঘরের দেওয়ালটার উপর ভর করে তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপর বসে পড়লেন। তার পর দুই হাতে মুখ ঢেকে তিনি আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—তুমি! তুমি! তুমি! তুমি এই কাজ করলে!

আমি তাঁকে মাটি থেকে তুলে বসাতে গেলাম না। আমি আমার জায়গায় যেন অচল হয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। শেষে আমিই প্রথম কথা বললাম। বললাম, এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বলবার আছে, যদি শোনেন তো বলি।

তিনি উত্তর দিলেন, বল, আমি শুনছি।

আমি প্রশ্ন করলাম, ঘরে যদি অপর্যাপ্ত খাদ্য থাকে, আর পিতা যদি তাঁর তিন সন্তানের ভিতরে দু'জনকে সাধ পূর্ণ করে খাওয়ান আর বাকী সন্তানটিকে আহার থেকে বঞ্চিত রাখেন, সেই হতভাগ্য সন্তান তখন কি করবে?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, খেতে চাইবে, কাঁদবে।

পিতা যদি তাতেও কর্ণপাত না করেন, তখন সেই ক্ষুধার্ত শিশু যদি পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে খাদ্য অপহরণ করে আপনার ক্ষুধা মেটায়, সেটা কি তার পক্ষে অপরাধের কাজ হবে?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, না।

আমি প্রশ্ন করলাম, সুপুত্র আর কুপুত্র, সুরূপ আর কুরূপ, গৌর ও কৃষ্ণ ভেদে ক্ষুধার কি তারতম্য থাকে ?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, না।

আমি প্রশ্ন করলাম, দৈহিক ক্ষুধা আর জ্ঞানের ক্ষুধা, এদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবলতর ?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দৈহিক ক্ষুধা প্রবলতর আর জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানের ক্ষুধা।

তখন আমি বললাম, এবার তবে বলুন, আমার অপরাধটা কোথায়? আপনারা আচার্যগণ শিক্ষার্থীদেব পিতৃস্বরূপ। আমি ক্ষুধার্ত শিশু পিতৃস্বরূপ সেই আচার্যদের কাছে গিয়ে জ্ঞানের খাদ্যের জন্য কাঁদলাম। তাঁরা তাঁদের অন্যান্য শিশুদের সাধ পূর্ণ করে খাওয়াচ্ছিলেন, কিন্তু আমি যেতেই খাদ্যের ভাণ্ডার বন্ধ করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের অনেকের কাছেই গেলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে কুপুত্র বলে, কুরূপ বলে, কৃষ্ণ বলে প্রত্যাখ্যান কবলেন। তখন কি করব আমি ? আমি কি করতে পারি ? ক্ষুধায় ব্যাকুল যে-মানুষ, তার কি হিতাহিত জ্ঞান থাকে ? তখন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে প্রতারিত করে আমার খাদ্য সংগ্রহ করেছি। এজন্য আমি কি অপরাধী ? আর যদি অপরাধ থেকেও থাকে, তবে অধিকতর অপরাধী কে—যাঁরা আমাকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন তাঁরা, না আমি ? গুরুদেব আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসু, আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

গুরুদেব গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন, আর্য-অনার্যের প্রসঙ্গ তুলে কোন কথা বললেন না। সময় কেটে যেতে লাগল, তিনি যেমন নিঃশব্দ হয়ে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, গুরুদেব, আমি কি কোন অসঙ্গত প্রশ্ন করেছি ? এবার তিনি মুখ তুললেন। মুখ তুলে বললেন, না, তুমি কোন অসঙ্গত প্রশ্ন কর নি। কিন্তু পুত্র, আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যখন এই প্রতারক আপনার নিকট থেকে বহু দূরে চলে যাবে, তখন আপনি তার সম্পর্কে কি ভাবে বিচার করবেন? তিনি আমার কথার উত্তরে বললেন, দেবতাদের লীলা দুর্জ্ঞেয়। তাঁরা তোমার এই অপরাধের বিচার কি ভাবে করবেন, আমি জানি না। কিন্তু আমার আশীর্বাদ নিত্য দিন তোমাকে ঘিরে থাকবে।

গুরুদেবের এই কথা শুনে আমার মনের সমস্ত ভার নিমেষে লঘু হয়ে গেল। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না, উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের কাছে ভেঙে পড়লাম, আর তিনি আমাকে তাঁর কোলের উপর টেনে নিলেন।

সুদর্শন আবিষ্ট চিত্তে শুনছিল। অশ্বত্থলা কাহিনীর একটু বিরতি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমার বর্ণনার অতি-বিস্তারে আপনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছেন না তো? আমার পিতার কথা উঠলে আমি মাত্রা-জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সুদর্শন বলল, না, না, আপনার এই কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। সাত্যকি আর আপনার মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে। আপনাদের দু'জনের কথা আমার মনের মধ্যে প্রবলভাবে ঘা মারে, ফলে বহু প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয় অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আপনাদের কোন কোন কথা আমি মানি, কিন্তু অনেক কথাই আমি মানতে পারি না। তবু তা আমার মনকে আকৃষ্ট করে। সাত্যকি একদিন আমাকে কূপমণ্ডুক বলে বিদ্রূপ করেছিল। বলেছিল, শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে চেনা যায় না, চিনতে হলে নিজের চোখে তাকে প্রত্যক্ষ কর। সত্য কথা বলতে কি, সাত্যকিই আমাকে এই ভ্রমণের প্রেরণা দিয়েছে। স্বদেশ থেকে বাইরে এসে এতদিন কি কূপমণ্ডুক হয়েছিলাম সে কথাটা আজ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনার পিতার কাহিনী কি এখানেই শেষ হয়ে গেল?

না না, এ তো সূচনা মাত্র, মূল অংশ এখনও বলাই হয় নি। এর

পর পিতা বিবাহ করলেন, আমার জন্ম হোল। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, সেজন্যই আমি তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ সাথী হয়ে দাঁড়ালাম। শৈশব থেকেই তিনি আমাকে বিদ্যা দান করতে শুরু করলেন, যে-বিদ্যা তিনি এত কষ্ট, উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে, এমন কি জীবন-সঙ্কট করেও আহরণ করেছিলেন। আমি কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার অনার্য পিতার এবং তাঁর অনার্যা কন্যার এই নিষিদ্ধ জ্ঞান-চর্চা অতি সংগোপনে গৃহের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হোত, বাইরের কোন লোক এ খবর জানত না।

আপনার মা, তাঁর কথাও একটু বলুন।

আমার মা? বাবা কোনদিনই আমার মা'র কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সমর্থন বা সহযোগিতা পান নি। আপনার কুলধর্ম বিসর্জন দিয়ে পরধর্মে আশ্রয় নেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু কোনদিন স্বামীর কাছে এ নিয়ে কোন কথাই তুলতেন না। তা হলেও, তাঁর মনোভাবটা প্রচ্ছন্ন ছিল না। আমার পিতা তা বেশ ভাল করেই জানতেন, আর আমি বয়সে ছোট হলেও বুঝতে পারতাম। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু তাঁদের দু'জনের মাঝখানে আমি ছিলাম সেতুস্বরূপ। তাঁদের দু'জনের অপূর্ণ কামনা আর অখণ্ড ভালবাসা আমাকে ঘিরে থাকত। পিতার কাছে আমি বেদ-চর্চা করতাম আর মায়ের কাছ থেকে কুলধর্মের শিক্ষা নিতাম। আমার গ্রহণশীল মন দু' দিকেই সমানভাবে আকৃষ্ট হোত। বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ আর বিচার করবার শক্তি তখনও আমার হয় নি।

ক্রমে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে উঠলাম। মা বললেন, ওর বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পিতা তার প্রতিবাদ করলেন, না, ওর বিবাহ হবে না। ও আজীবন ব্রহ্মচারিণী হয়ে শাস্ত্র-চর্চা করবে। কথায় কথায় তর্ক বেধে গেল। আমি কোনদিন দু'জনকে এভাবে কলহ করতে দেখি নি। মা বলছিলেন, মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে,

সন্তানের ভাল-মন্দ স্থির করবার অধিকার একমাত্র মায়েরই আছে। তার উত্তরে পিতা বললেন, না, মা ক্ষেত্রমাত্র, পিতা জন্মদাতা। সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে পিতাই একমাত্র অধিকারী। এই ভাবে আমাকে কেন্দ্র করে পিতা ও মা'র মধ্যে মনোমালিন্য বেড়েই চলল। শেষে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের সংসারের বাতাস যেন চলাচল শক্তি হারিয়ে থম থম করতে লাগল

আমি মনে মনে ভাবলাম, এক দিকে মা, আর দিকে পিতা, আমি কোন্ পক্ষে? আমাকে নিয়েই সমস্যা, এ সম্বন্ধে আমার নিজের মত কি? কিন্তু নিজের মনের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি আমার মা আর পিতা দু'জনে তাকে দু'দিক থেকে টানছেন। আমার মন কখনও সংসারেব মধুতে ডুবে যেতে চায়, কখনও বা সংসারের আবিলতা থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিতে চায়। নিজের ভিতরকার এই দ্বন্দ্ব আর সংসারের এই থমথমে বাতাস আমাকে অস্থির করে তুলল। বৈদিক দেবতাদের আব আমাদের বুরুন জাতির দেবীদেব কাছে প্রার্থনা জানালাম: যে-করেই হোক, এই সঙ্কট ভেঙে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসো, এ অবস্থা আমি আর সহ্য কবতে পারছি না।

আমার এই প্রার্থনার ফলেই হোক বা যে-কোন কারণেই হোক, পরিবর্তন একটা এল। অভাবিত এক পরিবর্তন। আমরা কেউ তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

পিতা তাঁর ধর্মীয় মতামত নিয়ে বাইরের কারু সঙ্গে কখনোই আলাপ-আলোচনা করতেন না। তাঁর জীবনের এই প্রধান দিকটাই লোকচক্ষের অন্তরালে ছিল। তাঁর এক আর্য-বন্ধু ছিল। খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও এই গোপন কথাটা তাঁর জানা ছিল না। একদিন কি একটা কথা নিয়ে শুরু, সেই আলোচনা চলতে চলতে কেমন করে ধর্মীয় খাতে প্রবাহিত হয়ে গেল। তাঁরা

নিজেরাও তা লক্ষ করেন নি। পিতা তাঁর নিজের প্রতিপাদ্য সুপ্রমাণ করতে গিয়ে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করলেন :

কেমন করে, কোথা থেকে এই সৃষ্টির উদ্ভব, কে সে কথা নিশ্চিত করে জানতে পারে, কে সে কথা প্রকাশ করে বলতে পারে? এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্য দিয়েই দেবগণের সৃষ্টি, তবে এই রহস্য জানতে পারে, এমন কে আছে?

কোথা থেকে এল এই ব্রহ্মাণ্ড? কেউ কি তাকে রচনা করেছে, না তা স্বয়ম্ভু? ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে বসে যে-সত্তা সমস্ত কিছু অবলোকন করছেন, হয়তো একমাত্র তিনিই এ কথা জানেন। কি জানি, হয়তো বা এ কথা তাঁরও অজ্ঞাত।

তাঁকে কেউ বলে ইন্দ্র, কেউ মিত্র, কেউ বরুণ, কেউ অগ্নি, কেউ বা তাঁকে স্বর্গীয় বিহঙ্গ গরুত্মৎ বলে। যিনি এক এবং অনন্য, জ্ঞানীরা তাঁকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত করে।

বন্ধু এই মন্ত্র শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, কোথায় আছে এই মন্ত্র আমাকে বল। পিতা সেই মন্ত্রের স্থান নির্দেশ করে বুঝিয়ে বললেন। যেখানে যা-কিছু ঘটে পিতা সব কিছুই এসে আমার কাছে বলতেন। এই ঘটনাটাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা সামান্য হলেও এর যে কি ভীষণ পরিণাম হতে পারে, সে কথা তিনিও ভাবতে পারেন নি, আমিও না।

কেন, এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে কি বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে গেল? প্রশ্ন করল সুদর্শন।

না না, তা নয়, যা ভাবছেন তা নয়। পিতার বন্ধু পিতার এই বৈদিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। একজন অনার্যের কাছ থেকে এমন কে-ই বা আশা করতে পারে! তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে সবার কাছে তাঁর বন্ধুর গুণগান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর সেটাই পিতার পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়াল।

কেন? কেন?

বেদজ্ঞদের সমাজে আলোড়ন পড়ে গেল, কেমন তার স্পর্ধা-যে অনার্য হয়েও বেদপাঠ করে আর বৈদিক পদ্ধতিতে ধর্মানুষ্ঠান করে! তারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে এই অভিযোগ উপস্থিত করল, আর বলল, আপনি রাজা, আপনি সমাজের রক্ষক, আপনি এর প্রতিবিধান করুন।

রাজা বয়সে তরুণ। শুনেছি, তিনি নাকি বলেছিলেন, তিনি অনার্য হয়েও সত্য ধর্মের সন্ধান পেয়েছেন, সে তো আনন্দের কথা। সেজন্য আপনারা তাঁর উপর দণ্ড বিধান করতে চাইছেন কেন?

তারা বললে, এ আপনি কি কথা বলছেন? আপনি কি শাস্ত্রের বিধান অবগত নন? অনার্যের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। যে-সমাজে অনার্যের অশুচি জিহ্বায় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই সমাজের উপরে দেবতাদের অভিশম্পাত নেমে আসে।

শাস্ত্রজ্ঞদের প্রবল চাপে রাজাকে নত হতে হোল। তিনি রাজ-পুরুষেব মাধ্যমে পিতাকে সতর্ক করে পাঠালেন. তিনি যেন অবিলম্বে এই শাস্ত্র-বিরোধী কর্ম থেকে বিরত হন। নতুবা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের অপরাধে তাঁকে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হবে।

আমরা কিন্তু এর কোনকিছুই জানতে পারলাম না। পিতা কথাটাকে একেবারেই চেপে গেলেন। কিন্তু তাঁর বেদপাঠ ও নিত্য-কর্মে নিষ্ঠা যেন আরও বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে তিনি অগ্নিদেবতার সম্মুখে বহুক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, ডাকলেও সাড়া দিতে চাইতেন না। তাঁর এই পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিলাম, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারতাম না। মা তখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন না। আমার কেমন যেন ভয় হোত, পিতা কি তবে আমাদের ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছেন?

ব্রাহ্মণেরা কিন্তু রাজার এই সতর্কীকরণে মোটেও খুশি হয় নি। তারা আশা করছিল পিতার উপর খুবই কঠোর দণ্ড বিধান করা হবে। শাস্ত্রেও নাকি সেরকমই বিধি আছে। এবার তারা

গুপ্তচর লাগিয়ে পিতা কি করেন না করেন, তার সন্ধান নিতে থাকল। কোন কথাই তাদের অজানা রইল না। তারা আরও জানল, আমাদের গৃহে অগ্নিদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। শুনে ওরা ক্ষেপে উঠল, বলল, কি স্পর্ধা, আমাদের অগ্নিদেবতাকে ওরা ওদের সংস্পর্শে অশুচি করছে!

কিন্তু এবার আর ওরা অভিযোগ জানাবার জন্য রাজার কাছে গেল না। এ বিষয়ে রাজার উপর ওরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। ওরা নগরবাসী আর্যদের নানাভাবে উস্‌কে তুলতে লাগল। সেবার প্রচণ্ড শিলা বর্ষণে শস্যের প্রচুর ক্ষতি হোল। ওরা প্রচার করল, ওই অনাচারী অনার্যই এজন্য দায়ী। দস্যুরা এসে গাভী হরণ করে নিয়ে গেল। ওরা বলল, এই তো সবে শুরু, দেখ না আরও কত হবে। এক ব্রাহ্মণের শিশুপুত্র সর্পদংশনে মারা গেল। ওরা বলল, এসব-যে ঘটবে, এ তো আমরা আগেই বলেছি। এসব কথা শুনে লোকে ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল। তারপর ব্রাহ্মণদের ইঙ্গিতে ওরা একদিন অস্ত্র হাতে নিয়ে মার মার করে পিতার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল সামনে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিদেবতা বিরাজ করছেন। আর তাঁর পেছনে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন তপস্বী। এত কোলাহলের মধ্যেও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় নি। খড়্গধারী যে-লোকটি সামনে ছিল, সে ভয় পেয়ে পেছিয়ে এল। ব্রাহ্মণেরা পেছন থেকে এসে জলের ছিঁটায় আগুন নিভিয়ে দিয়ে বলল, এই মুহূর্তে ওর মুণ্ডপাত কর। খড়্গধারী বলল, এ-যে তপস্বী, একে কেমন করে মারব?

তপস্বী নয়, তপস্বী নয়, এ মায়াবী দানব। ধ্যান ভঙ্গ হলে তখনই স্বমূর্তি ধারণ করবে। তোমরা কি জান না, এই মায়াবী সাপের মূর্তি ধরে ওই ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রকে দংশন করেছে?

খড়্গধারী বলল, না, আমি পারব না। আমার ভয় করছে।

এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে একটা উন্মাদের মত লোক ছুটে

এসে ওর হাত থেকে খড়্গটা কেড়ে নিয়ে বলল, আমার ভয় নেই। আমিই আমার পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ নেব। বলতে বলতেই সে সেই খড়্গ তুলে আমার পিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার মা আর আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম, সেই শাণিত খড়্গের আঘাতে বাবার মাথাটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর রক্ত—রক্ত—রক্ত!

উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল সুদর্শন। সে আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, হত্যা করল!

হ্যাঁ, হত্যা করল। আমরা অনুনয় করলাম, কাঁদলাম, আর কি করতে পারি! কিন্তু সেই কোলাহলের মাঝখানে আমাদের কান্না চাপা পড়ে গেল।

শুধু এই কারণেই ওরা তাঁকে হত্যা করল? আবার সেই প্রশ্ন করল সুদর্শন।

হ্যাঁ। শাস্ত্রে নাকি এই অপরাধে এই দণ্ডেরই বিধান রয়েছে।

এরপর মা আর মাসখানেক মাত্র বেঁচে ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল। তিনি কারু সঙ্গেই কোন কথা বলতেন না, আমাদের সঙ্গেও না। চুপ করে বসে থাকতেন, আর গভীরভাবে কি যেন ভাবতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ চিৎকার করে উঠতেন। সে সময় আতঙ্কে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠত। তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপত। আমার মনে হোত, কল্পনার দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যটাই যেন দেখছেন। পিতার জন্য আমার কান্নার সময় ছিল না, মাকে নিয়েই সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হোত। একদিন মা-ও আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলেন। আমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তিনি কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। এভাবে আমার বাবা আর মা, দু'জনেই আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমি একাই রইলাম। সেই থেকে একাই আছি।

অশ্বত্থলা আর সুদর্শন দু'জনেই কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুদর্শন প্রথম কথা বলল, কি আশ্চর্য, এসব কথা এখানে কেউ তো কোনদিন আমাকে বলে নি।

এটা কি একটা বলবার মত কথা? এ তো অসংখ্য ঘটনার একটা ঘটনা মাত্র। শত শত বছরের ধারাবাহিক অত্যাচার আর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এই হতভাগ্য বুরুন জাতি মৃত্যুপথে এগিয়ে চলেছে। তার কোন্ কথাটাই বা আপনি জানেন! শুধু আপনার কথাই বলছি না, কে-ই বা জানে! কে-ই বা এত কথা মনে করে রাখতে পারে!

তার পর?

তার পর কি?

তারপর আপনার কথা বলুন। সেই নিঃসঙ্গ রিক্ত জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনি কি করলেন, আপনি কোন্ পথ বেছে নিলেন?

সে কথা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না।

এ পর্যন্ত যা বলেছেন সেটাই কি খুব ভাল লাগবার মত কথা! কিন্তু তবু আমাকে শুনতেই হবে। আপনি বলুন।

ঠিক বলেছেন। অপ্রিয়কে এড়িয়ে যেতে চাইলেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সে এদিক থেকে, ওদিক থেকে, পেছন দিক থেকে এসে চড়াও করে। তারচেয়ে মুখোমুখী দেখা হওয়াটাই বরঞ্চ ভাল। তা হলে শুনুন, আমার কথাই বলছি। এ ক্ষেত্রে যেমন হওয়াটা স্বাভাবিক, তা কিন্তু হয় নি। আমি মোটেও ভেঙে পড়ি নি। আমার নবম মন এই কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য রকম দৃঢ় হয়ে উঠল। সেই সঙ্কটের সময় আর্যজাতির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ আমাকে এই শক্তি যোগাল। আমি নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের কাছে নিজে ঘোষণা করলাম, আমার পিতা বিভ্রান্ত হয়ে আপনাকে বিপথে পরিচালিত করেছিলেন। যে-ধর্ম অপর জাতীয় মানুষকে এত হীন দৃষ্টিতে দেখে, তার মধ্যে কোন সত্যবস্তু থাকতে পারে না।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এখনও সেই বিশ্বাসে দৃঢ় আছেন ?

অশ্বত্থলা বললেন, আপনার কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছে আমার এ কথায় আপনি একটু আঘাত পেয়েছেন। এজন্যই বলেছিলাম, আপনার হয়তো ভাল লাগবে না। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আপনারা আর্যেরা যখন আমাদের অনার্য ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, তখন আমাদেরই কি তা ভাল লাগে ? অথচ আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কোন কথাই তো আপনাদের জানা নেই। আমি আমার পিতার কাছ থেকে বেদ-বিহিত আর্যধর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলাম। আর মা'র কাছ থেকে কুলধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটাই কিছু জেনেছিলাম। কিন্তু তার তাৎপর্য বোঝবার মত শক্তি ছিল না। আর্যেরাই আমাকে ঠেলে দিল আমার পিতার ধর্ম থেকে আমার মায়ের ধর্মে—আমার কুলধর্মের দিকে।

আর্যেরাই ঠেলে দিল—তার অর্থ ?

হ্যাঁ, আর্যেরাই তো ! আমার পিতৃহত্যার মধ্য দিয়ে যে-তীব্র আর্য-বিদ্বেষ আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, তার ফলেই আমি আমার স্বজাতির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এতকাল আমি তাদের মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এই সঙ্কটের দিনে তারাই আমাকে বুকে টেনে নিল, আমি তাদের স্নেহের স্পর্শ পেলাম, তাদের ভালবাসতে শিখলাম, আর এই সংস্পর্শের মধ্য দিয়েই আমি আমার কুলধর্মের প্রাণবস্তুর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তুলনা করে দেখলাম, আর বৈদিক দেবতামণ্ডলীর কল্পনা আমার কাছে শিশুদের খেলনার মতই হাস্যকর বলে মনে হতে লাগল। আমি বুঝতে পারছি, আমার কথায় আপনি দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু আমি কি করব, আপনিই তো আমার কথা জানতে চেয়েছেন। এ দু'-এক দিন বা দু'-এক বছরের কথা নয়, দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্য দিয়ে আমি সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই দীন-হীন, বঞ্চিত, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত,

হতভাগ্যদের ধর্মের মধ্যে-যে এত গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে, এ-যে আমার কল্পনারও অতীত ছিল। এক বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার তারা বহন করে চলে আসছে। কিন্তু সে কথা আর কেউ জানে না।

সুদর্শন বলল, আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন। বিদ্বেষ কি কখনও সত্য দর্শনের সহায়ক হতে পারে? এমন কি হতে পারে না যে, সেই বিদ্বেষই আপনার আগেকার দিনের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল?

আপনি ঠিক বলেছেন। বিদ্বেষ কখনোই সত্য দর্শনের সাহায্য করে না। সে তো আমার পিতৃহত্যার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমি তখন কোন আর্যজাতায় লোককে তীব্রভাবে ঘৃণা কবতাম। ভাল-মন্দ সবার মধ্যেই আছে, এই বিচার-বুদ্ধি আমার ছিল না। কিন্তু আমি আজ সেই বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছি। তা না হলে আপনি কি আমার সঙ্গে এই দীর্ঘ আলাপ করে আনন্দ পেতেন?

আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার কুলধর্ম সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানি না, আমি আপনার কথা কেমন করে বুঝব? আপনার কুলধর্ম সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। আমি শোনার জন্য উৎসুক।

ধর্ম কি এমনই একটা জিনিস যে, আমি দু' কথায় তাকে বুঝিয়ে দেব? তাকে উপলব্ধি করতে হলে সাধনা চাই যে!

কিন্তু তার কিছুই কি বলা যায় না? তবে মানুষ সেই সাধনার পথে আকৃষ্ট হবে কেমন করে?

কিছুই কি আর যায় না? তা অবশ্যই যায়। কিন্তু আজ অনেক কথা নিয়ে বলাবলি হয়ে গেছে। আজ আর নয়। আজ থাক।

একটু?

না, একটুও নয়। দেখছেন না, আপনার সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হয়ে গেছে।

আর এক দিন।

অশ্বত্থলা বললেন, আমরা জানা থেকে অজানায় যাই, প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে যাই। এটাই আমাদের তত্ত্বের মূল কথা।

আর আমরা? প্রশ্ন করল সুদর্শন।

আপনারা? আপনারা এর বিপরীত পন্থী। আপনারা অজানা থেকে জানায় এবং পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষে এসে পৌঁছতে চান।

কি রকম?

সৃষ্টির মূল কি? বলুন, কেমন করে এই সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে?

সৃষ্টির মূল প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাঁর ইচ্ছাতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

এ আপনার কল্পনা। কোন মানুষ কি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করতে দেখেছে? সৃষ্টির আগে কি মানুষের অস্তিত্ব ছিল যে, সে সৃষ্টিকারী প্রত্যক্ষ করতে পারবে?

এ কথা আমরা বলি না। এ কথা বেদবাক্য।

বেদবাক্য কি অভ্রান্ত?

অবশ্যই! বেদ তো ভ্রান্তিশীল মানুষের রচিত শাস্ত্র নয় যে, তাতে ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না, কল্পনা মাত্র হবে। আপনি তো বেদাধ্যয়ন করেছেন, বেদ-যে অপৌরুষেয়, সে কথা কি আপনি জানেন না?

পিতার মুখে সেই রকমই শুনেছিলাম বটে। তখন বিচার করবার শক্তি ছিল না, যা জানতাম যা পাঠ করতাম, নিঃসংশয়ে সেই কথাই বিশ্বাস করে নিতাম। কিন্তু এখন আর সে সব কথায় মন বসতে চায় না, শিশু-ভোগ্য রূপকথার মতই মনে হয়।

কেন? বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরেই প্রশ্ন করল সুদর্শন।

আপনার মনে কি কখনও কোন সংশয় জাগে না ?

আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংশয় তো জাগতেই পারে।

বেদ-বর্ণিত দেবতাদের কাহিনী কি আপনার কাছে ছেলে ভুলানো গল্পের মতই মনে হয় না ?

না, তা কেন হবে ? তা হলে আর দেবতাদের বন্দনা করব·কেন ?

আপনি কি সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন, আপনারা আপনাদের যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে-হবি, পশুমাংস ও সোমরস আহুতি দেন, তাঁরা তা গ্রহণ করেন ?

কেন বিশ্বাস করব না ? এ বিশ্বাস না থাকলে কি কেউ যজ্ঞ করে ?

যে-ভোজ্য বা পেয় অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যায়, আপনি কি তা ভোজন বা পান করতে পারেন ?

না।

তবে যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হবি, পশুমাংস ও সোমরসই বা দেবতারা কেমন করে ভোজন ও পান করেন ?

মানুষ যা পারে না, দেবতারা তা পারেন।

এই মহা শক্তিশালী দেবতারা কি তাঁদের ভোজ্য ও পানীয়ের জন্য সামান্য মানুষের উপরেই নির্ভরশীল ?

না, তাঁরা কারু উপরেই নির্ভরশীল নন। জীবন ধারণ করবার জন্য মানুষের মত ভোজন বা পান করা তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তবে যজমানের নিকট হতে আহুতি পেলে তাঁরা প্রীত হয়ে তা গ্রহণ করেন এবং তার বিনিময়ে তাদের সন্তান, গাভী ও অন্ন দান করেন।

অম্বখলা আরও যেন কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুদর্শন তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, এ কেমন ধারা আপনার ? আপনি আপনাদের কুলধর্ম সম্পর্কে আমাকে বলতে বসেছেন, আমিও শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। আর আপনি উলটে আমাকেই প্রশ্নের পর

প্রশ্ন করে চলেছেন। প্রশ্ন করবার কথা তো আমার, কিন্তু আপনি তার সুযোগ দিচ্ছেন কই?

অশ্বত্থলা হেসে বললেন, সেই সুযোগের অভাব হবে না। আমি কিন্তু আমার বলবার ক্ষেত্রটাই প্রস্তুত করে চলছি। সেজন্যই তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছি। আমার আরও অনেক প্রশ্ন করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার তাতে অনিচ্ছা। তাহলে আপাতত আর বেশী প্রশ্ন না ই করলাম। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিনঃ আপনি কি কখনও আপনাদের বেদবাক্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা আত্মবিরোধ লক্ষ করেন নি?

সুদর্শন বলল, হয়তো করেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা আমারই বুঝবার অক্ষমতা। আমি তো আগেই বলেছি, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

সমস্ত দায়টা কি নিজের ঘাড়েই টেনে নিলেন? এটা কিন্তু আপনি আপনার উপর সুবিচার করলেন না। আত্মবিরোধিতার অজস্র দৃষ্টান্ত আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে পারি। কিন্তু বর্তমানে সেটা আমার উদ্দেশ্য নয় একটা কথা শুধু বলছি, যে-মন্ত্রটি আমার পিতা তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেনঃ

কেমন করে, কোথা থেকে এই সৃষ্টির উদ্ভব, কে সে কথা নিশ্চিত করে জানতে পারে, কে সে কথা বলতে পারে? এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্য দিয়েই দেবগণের সৃষ্টি, তবে এই সৃষ্টির রহস্য জানতে পারে, এমন কে আছে?

কোথা থেকে এল এই ব্রহ্মাণ্ড? কেউ কি তাকে রচনা করেছে, না তা স্বয়ম্ভু? ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে বসে যে-সত্তা সমস্ত কিছু অবলোকন করছেন, হয়তো একমাত্র তিনিই একথা জানেন। কি জানি, হয়তো বা একথা তাঁরও অজ্ঞাত।

এইবার একটু সততার সঙ্গে বিচার করে দেখুন। আপনার অজ্ঞতাকে দায়ী করে নিজেকে নিজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবেন না।

কথাগুলি খুবই স্পষ্ট, এর মধ্যে কোনই জটিল বা গূঢ় অর্থ নিহিত নেই। আপনি বেদবাক্য-অনুসারে বলেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় ইচ্ছাবলে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেছিলেন। আবার সেই তিনিই বেদবাক্যের মধ্য দিয়েই সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করছেন—কেউ কি এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করেছে, না তা স্বয়ম্ভূ? এর পর তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে বসে যে-সত্তা সমস্ত কিছুই অবলোকন করছেন, হয়তো একমাত্র তিনিই এ কথা জানেন, কি জানি, হয়তো বা এ কথা তাঁরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে কি এ কথা মানায়? সেই ব্রহ্মার মুখ থেকেই তো আবার বেদবাণী নির্গত হয়ে এসেছে। আপনাদের ব্রহ্মা চতুর্মুখ, কিন্তু তাই বলে তিনি কি চার মুখে চার রকম কথা বলবার অধিকারী?

সুদর্শন এর উত্তরে কোন কথা খুঁজে পেল না। এ মন্ত্র তো তার অজানা নয়। কতদিন অভ্যাসমত এই মন্ত্র সে পাঠ করে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ প্রশ্ন তো কোনদিন তার মনে উদয় হয় নি। কেন হয় নি?

অশ্বত্থলা আর সুদর্শন পরস্পর মুখোমুখী বসে আছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে টিমটিম করে জ্বলছে একটি বাতি। বাইরে ঝিমঝিম করছে অন্ধকার রাত্রি। সুদর্শন মাথা নত করে বসে ছিল। সে না দেখেও অনুভব করতে পারছিল, অশ্বত্থলার স্থির দৃষ্টি তার উপর ন্যস্ত। সে তার প্রশ্নের উত্তর চাইছে। কিন্তু কি উত্তর দেবে সে?

অশ্বত্থলা বলল, আমি বুঝতে পারছি, আপনার কোন উত্তর নেই। কেমন করেই বা থাকবে? বেদকে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই আপনি দিতে পারবেন না। কেউ কি এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করেছে, না কি তা স্বয়ম্ভূ? এটাই মানুষের সত্য-জিজ্ঞাসা। কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করেছেন, এটা একেবারেই অলীক কল্পনা।

কিন্তু আমাদের কুলধর্মের ভিত্তি যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সৃষ্টির মূল খুঁজতে গিয়ে কোন মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নেন নি। সৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা সৃষ্টির মূলের সন্ধান করেছেন। পৃথিবীর মধ্যেই রয়েছে পৃথিবী, সৃষ্টির মূল শক্তি। প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে প্রাণী সৃষ্টির মূল শক্তি।

এই দর্শন নিতান্তই বাহ্য দর্শন।

না, বাহ্য দর্শন একে বলে না। যারা পৃথিবী সৃষ্টির বা প্রাণী সৃষ্টির মূল অনুসন্ধানের জন্য কাছে না এসে দূরে চলে যায়, যা আছে, তার কথা ভুলে গিয়ে, যা নেই তার পেছন পেছন ছুটে বেড়ায়, বাহ্য দর্শন যদি বলতে হয়, তাদের দর্শনকেই বলতে হবে।

সৃষ্টির মূল শক্তি কি, আপনিই তবে বলুন, প্রশ্ন করল সুদর্শন।

মানব সন্তান কি করে জন্ম নেয়? অম্বখলা পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

পুরুষ ও নারীর মিলনের ফলে।

পশুর ক্ষেত্রে?

পুরুষ পশু ও স্ত্রী পশুর মিলনের ফলে।

পাখির ক্ষেত্রে?

পুরুষ পাখি ও স্ত্রী পাখির মিলনের ফলে।

সরীসৃপ ক্ষেত্রে?

পুরুষ সরীসৃপ ও স্ত্রী সরীসৃপের মিলনের ফলে।

কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে?

পুরুষ কীট-পতঙ্গ ও স্ত্রী কীট-পতঙ্গের মিলনের ফলে।

এটা কি প্রত্যক্ষ না কল্পনা?

কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ।

এই পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের নামই মৈথুন। এই মৈথুন ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টির উদ্ভব। দধি মন্থনের মধ্য দিয়ে যেমন ঘৃত উৎপন্ন হয়, অরনী কাষ্ঠ যুগলের ঘষণের মধ্য দিয়ে যেমন অগ্নির উত্থান, তেমনি মৈথুনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির-কার্য চলছে।

আপনি দেহজ্ঞান-সর্বস্ব নাস্তিক লোকায়তিকদের মতই কথা বলছেন।

না, আমরা লোকায়তিকদের মত পোষণ করি না। আমরা শক্তি-সাধক।

শক্তি কে?

শক্তি সৃষ্টির মূল। এই শক্তি প্রতিটি স্ত্রীর মধ্যে বিরাজিত থেকে সৃষ্টিকার্য পরিচালিত করছেন।

শক্তি কি আত্ম-রতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম? আপনি কি আপনার পূর্ব-প্রকল্পের খণ্ডন করছেন না?

না, আমার পূর্ব-প্রকল্প অক্ষুণ্ণই আছে। শক্তি ও শিবের অনবচ্ছিন্ন মৈথুনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই দু'য়ের মধ্যে শক্তি মুখ্য, শিব গৌণ।

শিব কে?

পুরুষের মধ্যে যে-সৃজনী ক্ষমতা বিরাজিত আমরা তাকেই বলি শিব। সেজন্যই সৃষ্টিতত্ত্বকে বলা হয় শক্তি-শিব তত্ত্ব।

সুদর্শন বলল, আপনি যা-কিছু বলছেন, সবই আমার কাছে নতুন ও দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। আমি-যে কি বলব বুঝতে পারছি না।

প্রত্যক্ষকে ছেড়ে কল্পনার পেছন পেছন ছুটবার ফলে আপনারা সহজ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। সেজন্যই যা সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ, আপনাদের কাছে তা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।

আপনারা এই প্রকৃতি ও পুরুষকে কি কখনও চোখে দেখেছেন?

না, প্রকৃতি ও পুরুষ দৃষ্টিগোচর নন।

তবে প্রত্যক্ষ সর্বস্ববাদী হয়ে আপনারা এই অপ্রত্যক্ষ শক্তি ও শিবের অস্তিত্ব কেমন করে বিশ্বাস করেন?

শক্তি ও শিব দৃষ্টির অগোচর হলেও অপ্রত্যক্ষ নন। কারু উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার পক্ষে দৃষ্টিশক্তিই একমাত্র উপায় নয়। কোন লোকের কণ্ঠস্বর শুনলেই আপনি তার নিকট

অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। চোখ বন্ধ করেও যদি কোন লোককে স্পর্শ করেন, আপনি তার অস্তিত্ব-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। পারেন না কি?

শক্তি ও শিব কি তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য?

না, তা-ও নয়। কোথাও ধোঁয়া দেখলে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আপনি অগ্নির অস্তিত্ব বুঝতে পাবেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য কারণ ব্যতীত গাছের পাতা নড়তে দেখলে আপনি বাতাসের চলাচল বুঝতে পারেন। পারেন না কি? মিথুনরত পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে শক্তিকে এবং মিথুনবত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে শিবকে অনুভব করতে পারে। শক্তি ও শিবের মহিমাতেই স্ত্রী পুরুষকে এবং পুরুষ স্ত্রীকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের সঙ্গে কোন আকর্ষণের তুলনা হয় না। শক্তি ও শিবের প্রেরণাতেই মৈথুনকার্য সুসম্পন্ন হয়

রাত্রির নিঃশব্দতা ভেদ করে অশ্বত্থলার ধীর স্থির অকম্পিত কণ্ঠ মৈথুনের অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যের কথা উদ্‌ঘাটন করে চলল। বিস্ময়ে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে সুদর্শন শুনতে লাগল। এসব কথা এমন করে কোন যুবতী-যে কোন যুবকের সামনে মুখ খুলে বলতে পাবে, এ কথা সে ভাবতেও পারত না। মৈথুন জীবমাত্রেরই ধর্ম, একথা সবাই জানে, সুদর্শনেরও অজানা নয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ পশুর মত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে তা করতে পারে না, অন্ধকারের গোপন আশ্রয়ে আপন কামনা পূর্ণ করে। কিন্তু সে কথা বর্ণনা করতে অশ্বত্থলার বিন্দুমাত্র ইতস্তত নেই, তার কণ্ঠস্বরে সঙ্কোচের সামান্য জড়তাটুকুও লক্ষ করা গেল না। সে মুক্তকণ্ঠে পবিত্র মৈথুনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চলল।

অশ্বত্থলা বলছিল, সকল ধর্মের বড় ধর্ম মৈথুন। এই ধর্মের মধ্য দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, এই ধর্মের উপরেই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। সহজ বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রাণী যারা, তারা একে সকল ধর্মের বড় ধর্ম বলেই জানে। একদিন আর্যেরাও তা জানত। কিন্তু পরে অজ্ঞান-

তার তিমিরে তাদের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রকৃত ধর্মকে স্থানচ্যুত করে মিথ্যা ধর্ম-যজ্ঞ তার স্থান অধিকার করল। বৈদিক ঋষির উক্তি তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে ঃ

হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হোল যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হোল সমিধ। ওই আহ্বানই হোল ধূম। যোনিই হোল অগ্নিশিখা। প্রবেশ ক্রিয়াই হোল অঙ্গার। রতিসম্ভোগই হোল বিস্ফুলিঙ্গ।

যে আহ্বান করে সেই হোল হিঙ্কার। যে প্রস্তাব করে, সেই হোল প্রস্তাব। স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে, সেই হোল উদ্গীথ। স্ত্রীর অভিমুখ হয়ে শয়ন করে, সেই হোল প্রতিহার। সময় অতিবাহিত হয়, তাই নিধন। এই বামদেব্য-নামক সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত।

যে এই ভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, সে মিথুনে মিলিত হয়। প্রত্যেক মিথুন থেকেই সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়। সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোন স্ত্রীলোককে পরিহার করিবে না, এ-ই ব্রত।

চমকে উঠল সুদর্শন। এই বকম কতগুলি মন্ত্র সাত্যকি একদিন তাকে শুনিয়েছিল। সেদিন সে এগুলিকে বেদমন্ত্র বলে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি। আজ আবাব অশ্বথলা সেই মন্ত্রই শোনাচ্ছে। আজও কি সে এদের মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে ?

কিন্তু কি আশ্চর্য, সে আজ চেষ্টা কবেও তাদের মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না। আজ মনে হচ্ছে, কথাগুলির অর্থ যেন বড় বেশী সুস্পষ্ট আর প্রাঞ্জল। সেদিন দিনের আলোকে যার অর্থ একটু অস্পষ্ট ছিল, রাত্রির অন্ধকারে তা যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় ভাল লাগছে মন্ত্রগুলি। সোমরস পানে যেই মত্ততা জাগে, তেমনি মাদকতা যেন এই মন্ত্রগুলির মধ্যে। কিন্তু ভুল ভুল, মাদকতা ওই মন্ত্রের মধ্যে নয়, মাদকতা ঝরে পড়ছে ওই নারীদেহ থেকে, যে-নারী ওর মুখোমুখী বসে আছে।

মনে পড়ল সুদর্শনের, একদিন সে প্রশ্ন করেছিল, বৃক্কনেরা দেখতে

কেমন? অম্বত্থলা হেসে তার মুখখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অবিকল এই রকম। কেমন মনে হচ্ছে? সুদর্শনের সেদিন মনে হয়েছিল, জীবনে কত মেয়ে সে দেখেছে, কিন্তু এমন একখানি মুখ সে কোনদিন দেখে নি। সেই দিন থেকে এই চিন্তাটাই ওকে পেয়ে বসেছে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সেই কথাটাই ওর মনে ভাসে। এক পলকের জন্যও অম্বত্থলাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। এ রোগ তো ওর কোনদিন ছিল না। এ তার কি হে'ল?

ঘরে তার বউ রয়েছে। বড় ভাল মানুষ, সরল মন, স্বামীর বাক্য ওর কাছে বেদবাক্য। স্বামী ছাড়া আর কোন কথা বোঝে না। সেই বসুমতীর প্রতি তার দায়িত্ব সে যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করেছে, আর কোন মেয়ের দিকে তাকাবার মত সময় বা প্রবৃত্তি তার হয় নি। এবার ভ্রমণে বেড়িয়ে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল সুপর্ণার সঙ্গে। অজস্র যৌবন আর কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস নিয়ে ধেয়ে এল সে, নাগিনীর মত জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার বাঁধন কাটিয়ে চলে এল সুদর্শন। পথ ছেড়ে বিপথে সে কখনও যায় নি, অনার্য-নন্দিনী অম্বত্থলা তাকে এ কি মন্ত্র শোনাল!

স্ত্রীলোকই হোল যজ্ঞীয় অগ্নি। সত্যিই তাই। অম্বত্থলা আগুনের মতই মেয়ে। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই জ্বলছে। এই আগুনে আপনাকে আহুতি দিতে না পারলে, সে জীবন বয়ে আর লাভ কি!

ছি, ছি, এ কি সব কথা ভাবছে সে? না, আপনাকে সংযত করল সে। মনকে দৃঢ় করে নিয়ে সে বলল:

মৈথুনের মধ্যে জীবসৃষ্টির কারণ রয়েছে, কিন্তু তাই দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন, এ কি দুঃসাহস আপনাদের?

অম্বত্থলা বলল, এই ব্রহ্মাণ্ড ছন্দোবদ্ধ, তার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য আছে। তার মূল বস্তুটাকে আয়ত্ত করতে পারলে সমগ্রের আয়ত্ত করা যায়। মানুষ এই ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিচ্ছাব। ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে হলে ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরে বেড়াবার দরকার করে না। মানুষের

মধ্যেই সমগ্রের লীলা চলেছে। মানুষকে জানলেই সমগ্রকে জানা যাবে।

সে কেমন?

শস্যক্ষেত্রে গিয়ে একটি শস্যের দানা আস্বাদন করে দেখুন। তার মধ্যেই ক্ষেত্রের সমস্ত শস্যের আস্বাদ পাবেন। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি শস্যের আস্বাদ নেবার প্রয়োজন করে না।

আরও পরিষ্কার করে বলুন।

একজন পুরুষ আপনার শুক্রবিন্দুর মধ্যে রক্ত-মাংস-অস্থি-চর্ম-মেদ মজ্জাদি বিশিষ্ট সমস্ত দেহকে সংহত করে রাখতে পারে। তেমনি ব্রহ্মাণ্ডও মানুষের মধ্যে আপনাকে সংহত করে রাখে।

আরও বলুন।

একজন স্ত্রী আপনার রজঃ বিন্দুর মধ্যে রক্ত-মাংস-অস্থি-চর্ম-মেদ মজ্জাদি বিশিষ্ট সমস্ত দেহকে সংহত করে রাখতে পারে, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডও মানুষের দেহের মধ্যে আপনাকে সংহত করে রাখে।

আরও বলুন।

আপনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন?

হ্যাঁ, দেখি।

আপনি স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেন?

হ্যাঁ, করি।

বিভিন্ন দৃশ্য দেখেন?

হ্যাঁ, দেখি!

আপনি কি মনে করেন আপনি সশরীরে সুপ্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেন, বিভিন্ন দৃশ্য দেখেন?

না, আমি তা মনে করি না।

তবে কেমন করে আপনি এ সমস্ত দেখেন?

অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছি, সুপ্ত অবস্থায় জীবাত্মা মাঝে মাঝে দেহ ছেড়ে বাইরে চলে যান। সুপ্তির মধ্যেও তিনি দেখেন, শ্রবণ করেন,

ভোগ করেন। কারণ তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা ও ভোক্তা। দেহ তো উপলক্ষ মাত্র, মাটির মতই নির্জীব ও অসার।

মিথ্যা, মিথ্যা এই জীবাত্মার কল্পনা। প্রকৃত সত্য এই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই দেহ-ভাণ্ডের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে। সুপ্তির মধ্যে দেহমন যখন অচঞ্চল থাকে তখন এই অদৃশ্য ছায়ারূপ মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

তাই যদি হবে, তবে আমরা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি না কেন?

কে বলে দেখি না? যাকে আমরা বলি স্বপ্ন, তা আমরা জাগ্রত অবস্থাতেও দেখি।

আপনার এই কথা কি খ-পুষ্প ও বন্ধ্যা গাভীর দুগ্ধের মতই অসম্ভব নয়?

না, আমি যা বলছি, সেটাই সম্ভব এবং সেটাই সত্য। আমি এখনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্যাসত্যের নির্ণয় করে দিচ্ছি। আপনি চোখ বুজে স্থির চিত্ত হয়ে বসুন।

এই-যে বসেছি।

বেশ, আপনি অন্য কথা ভুলে গিয়ে গভীর ভাবে পর্বতের কথা চিন্তা করুন। কি দেখছেন?

দেখছি একটি পর্বতের ছায়া।

যথার্থ দেখছেন। পর্বত অদৃশ্য ছায়ার মতই আপনার মধ্যে বর্তমান আছে।

সরোবরের কথা চিন্তা করুন। কি দেখছেন?

দেখছি সরোবরের ছায়া।

যথার্থ দেখছেন। আপনি আপনার গৃহ ও গৃহিনীর কথা চিন্তা করুন। দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ, দেখছি।

আমার কথা চিন্তা করুন। দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ, দেখছি।

এবার চোখ মেলুন। বলুন এবার, এরা কি আপনার বাইরে না ভিতরে?

ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ভিতরে।

ঠিক বুঝতে পেরেছেন। সৃষ্টির মধ্যে যা-কিছু আছে সবই অদৃশ্য ছায়ামূর্তি নিয়ে আপনার মধ্যে বিরাজ করছে। চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের দেখা যায় না, মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখতে হয়। একাগ্র চিন্তা বা ধ্যানের মধ্য দিয়ে এই মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। আর এই ধ্যান যখন বিশুদ্ধ ধ্যানে পরিণত হয়, তখন মানুষ আপনার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধি করতে পারে। তখন ভেদাভেদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে এই ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

সুদর্শন বলল, আমি এতকাল যত কিছু জেনে আর বুঝে এসেছি, আপনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছেন।

এটাই তো স্বাভাবিক। সত্য চিরদিনই মিথ্যার বিপরীত হয়ে থাকে।

আমি আপনার যুক্তি খণ্ডন করে আমার যুক্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না কিন্তু আপনাদের এই তত্ত্বকে গ্রহণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

আগেই তো বলেছি, তত্ত্ব শুধু মুখের কথা নয়। তত্ত্বের উপলব্ধি সাধনা সাপেক্ষ।

আমার একটা প্রশ্ন। আপনারা মৈথুনকেই সমগ্র সৃষ্টির উৎস বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মৈথুন তো শুধু প্রাণীদের পক্ষে প্রযোজ্য। অপ্রাণীদের ক্ষেত্রে তো আর মৈথুনের কথা চলে না।

কেন চলবে না? প্রাণী আর অপ্রাণী, মৈথুনের মধ্য দিয়েই সবার সৃষ্টি। প্রাণীদের মৈথুন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। কিন্তু অপ্রাণীর মৈথুন রহস্যাচ্ছন্ন বলে তার স্বরূপ সহজ বুদ্ধিতে ধরা দেয় না। একটু সজাগ হয়ে চেয়ে দেখুন, দেখবেন সর্বত্রই চলেছে এই মৈথুন লীলা। অরণি কাষ্ঠ-যুগলের মধ্যে পুরূরবা আর উর্বশীর মৈথুনে অগ্নির সৃষ্টি,

নদীর জল আর আকাশের বায়ুর মৈথুনে তরঙ্গের সৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ লোহা আর তেজের মৈথুনে স্বর্ণের সৃষ্টি। কামার্ত আকাশ দিগন্তের আলিঙ্গনে আবদ্ধ পৃথিবীতে অবতরণ করে ঋতুতে ঋতুতে মৈথুনরত। আর তারই ফলে পৃথিবীর এই উর্বরতা।

সুদর্শন কি যেন একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু বলতে গেয়েও বলা হোল না। অম্বশ্বলা বলে চলেছে ' আর সব কিছুর পেছনে চলেছে শক্তি আর শিবের লীলা। শক্তি অস্থির, চঞ্চল, তার পায়ে নৃত্যের হিল্লোল। ধ্যানস্থ শিবের ধ্যান ভাঙিয়ে তিনি তাঁকে আকর্ষণ করেন। সেই দুর্নিবার আকর্ষণে প্রমত্ত শিব ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর বুকে। তখন শুরু হয় সেই মিথুন নৃত্য। আর তারই ছন্দে ছন্দে বিশ্ব জুড়ে সৃষ্টির সঙ্গীত বেজে ওঠে।

সেই সঙ্গীত সুদর্শন শুনতে পেল অম্বশ্বলার কণ্ঠে। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি থমথম করছে। এই মোহময়ী রাত্রি আর সব কথা ভুলিয়ে দিল তাকে। শুধু একটি কথাই মনে রইল, সে আর অম্বশ্বলা মুখোমুখী বসে আছে। মাঝখানে একটু ব্যবধান। কেন এই ব্যবধান? অম্বশ্বলা অগ্নিশিখার মতই জ্বলছে, দুর্নিবার তার আকর্ষণ। পতঙ্গ, ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড়, যেমন করে শিব ঝাঁপিয়ে পড়েন শক্তির বুকে।

হঠাৎ তার বুকের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল,—তুমি আমার —তোমার ওই মুখমণ্ডল আমার, তোমার ওই বাহুযুগল আমার, তোমার বক্ষদেশ আমার, তোমার সর্বাঙ্গ আমার। প্রজাপতি আমার জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এসো বন্ধু, রথচক্র যেমন বিদ্যুৎ-বেগে ধেয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে আমরাও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হই।

একদিন সুপর্ণা তাকেই সম্বোধন করে এই কথাগুলি বলেছিল। আজ অম্বশ্বলার দিকে চেয়ে সেই কথাগুলিই তার মনে পড়ছে। এই কথাই সে বলতে চাইছে অম্বশ্বলাকে। কিন্তু বলতে পারছে না। যে-কথা বলবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে, সে কথা না বলে সে অনর্থক

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল। কিন্তু কি বলছে অম্বখলা, সে তার কানে যাচ্ছিল না। সে ভাবছিল, সামনে একটুখানি মৃদু বাতির আলো, পিছনে একরাশ অন্ধকার নিয়ে একটুখানি চেনা, অনেক বেশী অচেনা কে এই রহস্যময়ী মেয়ে? সৃষ্টি-রহস্যের এই গোপন পথে কে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে?

হঠাৎ ওর মনে হোল, কে অম্বখলা, আর কে-ই বা সুদর্শন! মিথ্যা, সব মিথ্যা। একমাত্র সত্য শক্তি আর শিব। সৃষ্টির খেলা খেলবার জন্য শক্তি শিবকে আহ্বান করছে। দুর্নিবার তার এই আহ্বান। শিব সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারল না। মাঝখানে যে-সামান্য ব্যবধানটুকু ছিল, লুপ্ত হয়ে গেল। অম্বখলা সুদর্শনের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল। ক্ষীণশিখা বাতিটাও যেন সময় বুঝে নিভে গিয়েছে। সুদর্শন বুঝল লগ্ন এসে গেছে।

ভ্রষ্ট লগ্ন! অম্বখলা অচঞ্চল অথচ দৃঢ় হস্তে আপনাকে মুক্ত করে নিল। তীক্ষ্ণ কুপিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, এ কি? সেই কঠিন রুক্ষ কণ্ঠস্বরের আঘাতে সুদর্শনের জাগ্রত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই অম্বখলার রুক্ষ নীরস কণ্ঠ পরিহাসে তরল হয়ে উঠল। সে বলল, আপনি ভুল করেছেন। অবশ্য এ ভুল অনেকেই করে। আমি আপনার মায়ের বয়সী। আমার বয়স চল্লিশোর্ধ্বে। যান, অনেক রাত হয়েছে। এখন শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

পরদিন সকাল বেলা সুদর্শন লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিল না। ছি, ছি, এ কি করল সে! সংযত, সচ্চরিত্র, ধীর স্থির বলে পরিচিত সুদর্শন, সে-যে এমন কাজ করতে পারে তার পরিচিতেরা তো এমন কথা ভাবতেও পারে না। অবশ্য এ কথা তাদের কারু কানে যাবে না। কিন্তু তাতেই বা কি? নিজের কাছে কি বলে কৈফিয়ৎ দেবে? যিনি মনে কোন রকম সন্দেহ না রেখে তার মত অজ্ঞাত কুলশীল ও বিদেশী ও বিজাতীয় অতিথিকে আপন লোকের মতই নিজের ঘরে স্থান দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সে কিনা এই ব্যবহার

করল! তা'ছাড়া জ্ঞানের দিক দিয়ে যিনি তার গুরুস্থানীয়া, বয়সের দিক দিয়ে যিনি তার মাতৃতুল্যা—ছি ছি ছি, এর চেয়ে সুদর্শনের মরে যাওয়াও-যে ভাল ছিল।

অশ্বত্থলার সত্যি-সত্যিই তুলনা হয় না। সুদর্শনকে সে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে থাকতে দিল না। হেসে, গল্প করে, নানা রকম প্রসঙ্গ তুলে দিয়ে সে তাকে অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে চেষ্টা করল।

অশ্বত্থলা বলল, কিছু না, কিছু না, ও রকম কত হয়! তাতে হয়েছে কি! আমার গায়ে তো আর ফোসকা পড়ে যায় নি। আপনিও যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। আর আমার বয়স? হেসে উঠল অশ্বত্থলা, ও রকম ভুল অনেকেই করে। বললেও মানতে চায় না। দূর থেকে অনেক লোক নাম শুনে দেখতে আসে। এসে আমার চেহারা দেখে গালে হাত দিয়ে বসে! তারা পরস্পর বলাবলি করে, এই কাঁচা বয়সের মেয়েটা, তত্ত্ব-কথা এর কাছে কি শুনব! এখানকার আর্যেরা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে. আপনার বয়স বাড়ে কিন্তু আপনি বাড়েন না, এ কেমন করে হয়? আমি তাদের বলি, আমাদের দেহ শক্তির মন্দির। এই মন্দিরেই আমাদের উপাসনা। এই মন্দিরকে আমরা সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করি। এই মন্দিরে কোন আবর্জনা আমরা থাকতে দিই না, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখি। আমরা জানি আমাদের এই মন্দিরকে কেমন করে যত্ন করতে হয়। তাই তো বয়সের ঘা খেয়েও আমাদের এই মন্দিরে সহজে ভাঙ্গন ধরে না।

সুদর্শন সঙ্কোচে অশ্বত্থলার সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়ে তাকাতে পারল না, নতমুখে বলল, আমার অপরাধের শেষ নেই—

এ কি, এখনও সেই সব কথাই ভাবছেন? ওসব মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই। পুষে রাখলেই সব উপসর্গের সৃষ্টি। বলতে বলতে অশ্বত্থলা নিসঙ্কোচে সুদর্শনকে কাছে টেনে নিয়ে এল।

সুদর্শন চমকে উঠে অশ্বত্থলার মুখের দিকে তাকাল। কি দেখল তার মুখের মধ্যে? দেখল অশ্বত্থলা সত্য-সত্যই তার মাতৃতুল্যা। তার দুই চোখ থেকে মায়ের স্নেহ ঝরে পড়ছে।

অশ্বত্থলা বলে চলল, মনের মধ্যে কোন ময়লা যদি জমে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই মন খোলাসা করে তাকে ঝেড়ে ফেললেই যত জঞ্জাল সাফ হয়ে যায়। আমার শিষ্যদের আমি তো এই কথাই বলি।

শিষ্য? মেয়েলোকের আবার শিষ্য থাকে নাকি? সুদর্শন এমন কথা কোনদিনই শোনে নি। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে কত নতুন কথাই তো তাকে শুনতে হচ্ছে।

আশ্চর্য শক্তি এই মেয়ের। সুদর্শনকে সে বুঝিয়ে ছাড়ল যে, লজ্জা পাবার এমন কিছুই ঘটে নি। সংসারে চলতে গেলে এমন দু'টো একটা হোঁচট খেতেই হয়। শেষপর্যন্ত সুদর্শনও তার আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলে চলল।

সাহস ওদের কম নয়। কথায় কথায় সেই শক্তি-শিবের প্রসঙ্গটাই আবার উঠে পড়ল। সুদর্শন বলল, শক্তি প্রধান, শিব গৌণ, এ আপনাদের কেমন কথা?

কেন, এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো সত্য।

শিশু বয়স্কের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, দুর্বল সবলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, অজ্ঞানী জ্ঞানীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, আর স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এইটাই কি স্বাভাবিক, এটাই কি সত্য?

হেসে উঠল অশ্বত্থলা, আমি বুঝতে পারছি আপনার কথাটা। আমি আপনাদের ও-দিক আর আমাদের এ-দিক, দু' দিকের খবরই জানি। আপনাদের ঘরে মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোর করে গৃহপালিত পশুর মতই আবদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের ঘরে মেয়েরাই কিন্তু প্রধান। তারা শিশুর মত অসহায়

নয়, দুর্বলও নয়, অজ্ঞানও নয়। তারাই তাদের নিজ নিজ সংসারকে পরিচালিত করে। কিন্তু এ শুধু বুরুন জাতির কথা নয়, পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই এই নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু আপনাদের ঘরে পুরুষ-প্রাধান্য। আপনারা বিকৃত বুদ্ধিতে স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী কাজ করেন। নিয়ম যেমন আছে, নিয়মভঙ্গও আছে। কিন্তু নিয়মভঙ্গটাই নিয়ম নয়।

আপনি যা বলছেন, তা আমার বুদ্ধি ও চিন্তার অগম্য।

ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও আপনাকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করব না। আমার পিতা আর মা'র মধ্যে এই নিয়ে সব সময় ঠোকা-ঠুকি চলত। পিতা আর্য শাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়ার ফলে পুরুষ-প্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিলেন। আর আমার মা স্বাভাবিক ভাবেই তা মানতে চাইতেন না। যে-কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে এই বিরোধটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাঁদের ওই দ্বন্দ্বের মূল কারণটা তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। এখন ভাল করেই বুঝতে পারি।

সুদর্শন বলল, দেখুন, আমার বন্ধু সাত্যকি বলেছিল, তুমি পৃথিবীটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস। নানা দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে তোমার অনেক ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়ে আসবে। কিন্তু দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে আমি যত দেখছি আর শুনছি, আমার দৃষ্টি যেন ততই ঘোলাটে হয়ে আসছে, আর ততই বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি।

অম্বখলা হাসতে হাসতে বলল, আপনার বন্ধু সাত্যকি মূল্যবান কথাই বলেছেন। আর আপনিও একেবারে ভুল বলেন নি। অন্ধকার ঘর থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যালোকের মধ্যে এসে দাঁড়ালে, প্রথমটা সেই আলোকে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, পরে সেই সূর্যালোকেই আবার অস্পষ্ট জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুদর্শন একটু ইতস্তত করে বলল, একটা প্রশ্ন করব?

অম্বখলা বলল, আপনি দেখতে এসেছেন, শুনতে এসেছেন, জানতে এসেছেন, প্রশ্ন করতে আপনার এত কুণ্ঠা কিসের?

এগারো।

ইদার ছেলেটা দিব্য বড়-সড় হয়ে উঠেছে। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারে। ওর মা ওর কোমরে সুতো দিয়ে একটা ঝুনঝুনি বেঁধে দিয়েছে। ও যত জোরে ছোটে, ঝুনঝুনিও তত জোরে বেজে ওঠে। নিজের এই কৃতিত্বের গর্বে ডগমগ হয় ছেলেটা মা আর বাবার মুখের দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর খলখলিয়ে হাসে। ইদা আর সুদাসের এই ছেলেকে নিয়ে গর্বের আর অন্ত নেই। এমন একটা ছেলে কোন দিন কারু ঘরে জন্মায় নি।

ওরা ওর নাম রাখল খেতু। ক্ষেতের মধ্যে জন্ম কিনা, তাই। ইদা ক্ষেতে বসে কাজ করছিল। এই অবস্থাতেই কঁকাতে কঁকাতে শুয়ে পড়ে হাত-পা খিঁচোতে লাগল। মাকে বেশী কষ্ট দেয় নি খেতু। একটু বাদেই যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। লোকের মুখে খবর পেয়ে সুদাস ঘোড়ার মত জোরে ছুটতে ছুটতে এল। এসে যা কাণ্ড-খানা করল, দেখে-শুনে যে-সব লোক সেখানে জমেছিল, তারা হেসে কুটি কুটি। ছেলেটার মুখটা একবার দেখে নিয়ে সে ইদাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সে কি নৃত্য, একেবার উদ্দাম নৃত্য। যে-সব ছেলেপিলেরা এসে জুটেছিল, এই উত্তেজক পরিস্থিতিতে তারাও স্থির হয়ে থাকতে পারল না, সুদাসের পেছন পেছন তারাও নৃত্যে মেতে গেল। ইতিমধ্যে ইদা ওর রক্তমাখা কাপড়টাকে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। তার এক চোখে তৃপ্তির হাসি, আর চোখে লজ্জা। এই ভাবে ছেলে খেতুর জন্মোৎসব সম্পন্ন হোল।

শুধু ইদা আর সুদাসই নয়, যারা দেখল তারাই বলল, এমন ছেলে বড় একটা হয় না। কালো পাথরের মত কুচ্‌কুচে কালো, এ কালোর

তুলনা নেই। রং যেন পিছলে পড়ে। এ রং নাকি আগেকার দিনে ছিল, আজকাল আর দেখা যায় না। আর কি সুন্দর ওর এই বোঁচা নাকটা। এমন একটা নাক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সবার মুখেই এই কথা শুনে ইদার বুকে গর্ব আর ধরে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মন আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি থু থু ছিটোয় ছেলের গায়ে, আর ওর কপালে একটা কালো ফোঁটা পরিয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে কত রকম মানুষ আছে, কার মনে কি আছে, কে বলতে পারে! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা মোটে ছেলে। ওর বুকের ধন, ওর চোখের তারা। ওকে নিয়ে ওর বড় ভয়ে ভয়ে দিন কাটে।

সেই খেতুর আজ কান ফোঁড়ানির উৎসব। এই অনুষ্ঠান না করলেই নয়। অপদেবতারা সব সময়ই ওৎ পেতে বসে আছে। ভাল ভাল ছেলেমেয়েদের দিকে ওদের নজর বেশী। একটু জো পেলেই হোল, আর কথা নেই। এজন্যই তো ভাল ভাল ছেলে-মেয়েগুলি বেশী দিন টিকতে চায় না। এই অপদেবতাদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই ওরা ছেলেমেয়েদের কানের মধ্যে ফুটো করে একটা খুঁত সৃষ্টি করে তোলে। খুঁত দেখলে ওরা নাকি ঘেন্না করে ছুঁতে চায় না। ঘেন্না করেই হোক আর যা করেই হোক, ওরা একটু তফাৎ থাকুক, মানুষ তো এটাই চায়।

গরীব মানুষ সুদাস, বেশী খরচপত্র করবে কোত্থেকে? সমাজের দু' চার জনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিল। তাদের জন্য দু' ভাঁড় পচাই মদ তৈরি করেছিল। আর কিছু মাংসের শুঁটকি। যারা নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিল, তারা সেই পচাই খেয়ে মাতামাতি করে টলতে টলতে যে-যার ঘরে চলে গেছে। এক বাকী রয়েছে আব্বন। আব্বন সুদাসের জ্ঞাতি-গোত্রের কেউ নয়, স্ব-বর্ণেরও কেউ নয়। বৈশ্যপল্লীর পূনর্বসু দেশ-বিদেশে যায় পণ্য বিনিময় করতে। কোন এক দেশের ক্রীতদাসের বাজার থেকে এক ষাঁড়ের বিনিময়ে কিনে নিয়ে এসেছিল আব্বনকে।

সেও আজ অনেক দিনের কথা। সেদিনের তরুণ আব্বন আজ বার্ধক্যের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে।

বয়সের অনেকটা ব্যবধান থাকলেও সুদাসের সঙ্গে আব্বনের গলায় গলায় ভাব। সুদর্শনের ক্ষেত আর পুনর্বসুর ক্ষেত পাশাপাশি। আব্বন তার প্রভুর ক্ষেতে কাজ করতে আসে। পাশাপাশি কাজ করতে করতে ওদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘটল। শেষে এই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হোল। সুখে-দুঃখে দু'জন দু'জনের সঙ্গী। এই অসমবয়সী দু'টি বন্ধুর কথা নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে।

আব্বন প্রথম প্রথম তার দেশের কথা আর তার দেশের মানুষের কথা নিয়ে অনেক গল্প করত। কিন্তু তার কথা শুনে লোকে হাসত। তারা বলত, আব্বনের মাথায় একটু ছিট আছে। এমনিতে কাজে-কর্মে তো খুবই ভাল, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে। কিন্তু তার বাড়ির কথা উঠলেই তখন কি-যে হয়, যা ওর মুখে আসে, তাই বলতে থাকে। তখন কথার আর কোন বাপ-মা থাকে না।

লোকে হাসবে না কেন? ওর কথা শুনে কেউ না হেসে পারে! আব্বন বলবে ওদের দেশে নাকি ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, এই সমস্ত ভেদ নেই। সবাই সমান। ওরা বলে, সবাই সমান, এও কি একটা কথা হোল? প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করেন, বড় আর ছোট এই ভেদ তিনিই করে দেন। যে-প্রজাপতি এ দেশ তৈরি করেছেন, ওদের দেশও তাঁর হাতেই তৈরি। এক দেশে উঁচু-নীচু, আর এক দেশে সবাই সমান, এ কি কখনও হতে পারে! একটা কথা বললেই তো আর হোল না।

ওরা প্রশ্ন করে, আব্বন, তুমি তো বলছ, তোমাদের দেশে রাজা নেই। কিন্তু রাজা যদি না থাকে, তবে তোমাদের শাসন করে কে?

আব্বন উত্তর দেয়, আমাদের কেউ শাসন করে না।

শাসন করে না? তবে কেমন রাজ্য তোমাদের? শাসন নেই, তবে তো নিয়ম-শৃঙ্খলাও নেই। যে যা খুশি তাই করে।

ও বাবা, সেটি হবার জো নেই। বড় কঠিন নিয়ম, একটু এ-দিক ও-দিক করতে পারে না কেউ।

কেন, রাজা নেই, শাসন নেই, নিয়ম ভাঙলে বাধা দেবে কে?

সে দেশ তো তোমাদের এখানকার মত নয় যে, একটু সুযোগ পেলেই লোকে ফাঁকি দেবে। ওখানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আর দেবদেবীরা অষ্টপ্রহর সজাগ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁদের চোখের সামনে নিয়ম ভঙ্গ করবে এত সাহস কার?

আব্বন কি-যে বলে, লোকে তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারে না। আব্বন বলে, তাদের দেশে বিয়ে নিয়ে এত হ্যাঙ্গামা করতে হয় না।

হ্যাঙ্গামা? বিয়ের আবার হ্যাঙ্গামা কি?

হ্যাঙ্গামা নয়? কোথায় রইল পাত্র, কোথায় রইল পাত্রী; খুঁজে খুঁজে হয়রান। পাত্রের বাপ-মা আর পাত্রীর বাপ-মার বিয়ে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কি আর চোখে ঘুম থাকে! বিয়ের কথা ঠিক হোল, তার পরেও এ নিয়ে সে নিয়ে ঠেলাঠেলি, তারপর ডাকো পুরোহিতকে, পড়াও মন্ত্র, সমাজের দশ জনকে খাওয়াও—খরচে খরচে গরীব মানুষের প্রাণান্ত।

আর তোমাদের বিয়েতে হ্যাঙ্গামা নেই?

কিছু না। বছরে দু' বার করে মেলা বসবে। ঢ্যাম, ঢ্যাম, ঢ্যাম ঢোল বেজে উঠবে, আর কুমারী মেয়েরা সেজেগুজে আসবে, কুমার ছেলেরা সেজেগুজে আসবে। ঢোলের বাজনা এবার বোল বদলে দেবে, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ডিকুর ডিকুর—আর সেই তালে তালে নেচে চলবে মেয়েরা আর ছেলেরা। দু'দল নাচতে নাচতে মুখোমুখী এগিয়ে আসবে। যে-মেয়ের যে-ছেলের উপর মন পড়বে, নিজের খোঁপার ফুলটা খুলে নিয়ে তার হাতের মধ্যে গুঁজে দেবে। তারপর সেই ছেলে আর মেয়ে হাত ধরাধরি করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পরস্পরের পরিচয় নেবে। ব্যস্, হয়ে গেল বিয়ে।

হয়ে গেল বিয়ে? অবাক হয়ে ওরা জিজ্ঞেস করে।

হোলই তো। আর বাকী রইল কি?

এর নাম বিয়ে? ছি ছি ছি, এ তো পশুর মত আচরণ।

কেউ কেউ বলে, অনার্য আর পশুতে তফাৎটাই বা কি?

কিন্তু তা হলেও সবাই এ কথা বিশ্বাস করে না। বলে, আব্বনের কথা ওই রকমই।

কিন্তু এর চেয়েও আজব কথা শোনায় আব্বন। বলে, ছেলেরা নাকি বিয়ের পর নিজের বাপ-মাকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকে। সারা জীবন সেখানেই কাটায়। লোকে বলে, কি পাগলের পাল্লায়ই পড়া গেছে। আরে আহাম্মক, পুরুষ মানুষ কি মেয়েমানুষ যে, শ্বশুরবাড়িতে সারা জীবন কাটাবে? আচ্ছা, বিয়ের পর তুমি কোথায় থাকতে?

আব্বন উত্তর দেয়, আর কোথায় থাকব? বউর কাছেই থাকতাম শ্বশুরবাড়িতে।

বাঃ বাঃ, ওদিকে তোমার বাপের সম্পত্তি ভোগ করত কে?

বাপের আবার সম্পত্তি কি, সম্পত্তি তো মায়ের।

মায়ের?

হ্যাঁ, মায়েরই তো। বাপ তো শুধু বাপ. তার কোন সম্পত্তি থাকে না।

বাপ তো শুধু বাপ, এ আবার কেমন কথা? একজন তার কথাটা আপাতত মেনে নিয়েই প্রশ্ন করে, আচ্ছা, না হয় মায়েরই সম্পত্তি, কিন্তু মায়ের পর সেই সম্পত্তি ভোগ করে কে?

কেন, তার মেয়েরা।

আর ভাইরা কি পায়?

ভাইরা আবার কি পাবে! তারা তো যে-যার শ্বশুরবাড়িতে বউর কাছেই থাকে।

বউব কাছে থাকে ! বাঃ খাসা কথা ! আর বউ যদি তাড়িয়ে দেয় ?

তাড়িয়ে দেবে কেন ? সমাজের পাঁচজন আছে না ? তারা দেখবে না ? তোমবা কি কথায় কথায় তোমাদেব বউদের তাড়িয়ে দাও ? আর যদি দেয়ই, তাতেই বা কি ? আর এক জায়গায় বিয়ে করে সেখানে থেকে যাবে।

বেশ কথা, আর ছেলেমেয়েরা ?

ছেলেমেয়েবা তাদেব মায়ের কাছেই থাকবে। মা তাদের পেটে ধরেছে, পুরুষরা তো আর তাদের পেটে ধরে নি।

এসব উত্তব শুনে প্রশ্নকারীদের মাথা ঘুরে যায়। ব্যাপারটা তাদের ধারণার মধ্যেই আসতে চায় না। মেয়েরা আব্বনকে ডেকে খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করে। এসব কথা শুনে তারাও থ খেয়ে যায়। পুরুষ আর মেয়ে সবাই কপালে চোখ তুলে বলে, এ আবার কোন দেশী নিয়ম রে বাবা ! এমন উজবুগের দেশও আছে !

পাগল বল, আহাম্মক বল, ব্যক্তিগত ভাবে যাই বলে গাল দাও না কেন, আব্বন সহজে তা গায়ে মাখে না। এ বিষয়ে তার অসীম ধৈর্য। কিন্তু দেশের উপর ঠেস দিয়ে কথা বললে সে চটে ওঠে। বলে, এটাই তো নিয়ম, আসল নিয়ম। তোমরাই তো এখানে উলটো নিয়ম চালাচ্ছ।

আগেকার দিনে এসব নিয়ে অনেকের সঙ্গে অনেক আলাপ হয়ে গেছে। তারা কেউ উড়িয়ে দিয়েছে, কেউ বা এই নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তাই আব্বন আজকাল এসব কথা নিজে থেকে তো তোলেই না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে যায়। তবে সুদাসের কথা স্বতন্ত্র। সে যা-কিছু বলে, সুদাস সবই বিশ্বাস করে। অবশ্য তার অনেক কথাই সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু যা বোঝে না, তাও সে বিশ্বাস করে। আর তাই আব্বনও তার মনের যত কথা তার কাছেই খুলে বলে।

সুদাস মাঝে মাঝে বলে, বাড়ির জন্য মন যখন এতই ছটফট করে তখন এখানে আটকে পড়ে আছ কেন ?

হ্যাঁ, আমাকে ওরা যেতে দেবে কিনা। ওরা-যে আমাকে একটা ষাঁড়ের বদলে কিনে নিয়েছে। দাম তো আর বড় কম দেয় নি। একটা পুরো ষাঁড়ই দিয়েছে।

দিয়েছে তো দিয়েছে, তোমার তাতে কি ? তোমাকে তো আর দেয় নি। আমি বলছি, গায়ে শক্তি সামর্থ্য থাকতে থাকতে এখনও তুমি পালাও। তুমি চলে গেলে আমার খুব দুঃখ হবে, কিন্তু তার আর কি করা ! তাই বলে তুমি তোমার আপন জনের কাছে যাবে না ?

আব্বন বলল, যা বলেছ ঠিক কথাই বলেছ। যদি পালিয়ে যাই, আমাকে ধরে রাখবে কে ? কিন্তু যাব কোথায় ? সে দেশ কি এখানে রে ভাই ? এখানে আমরা আছি পৃথিবীর এক প্রান্তে, আর আমাদের সেই অরট্ট দেশ আর এক প্রান্তে। তার পরেই পাহাড়। সেই পাহাড় আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। এটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীর। তার পরে আর পৃথিবী নেই। কোন দিকে সেই দেশ, তাও তো ভুলে গেছি। কেমন করেই বা মনে থাকবে, আমাদের দেশে যেদিক দিয়ে সূর্য উঠত, এখানে তো সে দিক দিয়ে ওঠে না।

বাঃ, সেখান থেকে আসতে পেরেছ, আর ফিরে যেতে পারবে না ? আসবার সময় কি চোখ বুজে এসেছিলে ?

সুদাসের এই অনভিজ্ঞতায় আব্বন হাসল। হেসে বলল, তুমি তো এইটুকুন জায়গার মধ্যে আটকে রইলে চিরকাল। পৃথিবীখানা যে কি, সে আর তুমি কেমন করে বুঝবে ? এই গোকর্ণ প্রদেশের বাইরে পা বাড়াও একবার, তখন বুঝবে পৃথিবী কাকে বলে। তার কত-যে দিক, আর কত-যে পথ, তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে ? দিক পথ ভুলে গিয়ে তুমি ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে মরবে। শেষে ঘুরতে ঘুরতে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলে সেখানেই আবার ফিরে আসবে।

এর নাম পৃথিবী। কেন, মনে নেই, সেবার বনের মধ্যে পথ হারিয়ে কেমন ঘোরাটা ঘুরেছিলে?

আহা, সে তো ঋভুরা পেছনে লেগেছিল বলে। তা না হলে কখনও অমন হয়!

ওসব তোমাদের ভুল কথা। ঋভু-টিভু কিছু নয়। ঋভু তো তোমাদের দেশে, আমাদের ওখানে ঋভু নেই। তবে আমাদের ওখানে অমন হয় কেন? আসল কথা কি জান, এ হচ্ছে পৃথিবীর জাদু। আগে মানুষের স্বভাব ছিল, তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকত না, কেবল এ-দেশ থেকে ও-দেশ, আর ও-দেশ থেকে সে-দেশে ঘুরে ঘুরে ফিরত। পৃথিবী বলল, তোমরা এক জায়গায় থিতু হয়ে ঘর-সংসার কর। যে-যার জায়গায় শান্তিমত থাক। এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে মরবার কি দরকার? আমি কি তোমাদের খেতে দিতে পারি না? যারা থিতু হয়ে বসবে, তারা খেতে পাবে। কিন্তু পৃথিবীর কথা কেউ মানল, কেউ মানল না। তাই পৃথিবী তার জাদু মন্তর ছাড়ল—

আপন দেশে ফেলে পা
যথায় ইচ্ছা তথায় যা।
নিজের মাটি ছাড়লে তবে
পথ হারিয়ে মরতে হবে।

আব্বন বুড়ো যা তা লোক নয়, তার থলিটা জ্ঞানের কথায় বোঝাই। আর যে যা-ই বলুক না কেন, সুদাস তার মূল্য বোঝে।

সুদাস বলল, আমরা তো থিতু হয়েই আছি।

সেজন্যই তোমরা সুখে আছ। মায়ের কথা যে শোনে, মা-ও তার কথা শোনে। তাই পৃথিবীও তোমাদের দু' হাত ভরে দেয়।

এর নাম দু' হাত ভরে দেওয়া। সুদাস অবাক হয়ে ভাবতে থাকে।

আব্বন বলে চলে, আমাদের দেশের মানুষ এ কথাটা বোঝে না।

বেশী দিন এক জায়গায় ওদের মন বসে না। একখানে ডেরা বেঁধে বসল, থাকল কিছু দিন, তার পরই শুরু হোল মন ছটফটানি। ব্যস্, ভাঙো ডেরা, চলো আবার আর এক জায়গায়।

এমন করে ছুটোছুটি করলে কৃষিকর্ম কেমন করে চলে?

সেই তো কথা। সেজন্যই তো আমাদের জাতের এত দুর্গতি। হাল নেই, বলদ নেই—এর নাম কৃষি? কৃষিকর্ম মেয়েদের কাজ। তারা খুরপি দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে বীজ বোনে, চারা লাগায়। ফসল অবশ্য ফলে, কিন্তু তাতে কি আর ক্ষিদে মেটে!

মেয়েরা কৃষিকর্ম করে! কেন? পুরুষেরা কি করে তবে?

পুরুষেরা? তারা তীর-ধনুক আর বল্লম দিয়ে বনের জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, গুলতি দিয়ে পাখি মারে, ফাঁদ পেতে খরগোস ধরে, শিয়াল ধরে, গর্ত খুঁড়ে নেউল, সজারু, ইঁদুর ধরে, নদী থেকে মাছ, কাছিম, কাঁকড়া ধরে। কিন্তু এত করেও আমাদের অভাব আর মেটে না।

সুদাস আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, পুরুষেরা কৃষিকর্ম করে না কেন? তোমাদের হাল-বলদ নেই কেন?

এ প্রশ্ন আব্বনের নিজেরও প্রশ্ন। গোকর্ণ প্রদেশে এসে পুরুষদের কৃষিকর্ম করতে দেখে সে বিষম চমকে গিয়েছিল। শুধু চমকানো নয়, আতঙ্কও দেখা দিয়েছিল তার মনে। এ কেমন দেশ, কাদের মাঝখানে এসে পড়ল সে! পরে যখন তাকে কৃষিকর্মে লাগানো হোল, সে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল, কান্নাকাটিও করেছিল। কিন্তু তার আপত্তি টিকল না। কৃষিকর্ম মেয়েদের কাজ হলেও এখানকার আর সব পুরুষদের মত তাকেও কৃষিকর্ম শিখতে হোল। তারপর দিনের পর দিন এই কাজ করতে করতে তার ভয় কাটল, আপত্তি কমতে লাগল, আর এখন তো ভালই লাগে এ কাজ করতে। এখন সে প্রায়ই নিজের মনে জল্পনা করে, তাদের দেশের পুরুষেরা কৃষিকর্ম করে না কেন? তার বিশ্বাস ছিল, মেয়েদের হাতে জাদু আছে। ওরাই জানে কেমন করে মাটির গর্ভ থেকে শস্য প্রসব করাতে হয়। পুরুষ

কেমন করে তা পারবে! আর এখন সে তার নিজের সৃষ্টি এই সোনা-ঝরা শস্যগুলির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, আর গর্বে ভরে ওঠে তার মন।

সুদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিষেধ আছে। তাঁরা পুরুষদের কৃষিকর্ম করবার অধিকার দেন নি।

সুদাসের মাথায় এ কথাটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না। সে ভাবতে থাকে, কেমন সেই অরট্ট দেশ, আর কেমন সেই দেশের মানুষেরা। অথচ আব্বন তো ঠিক তাদেরই মত।

এই ছুটোছুটি করে মরবার স্বভাবটাই হোল আমাদের কাল, বলে চলে আব্বন, আর এরই জন্য আমাদের এই দুরবস্থা। এরই জন্য আমাকে নিজের দেশ ছেড়ে, সমাজের লোকদের ছেড়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী, বউ আর শ্যালীদের ছেড়ে, বউর কোলের সেই বাচ্চা ছেলেটাকে ছেড়ে এইখানে—পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে পড়ে থাকতে হচ্ছে। মরতেও হবে এখানেই। মরবার পরেও আমার জ্ঞাতি-গোত্রের লোকেরা যেখানে মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে, তাদের পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতে পারব না।

সুদাস দেখল, আব্বনের চোখ দুটো ছলছল করছে।

তোমাকে ওরা কেমন করে নিয়ে এল, প্রশ্ন করেছিল সুদাস।

আব্বন বলেছিল, আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই যদি থাকতাম, তা হলে কি আর আমার আপন জনদের ছেড়ে এখানে আসতে হোত! সেই জায়গা ছেড়ে আমরা যাত্রা করলাম নতুন জায়গার খোঁজে। দু'দিন দু'রাত্রি চলবার পর একটা নদীর ধারে বেশ মনোমত জায়গায় আমরা ডেরা বাঁধলাম। কিন্তু তার পাশেই আর এক জাতের লোক বাস করে, তা তো আর আমরা জানি না। আমাদের দেখেই ওরা দল বেঁধে তাড়া করে এল। তখন দু'পক্ষে লাগল লড়াই। কিন্তু ওদের লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। আমরা হেরে গেলাম। আমাদের মধ্যে অনেক লোক মারা পড়ল। অনেকে

নদী সাঁতরে ওপারে পালিয়ে গেল। আর আমরা ক'জন ওদের হাতে ধরা পড়লাম। ভেবেছিলাম মেরেই ফেলবে, কিন্তু ওরা মারল না। আমাদের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে দাসের বাজারে নিয়ে আমাদের বিক্রি করে দিল। তারপর কত হাত থেকে কত হাতে ঘুরতে ঘুরতে শেষে এখানে এসে পড়েছি। এভাবে কত গ্রাম, কত নগর, কত বন, কত নদী পেরিয়ে এসেছি, তাদের নামও তো জানি না। যে-পথ দিয়ে এসেছি, সে পথ আমি কেমন করে খুঁজে পাব? আর খুঁজেও যদি পাই তাতেই বা কি? তাদের আমি খুঁজে পাব কোথায়? এত বড় এই পৃথিবীর কোন এক কোণায় তারা তাদের ডেরা বেঁধে বসেছে, কে আমাকে বলে দেবে? কাকেই বা আমি শুধাব?

সুদাস এবার বুঝল, আব্বন ঠিক কথাই বলেছে। এর কোন সমাধান নেই, এ নিয়ে ভেবেও কোন লাভ নেই। তবুও ওরা দু'জন একত্র হলে এসব কথাই ঘুরে ঘুরে আসে। আব্বনের মনে আরও কত কথা জাগে, যে-কথা সে মুখে প্রকাশ করে না। যা কখনও হতে পারে না, তাও যদি হয়—ওদের সঙ্গে যদিই বা দেখা হয়ে যায়, ওরা কি তাকে চিনবে, ওরা কি তাকে নিজেদের মানুষ বলে গ্রহণ করবে? তার বউ তার নতুন স্বামী আর কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার করছে, সে তো তার দিকে মুখ ফিরেও তাকাবে না! তবে, কি হবে ফিরে গিয়ে?

ওদের কুঁড়ে ঘর থেকে একটু দূরেই বন। সেই বনের দিক থেকে একটা চিলের ডাক শোনা গেল। সুদাস আর ইদা চমকে উঠল সেই ডাক শুনে। ওরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। পরক্ষণেই ইদা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সুদাস কথা বলতে বলতে উঠল। আব্বনও তার সঙ্গেই উঠল। ওরা দু'জন কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আব্বনকে বিদায় দিয়ে সুদাস ফিরে এসে দেখল সাত্যকি আর ইদা বসে কথা বলছে। সাত্যকির কোলে খেতু।

সুদাস সাত্যকিব সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। সাত্যকি তার মাথার উপর হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করল।

খবর কি?

সুদাস বলল, খবর ভাল না। স্থানিক আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করে দিয়েছে।

কি করেছে?

মহৎকে ডাকিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝেই শাসানি দিচ্ছে।

কি বলছে?

সেদিন বলেছে, তোমরা বড় বেশি বদমাইস হয়ে উঠেছ। এবার সব ব্যাটাকে টিট্ করব। এক ব্যাটাও পার পাবে না।

তারপর?

মহৎ বলল, কর্তা, আমরা কি করলাম, আপনি এত রাগ করছেন কেন?

স্থানিক বলল, আহা, কিছুই জানেন না! বলির ব্যাপারটা নিয়ে এত গোলমাল করল কারা?

গোলমাল? গোলমাল আবার কিসের? বলির ব্যাপার নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে কান্নাকাটি করলাম, শুনে আপনাদের দয়া হোল, আপনারা আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন—এই তো ব্যাপার।

স্থানিক মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, ওসব বাজে কথা রাখো। এখন যে-কথা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। বলি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লোকগুলিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল কারা? তোমরা মহৎরা তো বলি-বৃদ্ধিতে রাজি হয়েই গিয়েছিলে, শেষে আবার বেঁকে বসলেই বা কেন?

তারপর স্থানিক একটু নরম সুরে বললেন, এটা বোঝ না কেন, তোমরা হলে মহৎ, তোমরা সমাজের মাথা, সমাজের লোক যদি তোমাদের মতে না চলে, একটা আলাদা 'মত খাড়া করে তোলে, তা হলে কে তোমাদের মহৎ বলে মানবে? আমরা জানি, শূদ্রেরা লোক খারাপ নয়। কেবল কতগুলি পাজি মাঝখানে পড়ে গোলমালটা পাকাচ্ছে। তাদের নাম ক'টা বলে দাও: আমরা একটু শায়েস্তা করে দিই। মাঝে মাঝে একটু শাসন না পড়লে এইসব লোক

বিগড়ে ওঠে, আর একটা লোকের জন্য দশটা লোক ফল ভোগ করে। আমরা শুনেছি ওরা নাকি রাজার বিরুদ্ধেও প্রচার করেছিল।

মহৎ বলল, না, কর্তা, না, রাজার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে নি। আপনারা ভুল শুনেছেন। আমরা গরীব মানুষ, আমরা আমাদের মনের দুঃখ জানিয়েছিলাম।

সাত্যকি বলল, স্থানিক আর কি কথা বললেন?

কথায় কথায় স্থানিক বলছিলেন, তোমাদের এই চিল দেবতাটি আবার কবে থেকে গজালো? এর নাম তো কখনও শুনি নি আগে। তোমাদের নিত্য নতুন দেবতার সৃষ্টি হচ্ছে নাকি? তোমাদের এই চিল দেবতাটিকে জালে ফেলতে না পারলে আমাদের সোয়াস্তি নেই। সুদাস হাসতে হাসতে কথাটা বলল। ইদাও হাসল।

সাত্যকিও একটু হেসে বলল, বটে! পরে একটু চিন্তিত কণ্ঠে বলল, হাসবার কথা নয়। ওরা ভিতরে ভিতরে একটা মতলব ফাঁদছে। একটু চাপে পড়ে ওরা বলিবৃদ্ধিটাকে বন্ধ করেছে। কিন্তু এত সহজে ছাড়বে না। শুনতে পাচ্ছি, ওরা নাকি নতুন এক কর ধার্য করবার মতলবে আছে।

সুদাস বলল, আমরাও কানাকানি সেই কথা শুনতে পাচ্ছি। কথাটা শুনে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আজকাল কারুর মনে ভয়ডর নেই, সবাই বলে বেড়াচ্ছে, ওসব কর-ফর আমরা দিতে পারব না। ওরা দেখুক না একবার চেষ্টা করে। আমাদের চিল দেবতা সহায় থাকতে আমাদের আর ভয়টা কি?

সাত্যকি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, সর্বনাশ, চিল দেবতার উপর ভরসা করে বসে আছে, তা হলেই হয়েছে।

সুদাস হেসে বলল, হ্যাঁ, চিল দেবতার উপর আমাদের ভরসা আছে। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, তবে আব কাউকে আমরা ভয় করি না। আমাদের শূদ্রদের গায়ে জোর আছে, কিন্তু মাথা তো নেই।

বারো

গুরুদেব রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছেন, তাঁর সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য!

কেন কি হয়েছে? ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সেনাপতি।

কি হয়েছে? কি হয়েছে? আরও পাঁচটা মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনে।

শ্রুতকীর্তি উত্তর দিল, রাগ করবার তো কথাই। গুরুদেব প্রথমেই আমাদের বলেছিলেন, দেখ, আমি রাজসভায় কদাচিৎ যাই। রাজসভায় যাদের যাতায়াত তাদের কম লোকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। তোমরা এই গুপ্তচরকে চেন? তোমরাই বল এ লোক বিশ্বাসী তো? এ লোকের কথার উপর নির্ভর করতে পারা যায়?

আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমরা জানি, এ লোক বিশ্বাসী।

গুরুদেব আবার প্রশ্ন করলেন, বিশ্বাসী—কার প্রতি বিশ্বাসী, রাজার প্রতি না মন্ত্রীর প্রতি? প্রশ্ন শুনে আমরা একটু থতমত খেয়ে গেলাম, তাই তো, এও তো একটা কথা। রত্নসেন তোমার মনে আছে, তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে উত্তর দিয়েছিলে, গুরুদেব, আমি ভাল করে জানি এ রাজার প্রতিই বিশ্বাসী। গুরুদেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। আমরা মৌনভাবে রত্নসেনকে সমর্থন জানালাম।

গুরুদেব বললেন, আমার কিন্তু একটু সংশয় থেকে গেল। গুপ্তচর তার বিবরণটা উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রী সেই বিবরণটাকে যে-ভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে নিলেন, তাতে একটু সন্দেহের উদ্রেক করে বই কি। আমি নিজে রাজসভায় উপস্থিত ছিলাম না, তোমাদের মুখ থেকে যা শুনেছি, তাই থেকেই আমি বলছি।

আমরা শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম। কিছুদিন কেটে গেল, কিন্তু দেবগৃহ থেকে আক্রমণের কোন আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। গুরুদেব একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন, রাজ্যের অবস্থা কি, বল। আমি উত্তর দিলাম, শত্রুদের প্রতিরোধ করবার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলছে।

সে তো জানি। কিন্তু সে কাজের দায়িত্ব রাজার আর সেনাপতির। তোমার কাজ তুমি করেছ?

আমার কাজ? কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

দেবগৃহে আমাদের নিজস্ব গুপ্তচর পাঠানো হয়েছে?

তাঁর এই কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম, আপনি তো আমাকে সে রকম নির্দেশ দেন নি। গুরুদেবের মুখে অসন্তোষের কুটিল রেখা ভেসে উঠল। তিনি বললেন, নির্দেশ দিই নি, তা ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে এই প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছিলাম, তার পরেও তোমার মনে হোল না যে, এ সন্দেহটা পরিষ্কার করবার জন্য আরও একজন গুপ্তচর পাঠানো দরকার? এই বুদ্ধি আর দূরদর্শিতা নিয়ে তোমরা রাজ্য চালাবে?

যাও, অবিলম্বে লোক পাঠাও। আরও তিনি বলে দিলেন, সেই গুপ্তচরের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য কয়েকজন ছদ্মবেশী পুরুষকে নিয়োগ কর, যারা তার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না করে তার গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখবে। আর খুব সাবধান, সঠিক উত্তর না আসা পর্যন্ত আগেকার সেই গুপ্তচর যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারে।

চিত্ররথ, এই কাজের ভার আমি তোমার উপর দিয়েছিলাম তোমার লোকেরা ঠিকমত কাজ করছে তো?

আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি উপযুক্ত লোক নিয়োগ করেছি। তার সাধ্য নেই যে, সে এদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পালাবে।

এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোনই লাভ হবে না, তোমাদের যা বক্তব্য, গুরুদেবের কাছেই বোলো।

উষস্তি চাক্রায়নের নাম শুনলে চিত্ররথের মুখ শুকিয়ে যায়। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, তার মানে? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না? সেই গুপ্তচর তার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

অসম্ভব! লাফিয়ে উঠল চিত্ররথ।

লাফিয়ো না, বোসো। আমি নিজে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, সেই গুপ্তচর কয়েক দিন থেকে নিরুদ্দেশ। আমি এই খবর পেয়ে তোমার নিযুক্ত সেই উপযুক্ত লোকদের কাছে যেতে তারা আমায় জানাল যে, সেই লোকের সাধ্য নেই যে, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাবে। তোমার সেই উপযুক্ত লোকেরা একে অপরের উপর ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

চিত্ররথ এর পর আর কোন কথা বলতে পারল না।

শ্রুতকীর্তি বলল, এর চেয়েও বড় সংবাদ আছে। আমাদের গুপ্তচর দেবগৃহ থেকে ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছে! কি সংবাদ নিয়ে এসেছে সে? সবাই এক সঙ্গে কথা বলে উঠল।

ওদের সম্পর্কে প্রথম গুপ্তচর যা বলেছিল, তার প্রায় সবটাই ঠিক, কেবল একটা কথা ছাড়া। গোকর্ণ প্রদেশ আক্রমণ করবার কোন অভিসন্ধিই এদের নেই। ওদের লোকসংখ্যা এতই কম যে, ওরা সে কথা ভাবতেও পারে না।

ওরা বিস্ময়ে কলরব করে উঠল। খুবই সুখবর সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ ওরা এটাকে সুখবর বলে মনে করতে পারছে না। মন্ত্রীর চক্রান্তের ফাঁদে ওরা সবাই পা দিয়েছে। বৃদ্ধ শকুনীর মত স্থবির মন্ত্রী রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে নাচিয়ে ছেড়েছে।

আব্বন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, তোমরা সতর্ক থেকো, বুঝে-শুনে চলো, ওরা কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে বিষম ষড়্‌যন্ত্র আঁটছে।

ওরা? ওরা আবার কারা? কিসের ষড়যন্ত্র? একটা গাছের ডাল কাটতে কাটতে প্রশ্ন করল সুদাস।

এই দেখ, ওরা কারা, এখনও সেই কথা জিজ্ঞেস করতে হয়! এই তো, এই মাত্র সব কথা শুনে এলাম। বৈশ্যপল্লীতে সবাই এসে সভা বসিয়েছে আমার প্রভুর বাড়িতে। শ্রুতকীর্তি এসেছে, আরও কে কে এসেছে। তোমাদের কথাই হচ্ছে গো। তোমরা নাকি রাজবিদ্রোহী হয়েছ। বলি দেবে না, কর দেবে না, আরও যাদের ধন-সম্পদ আছে, সব লুটে-পুটে নেবে, এই সমস্ত বলছে। এসব কথা শুনে সমস্ত বৈশ্যেরা বিষম ভয় পেয়ে গেছে।

বৈশ্যেরা বলছে, আমাদের জন্য ভাববেন না। গুরুদেব যা বলেন, আমরা তাতেই বাধ্য আছি। আমরা সকল ভাবে আপনাদের সাহায্য করব। আসল কথা এবার ওদের খুব ভালমত ছ্যাঁচা দেওয়া চাই, যাতে আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারে। ওদের বড় বাড় বেড়ে গেছে।

আমাদের কথা বলছিল, কেমন করে বুঝলে? ওদের নিজেদের মধ্যে অনেক ঠেলাঠেলি কামড়াকামড়ি। এটা নিয়ে ওটা নিয়ে, কত রকম-যে ঝগড়া—ঝগড়ার বাসা।

আরে না না, তোমাদের নাম করে বলল যে। তোমার নামটাও বারে বারেই বলছিল।

আর কি বলল?

কত কথাই তো বলল, সব কথা কি আমি বুঝি? তবে শ্রুতকীর্তি বলছিল, আমাদের মধ্যে এমন কিছু কিছু লোক আছে, যারা ওদের পেছন থেকে উস্‌কানি দিচ্ছে।

বৈশ্যেরা বলল, হাঁ, হাঁ, ঐগুলিকেই আগে ঠাণ্ডা করে নেওয়া দরকার। তারা আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনারা কাজে লাগুন, আমরা আপনাদের পেছনে আছি।

এসব কথা বলতে বলতে একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। সে বলে উঠল, তোমাদের এখানে এমন কেন গো? কেবল ঝগড়াঝাঁটি আর কে কেমন করে কাকে জব্দ করবে এই চিন্তা। আর তোমাদের তো ওরা মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের ওখানে কিন্তু এসব ছিল না। কাটাকাটি মারামারি কখনও কখনও আমরাও করি। কিন্তু যা করার অন্যের সঙ্গে করি, নিজেদের মধ্যে করি না।

সুদাস বলল, আমাদের এখানে চিরকাল এই রকম চলে আসছে। নরম মানুষ পেয়ে ওরা সব সময় আমাদের চেপে রাখে।

তোমরা শুধু নরম নও, বোকাও। লোকে আমাকে বলে বোকা, নির্বোধ। কিন্তু আমার চেয়েও তোমরা আরও বেশী বোকা।

কেন, বোকার কি দেখলে?

বোকা নয়? ওরা তোমাদের বুঝিয়ে রেখেছে, তোমরা সবাই এক জাতি; আর তোমরাও তাই সত্যি বলে মনে করে আসছ। সাদায় কালোয় কি কখনও এক জাতি হয়? ওদের সঙ্গে তোমাদের কোন দিক দিয়ে কোন মিল নেই, না চেহারায়, না চলনে। তবু তোমরা বলবে যে, তোমরা আর্য। মিলিয়ে দেখ একবার, ওদের চেয়ে আমার সঙ্গে তোমাদের মিল বেশী।

সুদাস এই কথাটা কিছুতেই মানতে চাইল না। বলল, না, না, আমরা আর্য। এ কি আজকের কথা? সৃষ্টির সেই গোড়া থেকেই আমরা আর্য। দেখ না, আমরা আর্য ভাষায় কথা বলি।

আর্য ভাষায় কথা বললেই আর্য হোল? আমিও তো এখন আর্য ভাষায় কথা বলি, তাই বলে আমি কি আর্য? আচ্ছা, ও কথা থাক এখন, আর এক কথা বলি। তোমরা কালো শূদ্রেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী দলে ভারী। তবে ওরা কি করে তোমাদের এমন জব্দ করে রাখে?

দলে ভারী হলে কি হবে? আমাদের-যে বিদ্যা-বুদ্ধি নেই। ওরা

আমাদের বলে—পশু। কথা তো মিথ্যা নয়। পশুর মতই হয়ে আছি আমরা। ওরা আমাদের পশুর মত করেই রেখেছে।

আপন মানুষ হলে কি কখনও এমন করে? আমি তো আগেই বলেছি, সাদা আর কালো, এরা কখনও এক জাতি হতে পারে না। আমার কি মনে হয় জান? ওরা নিজেদের কাজের জন্য যেমন গরু পোষে, ঘোড়া পোষে, কুকুর পোষে তোমাদেরও তেমনি করে পোষে। তোমরা আর্যদের কাছে গরু, ঘোড়া আর কুকুরের মতই।

সুদাস বলল, খাঁটি কথাই বলেছ। কিন্তু হাওয়াটা এবার বদলে যাচ্ছে। লোকে বলাবলি করছে, রাজা নাকি-আরও একটা কর চাপাবে আমাদের উপর। এদিকে ঠেলা খেয়ে বলিবৃদ্ধি করতে না পেরে আর এক দিক দিয়ে আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু কথাটা শোনা মাত্রই মানুষ একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। বুড়োদের ঠাণ্ডা কথা এখন আর কেউ শুনতে চায় না। যুবকদের কথাই এখন বিকায় বেশী।' সবাই বলে, বলিবৃদ্ধির সময়ও তো বুড়োরা কত রকম করে ভয় দেখিয়েছিল! কিন্তু যুবকদের ঠেলায় শেষপর্যন্ত বলিবৃদ্ধি বন্ধ করতে হোল তো। লোকে বলছে, সমাজের বিচারে-আচারে বুড়োদের কথা আমরা মানি, মানবও। কিন্তু আজকালকার দিনে রাজার সঙ্গে গোলমাল বাধলে বুড়োদের নরম কথায় কাজ চলে না। যুবকেরা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, ওদের কর ধার্য করতে হয়, যত খুশী করুক, আমাদের আপত্তি নেই। তবে যখন আদায় করতে আসবে, তখন বোঝা যাবে, তখন দেখা যাবে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা। এ শুধু কথার কথা নয়, ঘরে ঘরে হাতিয়ার তৈরি করছে সবাই।

বলতে বলতে থেমে গেল সুদাস। ওর মনে হোল, এসব কথা বলাটা ওর উচিত হয় নি। আকান অবশ্য বিশ্বাসী লোক, তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করবে না। কিন্তু কথায় কথায় সরল মনে বিরুদ্ধ পক্ষের লোকের কাছে এসব কথা যদি আগেই ফাঁস করে বসে, তবে তার ফলটা ভাল হবে না।

আব্বনকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, তুমি আপন মানুষ বলেই তোমার কাছে এসব কথা বললাম, কিন্তু খুব সাবধান, এসব কথা কারু কাছে প্রকাশ করবে না—কারু কাছে না।

আরে না না, পাগল নাকি তুমি, আমি কেন এসব কথা বলতে যাব? আমি বোকা বলে কি এতই বোকা?

দেখ উলুপী, তোকে নিয়ে পড়েছি এক বিষম সমস্যায়।

কি রানীমা, সমস্যাটা কি? উলুপী প্রশ্ন করল।

এ পক্ষ ও পক্ষ দু' পক্ষই তোকে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি তুই কোন্ পক্ষে কাজ করছিস্, সে বিষয়ে কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যাবে? এই দুই পক্ষেব বাইরেও আবার একটা তৃতীয় পক্ষ আছে কিনা, তাই বা কে জানে;

এটা তোমার ছলনা। আমি-যে তোমার নিজের লোক, এটা তুমি বেশ ভাল করেই জান।

আমার নিজের লোক? আমি তোকে লাগিয়েছি এই কাজে, না তুই আমার পেছনে লেগেছিস্?

আমি এ-পক্ষও বুঝতাম না, ও-পক্ষও বুঝতাম না মা, আমি বুঝতাম একট' মানুষকে। তার জন্যই আমি এই পথে পা দিয়েছি। সে কথা তো তোমায় খুলেই বলেছি। তোমাদের এই সব রাজরাজড়ার কারবার বড় কঠিন ব্যাপার। এর মধ্যে কোন্টা ভাল আর কোন্টা মন্দ, এত সব বুঝ-বিবেচনা কি আর আমার আছে! সে যেটা ভাল বলে, আমি তাকেই ভাল মনে করি। সে বলল, তাই আমি এলাম। কিন্তু মা, সে তো তোমার পক্ষেরই লোক।

সাত্যকি তোর কে, সেইটে আগে শুনি?

ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

সুদক্ষিণা হেসে বলল, নির্ভয়ে বল। তুই তো বড় বড় মহলে

ঘোরাফেরা করিস্। এ-পক্ষ আর ও-পক্ষ দু' পক্ষের লোককেই তুই চড়িয়ে খাচ্ছিস্। আমি তো সামান্য রানী মাত্র। আমাকে তোর ভয়টা কি ?

না গো না, বড় সামান্য লোক তুমি নও। শুনতে পেলাম স্বয়ং উষস্তি চাক্রায়নের দৃষ্টি নাকি তোমার উপর পড়েছে।

ও বাবা, শনিগ্রহের দৃষ্টি। কেন, আমার উপর আবার তাঁর দৃষ্টি কেন পড়ল ?

কেন, তা তোমরাই জান। তিনি তোমার চলাফেরা সম্পর্কে নজর রাখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি নাকি এখানে সেখানে গিয়ে কি সব গোলমাল পাকাবার চেষ্টায় আছ।

উষস্তি চাক্রায়ন বলেছেন, রাজরানীর স্থান রাজ-অন্তঃপুরে, যেখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করলে তাঁর মর্যাদা হানি ঘটে। জান, এখন তুমি সারা দিন কি কর না কর তার রোজকার হিসাব আমাকে রোজ বুঝিয়ে দিতে হয়। আর তুমি বলছ কিনা, তুমি সামান্য রানী মাত্র। সামান্য লোকের গতিবিধির জন্য উষস্তি চাক্রায়নের মত মানুষ এত উদ্বিগ্ন বোধ করবেন কেন ?

বাঃ, দিব্যি কথা বলতে শিখেছিস্ তো। কিন্তু রোজকার হিসাব বুঝে নেয় কে ?

কে আর নেবে, শ্রুতকীর্তি নিজেই।

কেন, উষস্তি চাক্রায়ন নিজে কিছু বলেন না ?

ও বাবা, আমার মত লোকের সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন! তবু ভাল যে, তিনি দয়া করে দেখা দেন না। তাঁর ওই বাঘের মত চোখ দুটোর সামনে পড়লে বড় বড় বীর পুরুষদেরও নাকি প্রাণ কেঁপে ওঠে। আমি তো আমি। কে জানে, হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার পেটের কথা খুঁচিয়ে বার করে নিয়ে আসত। ওই চোখের দিকে তাকালে মানুষ নাকি মিছে কথা বানিয়ে বলতে পারে না।

লোকে এতই ভয় করে তাঁকে? কেন, শুধু ওই চোখ দুটোর জন্যই?

ওই চোখ দুটোই তো সর্বনেশে গো। লোকে বলে, তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কত লোক নাকি ভস্ম হয়ে গেছে।

সেই কত লোকের মধ্যে দু'এক জনের নাম বলতে পারিস্?

তা তো জিজ্ঞেস করে রাখি নি মা। আর সে-সব নাম দিয়ে আমার দরকারটাই বা কি?

তুই বিশ্বাস করিস্ এসব কথা?

এত লোক বিশ্বাস করে, আর আমি এমন কোন্ দরের মানুষ যে, তা অবিশ্বাস করতে যাব? এসব ব্যাপারে অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করাটাই ভাল। হঠাৎ একটা বিপদে পড়তে হয় না।

আচ্ছা, সে কথা থাক, এখন বল দেখি, আমার কাজের হিসাব কেমন করে দিস্ তুই?

ঐটেই তো মুশকিলের কথা মা। তোমার যা দুঃসাহস, বাধা দিলে মানবে না, যা করবার তা করবেই। আর তার ঠ্যালা সামলাতে হয় আমাকে। নিত্য নতুন করে মিছে কথা বানাতে হয়। অবশ্য আমি যা বলি, শ্রুতকীর্তি তা মেনে নেয়। কিন্তু আমার গতিবিধি লক্ষ করবার জন্য আরও কোন লোক নিযুক্ত করা আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে। সাত্যকি তো বলে—

এই রে, হেসে উঠল সুদক্ষিণা, একটা কথা জিজ্ঞেস করে তার উত্তর না নিয়েই। কথায় কথায় কোথায় চলে এলাম।

কি কথা গো? অর্থপূর্ণ হাসি হাসতে লাগল উলূপী।

বল, সাত্যকি তোর কে?

ও, সেই কথা? সাত্যকি? সাত্যকি আমার ভালবাসার মানুষ।

ভালবাসার মানুষ? ও বাবা, তোদের আবার ভালবাসার মানুষও থাকে নাকি?

উলূপী গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল। সুদক্ষিণা তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে হেসে উঠল, কি লো, রাগ করলি নাকি?

উলূপী বলল, না মা, রাগ কিসের? তুমি ঠিকই বলেছ, আমি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ, ভালবাসার কথা আমার মুখে মানায় না।

সুদক্ষিণা বুঝল, কথাটা এভাবে বলা ভাল হয় নি। নষ্ট চরিত্রের মেয়ে উলূপী, সে কথা তার অজানা নয়। উলূপী নিজেই তাকে সে কথা খুলে বলেছে। কিন্তু উলূপীর সঙ্গে মেশার পর সে কথাটা যেন নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে গেছে। অতটা খেয়াল করে সে কথাটা বলে নি, কিন্তু কথাটা ওর মনে বড় লেগেছে। এমন হাসিখুশি মেয়েটা, একটা কথার ঘায়ে ওর মুখখানা কেমন হয়ে গেছে। বড় মায়া লাগল সুদক্ষিণার। অনেক মিষ্টি কথা বলে, গায়ে হাত বুলিয়ে সে ওর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

তুই ভালবাসিস্ সাত্যকিকে?

উলূপী হাসিমুখে মাথা নীচু করল। এ হাসির অর্থ, ও কথার পরেও আবার এই প্রশ্ন কেন?

সাত্যকি ভালবাসে তো তোকে?

উলূপী এবার আর হাসল না। একটু চিন্তা করল, তার পর শান্ত কণ্ঠে বলল, সে কথা তো জিজ্ঞেস করে দেখি নি মা।

ও মা, এ কথা কি আবার জিজ্ঞেস্ করতে হয় নাকি! এ কেমন তোর ভালবাসা?

উলূপী একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, সে যদি মুখ ফুটে এ কথা বলত, তবু তো এ কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না। সে-যে আমার কত উঁচুতে, আমি তো তার নাগাল পাই না। আর যারা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে, কেউ কি তাদের ভালবাসতে পারে? লোকে তাদের ঘরে আসে যায়, রাত কাটায়, কিন্তু তাদের ভালবাসে না।

সুদক্ষিণা বলল, তাই যদি হয়, তবে তুই-ই বা সাত্যকির পেছনে ঘুরে মরিস্ কি আশায়?

সে ছাড়া আমার আর কে আছে? আমি আর কার কাছেই বা যাব? দুঃখের সময় সে-ই তো আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভালবাসা? না, আমার মত মেয়েকে সে কেমন করে ভালবাসবে? কিন্তু তার মায়ায় ভরা প্রাণ। আমার জন্য তার বড় মায়া। এইটুকুই বেঁচে থাক। এর বেশী আশা করতে আমি সাহস পাই না।

সাত্যকিকে কোথায় পেয়েছিলি?

বছর কয়েক আগে সে প্রায়ই আমার কাছে আসত। সমাজে তখন তার বড় নিন্দা। বয়সের দোষে কেমন হয়ে গিয়েছিল। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশে জুয়া খেলত, মদ খেয়ে মাতাল হোত আর নিজের বউকে ফেলে আমার ঘরে এসে রাত কাটাত। এই ভাবে বছর কয়েক কাটল, তারপর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। ভাবলাম, আর বুঝি কোনদিন দেখা হবে না। কিন্তু আমি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারতাম না। বছর তিনেক বাদে হঠাৎ একদিন এসে দরজায় ঘা দিল, উলূপী, দরজা খোল, আমি সাত্যকি। ডাক শুনে আমার বুকে যেন ঝড় উঠল। কি যে কাঁপুনি উঠল আমার! কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। দেখি, সত্যিই তো, আমার শোনবার ভুল নয়, সাত্যকিই দাঁড়িয়ে আছে যে। সাত্যকি আমাকে দেখে হাসল।

দেখলাম, সে মানুষ আর সে মানুষ নেই। যেন একেবারে নতুন হয়ে এসেছে। এখন আর সে জুয়া খেলে না, মদ খায় না, আমার সঙ্গে দেখাশোনা করে কিন্তু এখন আর আমার সঙ্গে রাত কাটায় না আগেকার মত। কি হোল সাত্যকির? সব সময় কি যেন ভাবে। শুধাই, তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন কেন? নিজের কথা কিছুই বলে না, শুধু বলে শূদ্র পাড়ার ওদের কথা। একদিন বলল, উলূপী, আমি যদি শূদ্রের ঘরে জন্মাতাম, সেটাই ছিল ভাল। আর একদিন বলল, আমি যদি শূদ্র হতাম উলূপী, তুমি আমাকে তোমার ঘরে ঢুকতে দিতে, এমন করে আদর-আপ্যায়ন করতে? আমি বললাম, তুমি কি

পাগল হলে নাকি? এসব কি কথা! সাত্যকি এখন আর নিজের কথা কিছুই ভাবে না, কেবল পরের কথাই ভাবে। সে এখন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি তাকে যেমন ভালবাসতাম এখনও তেমনি ভালবাসি।

সুদক্ষিণা ধৈর্য ধরে তার কথা শুনছিল। উলূপী বলছিল, আমার মত মেয়েকে সে কেমন করে ভালবাসবে? কিন্তু আমার উপর তার বড় মায়া। ভালবাসা নয়, মায়া। এ মায়ার স্বাদ-গন্ধ কেমন? এ কি ভালবাসার চেয়ে কম মিষ্টি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল সুদক্ষিণা। সাত্যকির মায়ার স্বরূপটা সে বুঝতে চাইল।

সুদক্ষিণার মনে হঠাৎ একটা কথা জেগে উঠল। ভালবাসাই হোক আর মায়াই হোক, এই নষ্ট চরিত্রের মেয়ে তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। 'লোহা যেন সোনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজকন্যা রাজবধূ সুদক্ষিণা সেই স্পর্শ পেয়েছে কি কোনদিন? মনে পড়ল, তার প্রথম যৌবনের সেই কামনাঘন দিনগুলির কথা। এক তরুণকে কেন্দ্র করে সে মনে মনে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সাধারণ এক গৃহস্থ পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হতে পারে না, এ কথা সবাই মিলে তাকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিল। ভেঙে পড়ল সেই স্বপ্ন-সৌধ। তারপর রাজবধূ হয়ে এল এই গোকর্ণ প্রদেশে। আপনাকে উৎসর্গ করবার জন্য তৈরি হয়েই সে এসেছিল। কিন্তু তার তৃষিত প্রাণ এখানে এসে রানীর ঐশ্বর্য পেয়েছে, মর্যাদা পেয়েছে কিন্তু এক বিন্দু ভালবাসা পায় নি। বৃষকেতু এক জগতের আর সে অন্য জগতের— এই দুই জগতের মাঝে যেন যোগাযোগের পথ ছিল না। ওরা দু'জন দু'দিকে তাকিয়ে রইল। সুদক্ষিণা উলূপীর কথাগুলি শুনতে শুনতে ভাবছিল, এই রাজরানী আর ওই নষ্ট চরিত্র মেয়ে—এদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী ভাগ্যবতী?

কিন্তু এ কি করছে সে? এসব চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকবার এই কি'সময়? ভালবাসার স্বপ্ন—সে তো কবেই ভেঙে গেছে। সে তো

আর ফিরবার নয়। যে সঙ্কল্প নিয়ে নেমেছে সে, এখন সেই সঙ্কল্পকে জয়যুক্ত করে তুলতে হবে। রাজা বৃষকেতুকে উষস্তি চাক্রায়নের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সেই কূটচক্রী ব্রাহ্মণের ষড়্যন্ত্র ভেঙে চূর্ণ কবতে হবে। কিন্তু কে কাকে চূর্ণ করবে? দু'পক্ষের মধ্যে শক্তির প্রতিযোগিতা চলছে। এখন আর অন্য চিন্তার সময় নেই। সুদক্ষিণা বলল, যা উলূপী, শকট সজ্জিত করতে বল, আমি বেরোব।

যাদের যাদের আসবার কথা ছিল তারা সবাই এসে পৌঁছায় নি। কত রকম কারণ থাকতে পারে না আসার! অসুখ আছে, বিসুখ আছে, আপদ আছে, বিপদ আছে, হঠাৎ কত রকম বাধা-বিঘ্ন এসে পড়ে, এসব ব্যাপারে ফস্ করে সিদ্ধান্ত করে বসাটা ঠিক নয়। তা হলেও এ রকম জরুরী অবস্থায় জন দু'য়েক গুরুত্বপূর্ণ লোকের অনু-পস্থিতিটা অনেকের মনেই খটকা জাগিয়ে তুলল। ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

তা হলেও ক্ষত্রিয়দের এই গোপন সভায় যাঁরা এসেছিলেন, তাদের সংখ্যাও কম নয়। যাঁরা উপস্থিত তাঁদের নিয়েই সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। আবহাওয়া থম থম করছে, ঝড় উঠবার আগেকার অবস্থা। যে-কোন মুহূর্তে দুর্যোগ নেমে আসতে পারে, অনেকের চোখে-মুখেই সেই আশঙ্কার ছায়া ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাঁচা বয়সের যারা তারা বেপরোয়া। যার যা-মনের কথা চটাপট বলে চলেছে। প্রবীণদের মত একটা কথা বলবার আগে দশবার চিন্তা করে না তারা।

উৎসাহী তরুণ বসন্তক বলল, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ, এ তো নতুন নয় কিছু। অনেক রাজ্যের অনেক খবরই আমরা জানি। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কোনদিনই শেষপর্যন্ত ক্ষমতা হাতে রাখতে পারে না।

কেমন করে পারবে? রাজ্য শাসন করা আর রাজ্য রক্ষা করা ব্রাহ্মণের কাজ নয়। ভার্গবের কাহিনী আমরা সবাই জানি। কত ক্ষত্রিয় হত্যা, কত ব্রাহ্মণ হত্যা, কত নারী হত্যা, আর রক্তপাত ঘটল, কিন্তু তার শেষ পরিণতিটা দাঁড়াল কি? এ পর্যন্ত কোন্ দেশে কোন্ ব্রাহ্মণরাজ্য গঠিত হয়েছে? আপনারা সবাই এত বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কেন? আপনাদের মুখ দেখলে মনে হয় যে, আমরা যেন ক্ষত্রিয়-রাজত্বের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে বসেছি।

বসন্তকের কথাবার্তা এই রকমই। তার কথায় কেউ বড় আমল দেয় না। কিন্তু আজকের এই জটিল পরিস্থিতিতে তার এই কথাটাও আলোচনার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি আপত্তি জানিয়ে বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে বলেই আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি, বিনা কারণে নয়। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কি পারবে না, আপাতত সেটা প্রশ্ন নয়। আমরা বর্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি। ভার্গব পৃথিবীব্যাপী ব্রাহ্মণরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে-প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে মানি। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী সেই ভীষণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘর্ষের ফলে কত রাজ্য উৎসন্ন হয়ে গেছে! আর তার ফলে ক্ষত্রিয়দের উপর যে-মারাত্মক আঘাত পড়েছে তার ক্ষত-চিহ্ন এখনও শুকিয়ে যায় নি। এই উষস্তি চাক্রায়নই-যে নিকট ভবিষ্যতে আর একজন ভার্গব পরশুরাম হয়ে দাঁড়াবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

ঠিক কথা, কয়েক জন তার কথায় সায় দিল।

অনুরুদ্ধ বয়সে প্রবীণ না হলেও তার বিজ্ঞতার খ্যাতি আছে। লোকে বলে তার দৃষ্টি নাকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সভায় তার কথার দাম আছে, বড়-ছোট সবাই মন দিয়ে তার কথা শোনে। অনুরুদ্ধও বসন্তকের কথার প্রতিবাদ করে বলল, বসন্তক অর্বাচীন বালকের মতই কথা বলছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের প্রশ্নটা নতুন কিছু নয়, বসন্ত-

কের এ কথা ঠিক। কিন্তু সমস্যাটাকে সে একেবারেই লঘুভাবে দেখছে, আসলে সমস্যাটা অনেক বেশী গুরুতর।

এক-সভা লোকের মাঝখানে অর্বাচীন বালকের মত বলায় উত্তেজিত বসন্তক লাফিয়ে উঠে বলল, কোন্‌টা গুরু আর কোন্‌টা লঘু এটা বিবেচনা করবার মত বয়স আমার হয়েছে। তোমার নিজের কি বলবার আছে সেটাই বল।

বসন্তকের উত্তেজনা দেখে সবাই হেসে উঠল। বয়সের কথা নিয়ে কেউ যদি তার প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে সে তা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এ কথা সবারই জানা আছে। অনুরুদ্ধ বলল, থাম, এত ক্ষিপ্ত হয়ো না। শান্ত হয়ে আমার কথাটা শোন। ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি সরাসরি সশস্ত্র বা হাতাহাতি সংগ্রাম হোত, ব্রাহ্মণরা দাঁড়াতেও পারত না। এ কথা সবাই বোঝে। সবচেয়ে বেশী বোঝে ব্রাহ্মণরা নিজেরা। কিন্তু আমরা চিরকাল দেহের চর্চা করে এসেছি, আর এরা করেছে মস্তিষ্কের। এদের কূটবুদ্ধির কাছে আমাদের বারবার হার মানতে হযেছে।

বসন্তক প্রতিবাদ করে বলল, এ কথা সত্য নয়, ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষত্রিয়েরা কোনদিনই হার মানে নি। ব্রাহ্মণরা চিরদিনই ক্ষত্রিয়দের অনুগ্রহে পরিপুষ্ট।

অনুরুদ্ধ হেসে বলল, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আরও একটু গভীরে প্রবেশ কর, তা হলে দেখতে পাবে চিত্রটার রূপ বদলে গেছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের অধিকার ও কর্তব্য-সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিধি-বিধানগুলি কার হাতে রচিত, তাই নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে, স্বয়ং প্রজাপতি এইসব বিধি-বিধানের স্রষ্টা, আবার কেউ বা বলে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা এইগুলিকে রচনা করেছে। যার হাতেই রচিত হোক না কেন, কৌশলী ব্রাহ্মণেরা এইগুলিকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে। শস্ত্র দিয়ে নয় শাস্ত্র, দিয়ে তারা আপনাদের প্রভুত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে

আসছে। ব্রাহ্মণদের অপর তিন বর্ণের উপর অসীম প্রভাব। আপনারা অদৃশ্য থেকে এই তিন বর্ণের মধ্যে ভেদ-বিভেদ ঘটিয়ে তারা তাদের শক্তির খেলা খেলে। তপস্যা দ্বারা অর্জিত মন্ত্রশক্তি, বেদবিদ্যা ও কুটিল বুদ্ধির সাহায্যে আপনাদের অন্তরালে রেখেও তারা আর্য জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। তাই তো দেখতে পাই, রাজ্য শাসন করেন রাজা, আর রাজাকে শাসন করেন রাজপুরোহিত। সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চলেছে এই অদৃশ্য শক্তির খেলা।

কিন্তু ভার্গব অন্তরালে থাকেন নি। তিনি তাঁর সেই রক্তপিপাসু পরশু কাঁধে নিয়ে নিজেই সশরীরে নেমে পড়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজেই তো নেতৃত্ব দিতেন। মন্তব্য করল একজন।

সে কথা ঠিক। ভার্গব প্রকাশ্যেই নেমেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হলেও শাস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি দেশ-বিদেশের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কথা তিনি ভাল করেই জানতেন যে, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ যোদ্ধাদের নিয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। তিনি শুধু বীরই ছিলেন না, ব্রাহ্মণোচিত কূটবুদ্ধিই ছিল তার প্রধান শক্তি। সেই কূটবুদ্ধির সাহায্যে তিনি রাজবিরোধী ও ক্ষত্রবিরোধী শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করে একুশ বছর ধরে অশ্রান্তভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এ শুধু তাঁর বীরত্বের কথা নয়, এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণের কূটবুদ্ধির চরম নিদর্শন দেখিয়ে গিয়েছেন।

শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সম্মুখে আসন্ন সঙ্কট, নগরে নানা রকম জনরব শোনা যাচ্ছে—কখন কি ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। সকলের মনেই উদ্বেগ। এই অবস্থায় সেই পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করবার বা শুনবার মত মন নিয়ে তারা এখানে আসে নি। সভার মধ্যে একটা অসন্তোষের গুঞ্জরণ শোনা গেল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওসব কাহিনী আমরা আগেও শুনেছি, পরেও শুনতে পারব। এখন আমাদের অবস্থাটা কি, আর কি-ই আমাদের করণীয়,

সেই কথা আলোচনা করবার জন্য আমরা এসেছি। আপনারা সেই কথাই বলুন।

ঠিক, ঠিক, সেই কথাই বলুন, অনেকেই তার কথা সমর্থন করল।

অনিরুদ্ধ বলল, হ্যাঁ, কথা ঠিকই, কিন্তু আবার পুরোপুরি ঠিকও নয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে আপনাকে প্রতি-পক্ষেব কৌশলটাকে বুঝে নিতে হবে। তা না হলে আপনি আপনার প্রতি-আক্রমণেব কৌশল স্থির করতে পারবেন না। প্রথমে দেখতে হবে, তাদের অবস্থাই বা কি, আর আমাদের অবস্থাই বা কি। ভার্গব ব্রাহ্মণেতর তিন বর্ণের মধ্য থেকে লোক নিয়ে তাঁর সেনা বাহিনী তৈরি কবেছিলেন। কিন্তু উষস্তি চাক্রায়নের কৌশল তার চেয়ে মারাত্মক। তিনি আমাদেব ক্ষত্রিয়দের দ্বিধা-বিভক্ত করে ফেলেছেন। এর মধ্যে এক পক্ষ তাঁর সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট। রাজা আর সেনাপতি সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁব করতলগত। তাঁদের স্বাধীন কোন সত্তা নেই। তাঁবা অন্ধের মত রাজপুরোহিতের নির্দেশ পালন করে যান। এক কথায় বলতে গেলে বহু দিন থেকেই উষস্তি চাক্রায়ন তাঁদের মাবফৎ বাজ্য শাসন করে আসছেন। সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু মন্ত্রীকে বশ করতে না পারার ফলে, তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় মাঝে মাঝে বাধা পড়তে লাগল। এখানেই দেখা দিল সঙ্কট। উষস্তি চাক্রায়ন আর মন্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝেই খটখটি বেধে ওঠে। মন্ত্রী অনুপায়, রাজা তাঁর কোন কথাতেই কান পাততে চান না। বাবংবাব প্রতিবাদ করাব ফলে তিনি উষস্তি চাক্রায়ন ও রাজার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এ কথার উপর একজন বৃদ্ধ একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন, আপনি ব্যাপারটাকে একটু অতিরঞ্জিত করছেন। আমাদেব রাজার দোষ আছে জানি, তিনি একটু দুর্বলচিত্ত। যাঁকে তিনি ভক্তি কবেন, বিশ্বাস করেন, তাঁর কথা ছাড়া তিনি এক পা চলতে পাবেন না। কিন্তু তাই বলে সর্বজনমান্য ধর্মপ্রাণ উষস্তি চাক্রায়ন সম্পর্কে যে-ইঙ্গিত আপনি করলেন, তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভুল-ভ্রান্তি কার না

হয়! তাঁরও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই নগ্নপদ, উত্তরীয়ধারী ব্রাহ্মণ কোনদিন উচ্চ পদ বা ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী নন। তিনি যদি চাইতেন, কি না পেতে পারতেন! কিন্তু তিনি কিছুই চান না।

সরল প্রাণ বৃদ্ধের এই উক্তিতে অভিজ্ঞ যারা তারা একটু মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন। অনিরুদ্ধও হেসে বলল, তিনি কোন পদাভিলাষী নন এ কথা সত্য। শুধু নিজে নন, কোন ব্রাহ্মণকেই তিনি উচ্চ পদ দিতে চান না। ব্রাহ্মণদের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করবার কি প্রয়োজন তার? রাজা তাঁর হাতের যন্ত্র, সেনাপতিও তাই। রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর ইঙ্গিতেই চলে। কিন্তু মন্ত্রীমশাই বিগড়ে যাওয়াতেই যত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি মন্ত্রীর পরিবর্তন করে তাঁর একচ্ছত্র শাসনটাকে নির্বিঘ্ন করে নিতে চাইছেন। কিন্তু তাই বলে কোন ব্রাহ্মণকে তিনি মন্ত্রী-পদে বসাবেন না। সে ভুল তিনি করবেন না। তাঁর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে শ্রুতকীর্তি বসে বসে দিন গুণছে কবে সে তার বৃদ্ধ পিতৃব্যের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করে বসবে।

অনেকেই ভিতরের খবর জানে না, তারা চমকে উঠল। সে কি, শ্রুতকীর্তি হবে মন্ত্রী! একজন বলে উঠল, তা কেমন করে হবে? রাজপুরোহিত কেমন করে মন্ত্রী নিয়োগ করবেন? তাঁর তো এ অধিকার নেই।

অনিরুদ্ধ বলল, রাজপুরোহিত কেন নিয়োগ করতে যাবেন? যিনি নিয়োগের অধিকারী, সেই রাজাই নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সসম্মানে তাঁর কর্মভার থেকে অবসর দেওয়া হবে। শ্রুতকীর্তির মারফৎ আরও কোন কোন ক্ষত্রিয়-নন্দনকে নানা সুযোগ-সুবিধার ভরসা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ভাগ্যবানদের নাম জানা যায় নি। উষস্তি চাক্রায়ন পরম পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক, তিনি ক্ষত্রিয়-নন্দনদের দিয়েই তাঁর রাজত্ব চালাবেন।

সভায় উপস্থিত লোকেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অনিরুদ্ধ যে-সব কথা বলল, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উষস্তি চাক্রায়ন সম্পর্কে এ সমস্ত কথা আমাদের ভাবনার অতীত। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না। মন্ত্রীমশাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাস্করদেব এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের কাছে প্রকৃত অবস্থাটা খুলে বলুন।

সকলের দৃষ্টি ভাস্করদেবের মুখের উপর পড়ল। ভাস্করদেব বললেন, অনিরুদ্ধ যা বলেছে, তার প্রতিটি কথা সত্য। তবে এর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা অনুরুদ্ধের জানা নেই। উষস্তি চাক্রায়ন বহু দিন ধরে তাঁর এই ষড়্‌যন্ত্র চালিয়ে আসছেন। মন্ত্রীর দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পদে পদেই তাঁর ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। আপনারা জানেন, মন্ত্রী রাজাকে তাঁর নিজের সন্তানের মতই দেখে আসছেন। রাজাও তাঁকে তাঁর পিতার মতই শ্রদ্ধা করতেন এবং সব সময় তাঁর পরামর্শের উপর নির্ভর করেই চলতেন।

উষস্তি চাক্রায়ন সহজ লোক নন। নানা বিদ্যায় ও অবিদ্যায় সিদ্ধ তিনি। কে জানে, কেমন করে আমাদের রাজাকে একেবারে বশ করে ফেললেন। এক দিকে মন্ত্রী, আর এক দিকে উষস্তি চাক্রায়ন, রাজা দোটানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলেন।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, উষস্তি চাক্রায়নের আকর্ষণ ততই বাড়তে লাগল। অবশেষে তাঁর সম্পূর্ণ বশে চলে গেলেন রাজা। মন্ত্রীর কাছে রাজার যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল, এখন আর তাও রইল না। কে জানে, কি মন্ত্র দিয়ে উষস্তি চাক্রায়ন তাঁকে ক্রীতদাসের মত বেঁধে রেখেছেন। তাঁর আর এদিক ওদিক নড়বার উপায় নেই। এর পর সেনাপতির পালা। সাধু সরলচিত্ত, বিশ্বস্ত সেনাপতি স্বর্গগত মহারাজের আমলের লোক। মন্ত্রী তাঁকেও টেনে রাখতে পারলেন না, রাজার পিছে পিছে সেনাপতিও সেই ফাঁদে গিয়ে ধরা দিলেন। এর পর রাজার আদেশে কয়েকজন পুরানো রাজকর্মচারীর পদচ্যুতি

ঘটল, তাদের স্থানে নতুন লোক নিয়োগ করা হোল। ভিতরে ভিতরে কি যে সব ব্যাপার চলছে, বাইরের লোক কেউ কিছু জানতে পারছে না।

মন্ত্রী একেবারে একক হয়ে পড়লেন। কিন্তু উষস্তি চাক্রায়ন এই রাজ্যে এই একটি মাত্র লোককে ভয় করেন। তিনি মন্ত্রীর কাছে আপোসের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কিন্তু মন্ত্রী তাঁকে আমল দিলেন না। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উষস্তি চাক্রায়ন। এবার তিনি তাঁর চরম পন্থা গ্রহণ করলেন। একদিন একটি লোক এসে কেঁদে পড়ল মন্ত্রীর কাছে। বলল, আমার নাম কারু কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনাকে গুপ্তহত্যা করবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এত বড় পাপের কাজ আমি করতে পারব না ' আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

সভাশুদ্ধ লোক আতঙ্কে শিউরে উঠল। গুপ্তহত্যা! এই সর্বজনপ্রিয় বৃদ্ধ মন্ত্রীকে! এসব কি কথা? গোকর্ণ প্রদেশে এ সমস্ত কথা কেউ কোনদিন শোনে নি।

কে দিয়েছে আদেশ? মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

আমাকে আর ও কথা বলতে বলবেন না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। এখানে থাকতে আমার আর সাহস হচ্ছে না। আর ক'টা দিন দেখে আমি আমার মামার বাড়ির দেশে পালিয়ে যাব। এই কথা বলেই লোকটি চলে গেল। এর পরের পর দিনই লোকটিকে তার নিজের ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল।

সভার লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে এই কাহিনী শুনল।

ভাস্করদেব বলে চললেন, এতদিন মন্ত্রী এসব কথা বাইরের কারু কাছে প্রকাশ করেন নি। এবার তিনি আমাদের ডেকে সব কথা বললেন। বললেন, গোকর্ণ প্রদেশের এক মহা দুর্যোগের দিন ঘনিয়ে আসছে। কি যে হবে, আমি বুঝতে পারছি না। দেখ, তোমরা সবাই মিলে এই ব্রহ্ম-রাক্ষসের হাতে থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে পার কিনা।

ভিতরে ভিতরে এত বড় একটা ষড়্‌যন্ত্রের খেলা চলছিল, অথচ আমরা ক্ষত্রিয়েরা সবাই যেন ঘুমোচ্ছিলাম। যখন ঘুম ভাঙাতে গেলাম, ঘুম ভেঙেও ভাঙতে চায় না। তারা অবিশ্বাসের সুরে বলে, আপনারা ভুল বুঝেছেন, উষস্তি চাক্রায়ন মানুষ নন, তিনি নর-দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলবেন না। মন্ত্রী নিজ মুখে এসব কথা না বলা পর্যন্ত তারা আমাদের কথায় আমলই দিতে চাইছিল না।

এই কাজে নামবার কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, ওরা আমাদের মধ্যে গুপ্তচরের জাল ছড়িয়ে রেখেছে। আমাদের কার্য-কলাপের খবর কিছু কিছু ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, আমরা তার প্রমাণ পাচ্ছিলাম। অবশ্য ওদের খবরও আমাদের কাছে আসছিল। এবার ওরাও প্রচার চালাতে লাগল, মন্ত্রীর দল রাজার দলের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করছে। ওদের সেই প্রচার আজও চলছে। কিন্তু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু কোন কোন মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টিও হয়েছে। এমন সময় আমাদের সাহায্যে নেমে এলেন এক দেবী। তাঁর নিজের মুখের কথা শুনে লোকের মনের বিভ্রান্তি কেটে গেল।

দেবী? কে তিনি? বহু কণ্ঠের প্রশ্ন উঠল।

দেবীর আদেশে সে কথা বলা নিষেধ। আপনারা এই প্রশ্ন করবেন না। তারপর শুনুন। ক্রমে ক্রমে আমাদের শক্তি বাড়তে লাগল। আমরা ওদের মধ্যে আমাদের লোক ঢুকিয়ে দিলাম। ওরা কখন কি করবে, তার কিছু কিছু খবর আমরা আগেই পেয়ে যাই। অবশ্য আমাদের মধ্যেও-যে ওদের দু'-একজন লোক ঢুকে পড়ে নি, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না।

সভার মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই পরস্পরের সঙ্গে গুনগুন করে কথা বলছে। মধুমক্ষিকাদের মত মিলিত গুঞ্জন ধ্বনি উঠছে। একজন প্রশ্ন করল, সৈন্যদের ভিতরকার খবর কি?

ভাস্করদেব বললেন, সেখানে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি। সৈন্যদের মধ্যে

অধিকাংশই সেনাপতির অনুগত। তিনি যেমন বলেন, তেমনি করবে। অল্প সংখ্যক সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য যদি আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, তবে তারা আমাদের পক্ষে দাঁড়াতে সাহস করবে না।

একজন প্রশ্ন করল, আমাদের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অধিকাংশ কোন দিকে যাবে?

সে কথা বলা কঠিন। এমন অনেকে আছে যারা সংশয়স্থলে দাঁড়িয়ে আছে, কোন্ পক্ষের কথাটা সত্য, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। একদল লোক আছে, যারা আমাদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে, কিন্তু উষস্তি চাক্রায়নের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে বা করতে সাহস পায় না। উষস্তি চাক্রায়ন সম্পর্কে তাদের মনে ভীষণ আতঙ্ক। তারা বলে, ব্রহ্মতেজের সামনে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বা অস্ত্রবল কি করবে! আবার এমন মানুষও অনেক আছে যারা এ সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন খবরই রাখে না। এদের নিয়ে বিপদ আছে। কেন না, রাজার নামে যে-কোন আদেশ প্রচারিত হোক না কেন, রাজভক্ত প্রজা হিসাবে তা তারা মাথা পেতে নেবে।

আর একজন প্রশ্ন করল, ক্ষত্রিয়দের কথা তো শুনলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে বৈশ্যেরা কি করবে, তাবা কোন্ পক্ষে থাকবে?

ভাস্করদেব নিজে এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একজন যুবককে ডেকে বললেন, পুষ্কর, তুমি তো ওদের মাঝে এই নিয়ে আলাপ করেছ। তোমার কি ধারণা হয়েছে, তুমি বল।

পুষ্কর বলল, আমি ওদের প্রধানদের কাছে গিয়েছিলাম। ওরা যা বলে তার মর্ম এই, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, এই দু' বর্ণই আমাদের কাছে পূজ্য। আপনাদের মধ্যে যদি কোন বাদ-বিবাদ হয়, তখন আমরা কি তার মধ্যে কোন কথা বলতে পারি? ওদের কথাবার্তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেল যে, ওরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে।

সাত্যকি এতক্ষণ সভার এক কোণায় বসে চুপ করে সবার কথা শুনছিল। সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওদের সম্পর্কে পুষ্করের এই ধারণাটা সঠিক নয়। ওরা ওদের মনের কথাটা খুলে বলে নি।

পুষ্কর আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কেমন করে জানলেন?

সাত্যকি বলল, আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছি, এই মাসের দ্বিতীয় দিনে বৈশ্যপল্লীর বৈশ্যেরা পুনর্বসুর বাড়িতে একত্র হয়েছিল। শ্রুতকীর্তি এবং আরও কে কে যেন সেখানে উপস্থিত ছিল। সে সভায় ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে, উষস্তি চাক্রায়ন যে-ভাবে চলতে বলবেন, ওরা সেই ভাবেই চলবে।

সাত্যকির এই কথার পর পুষ্কর আর কোন কথা বলল না।

বৈশ্যদের সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছিল, শূদ্রদের সম্পর্কেও সে-ই প্রশ্ন তুলল, শূদ্রেরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। এই ব্যাপারে তারা কোন্ পক্ষে থাকবে?

ভাস্করদেব বললেন, ইতিপূর্বে বলিবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়ে রাজা শূদ্র কর্ষকদের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন। সম্প্রতি রাজা তাদের উপর একটা নতুন কর ধার্য করতে যাচ্ছেন, এই খবরটা প্রচারিত হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে খুবই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। কাজেই উষস্তি চাক্রায়নের দলের সঙ্গে আমাদের কোন রকম সংঘাত সৃষ্টি হলে পর আমাদের দমন করবার উদ্দেশ্যে রাজা-যে ওদের কাছ থেকে বিশেষ আন্তরিক সাহায্য পাবেন তা মনে হয় না।

এবার সাত্যকি উঠে দাঁড়িয়ে ভাস্করদেবকে সম্বোধন করে বলল, শূদ্রদের সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন সেটা খুবই সত্য, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি। কিন্তু আমাদের এই কঠিন প্রয়োজনের সময়ও সেই সুযোগটাকে আমরা যেন দেখেও দেখছি না। কেন বলছি, শুনুন তবে। আপনার কাছ থেকে যে-সব সংবাদ পেলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছে, উষস্তি চাক্রায়নের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা অনেক অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি। একটি একটি

করে দেখুন। ওদের পক্ষে আছে রাজা, রাজকোষের অর্থ, রাজভাণ্ডারের অস্ত্রশস্ত্র, সারা রাজ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আতঙ্কের পাত্র উষস্তি চাক্রায়ন। আর আছে ব্রাহ্মণেরা, বৈশ্যেরা, আর ক্ষত্রিয়দের একাংশ। এখানেই শেষ নয়। বিক্ষুব্ধ শূদ্রেরা আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে না চাইলেও রাজশক্তির চাপে তাদের বৃহৎ একটা অংশকে আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা যাবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আর আমাদের কি আছে? রাজার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাবশূন্য মন্ত্রী আর আমাদের ক্ষত্রিয়দের একাংশ। এই দুই পক্ষের মধ্যে যদি শক্তি-পরীক্ষা হয়, তবে তার পরিণতি কি হতে পারে?

সাত্যকির যুক্তিটা অত্যন্ত পরিষ্কার, বুঝতে কারু বেগ পেতে হোল না। ফলে অনেকের মুখেই একটা হতাশার ছায়া নেমে এল। ভাস্করদেব সেটা লক্ষ করে বললেন, সাত্যকির কথাটা অংশত সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রথমত, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নয়, তারা স্বভাবতই নিরীহ প্রকৃতির। তাদের সহযোগিতার সার্থকতা খুব বেশী নয়। দ্বিতীয়ত, ক্ষত্রিয়দের যে-অংশ আমাদের সঙ্গে আছে, তারা সৎ ও প্রভাবশালী, সেইজন্যই তাদের গুরুত্ব অনেক বেশী।

একজন সাত্যকিকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাদের পক্ষের দুর্বলতাটা দেখিয়েছেন, কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য আপনার প্রস্তাব আছে কিছু?

সাত্যকি বলল, আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। সেই কথাই আমি বলছি। এর আগে অনিরুদ্ধ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, ব্রাহ্মণরা কি রকম সামান্য শক্তি নিয়েও শুধুমাত্র কূটবুদ্ধির জোরে অন্যান্য বর্ণের সহযোগিতায় শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে এসেছে। ভার্গব তাই করেছিলেন, গোকর্ণ প্রদেশের ব্রাহ্মণদের নেতা উষস্তি চাক্রায়নও তাই করে চলেছেন। কিন্তু কূটবুদ্ধি কি শুধু ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া শক্তি? আমরা কি তার ব্যবহার করতে পারি না?

শূদ্রদের বিক্ষোভ সম্পর্কে আপনারা যেটুকু সংবাদ পেয়েছেন, প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও অনেক বেশী গুরুতর। আমাদের এই চরম প্রয়োজনের সময় আমরা তাদের সঙ্গে কেন হাত মিলাই না? শূদ্র-দের কাছে এ কথাটা গিয়ে পৌঁছেছে যে মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা বলি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছিলেন। সেজন্য আমাদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব অনুকূল। অবস্থাটা ভাল ভাবে বুঝিয়ে বল'তে পারলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমরা ওদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত সৈনিক করে গড়ে তুলব। তখন ওদের আর আমাদের মিলিত শক্তির সামনে কে দাঁড়াবে?

সাত্যকি অনেক আশা নিয়ে প্রস্তাবটা তুলেছিল। এই দুঃসময়ে এর বিরুদ্ধেও-যে কারু কোন বক্তব্য থাকতে পারে, এ কথা সে ভাবতে পারে নি। কিন্তু তার কথাটা অনেকেরই মনঃপূত হোল না। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলল। কেউ বলল, রাজত্ব যারই হোক, সমাজ রক্ষার জন্য শূদ্রকে দমন করে রাখতেই হবে। আমরা যদি আজ তাদের এভাবে প্রশ্রয় দিই, তবে দু'দিন বাদে তারা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবেই। কেউ বলল, শূদ্রকে সাথে নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ তুমি? কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর ওরা নিজেরাই যদি সিংহাসনে চেপে বসে তখন করবে কি? তখন কি আর তারা তোমার কথায় সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসবে? এই রকম নানা জনে নানা কথা বলল। অনেক বলাবলির পর বোঝা গেল, একমাত্র অনিরুদ্ধ ছাড়া তার পক্ষে আর কেউ নেই।

সাত্যকি কিন্তু তখনও হাল ছাড়ে নি। সে বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারছিল, উষস্তি চাক্রায়নকে পরাস্ত করতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাই সে তার মাটি কামড়ে পড়ে রইল। সে সবাইকে বুঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যে, এই হচ্ছে একমাত্র পথ, আর কোন পথ নেই।

ভাস্করদেব এতক্ষণ এই প্রস্তাবের উপর কোন কথা বলেন নি,

একটানা পরিশ্রমের পর বৃদ্ধ বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন, এটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছু নয়। কিন্তু সবাই এ কথা জানে, স্বেচ্ছায় নয়, রাজার আদেশে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে এই লাঞ্ছনাই কি তাঁর জীবনব্যাপী রাজসেবার উপযুক্ত পুরস্কার! আর সেই জায়গায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রুতকীর্তিকে করা হয়েছে মন্ত্রী। গোকর্ণ প্রদেশে এই পদের জন্য যোগ্যতর লোক কি আর ছিল না! শ্রুতকীর্তির মত নির্বিবেক ও উদ্ধত লোক যে-রাজ্যের মন্ত্রী, সে রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি?

সুদর্শনের দৃষ্টিতে আগে সারাটা দেশ একটা মানুষের মত এক সুরে কথা বলত। এখন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এক পক্ষ যা বলে, অপর পক্ষ তার বিপরীত কথা বলে। গোকর্ণ প্রদেশে সুদর্শন দু'জন লোককে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করত, একজন উষস্তি চাক্রায়ন, অপর জন মন্ত্রী। সুদর্শন জানত, শুধু সে নয়, সমস্ত রাজ্যের লোকেরা তারই মত এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আজ সে দেখছে কি? এক পক্ষ বলছে উষস্তি চাক্রায়ন রাজাকে জাদুমন্ত্রে বশ করে তাঁর মারফৎ নিজেই রাজ্য শাসন করছেন। অপর পক্ষ বলছে, মন্ত্রীকে অপসারিত করাটা সঙ্গত কাজই হয়েছে। মন্ত্রী আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে জোট বেঁধে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করছিলেন। সুদর্শনের বিবেচনায় এদের কারু কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে ভাবল, দুই দল স্বার্থান্ধ লোক আপন আপন স্বার্থ সাধনের জন্য এই পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের উদ্দেশে কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি করছে। কিন্তু এই লোকগুলি এতদিন কোথায় ছিল? মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান, এরই মধ্যে কেমন করে মাথা তুলে জেগে উঠল। আর এদের কথায় লোকগুলিই বা এমন উন্মত্ত হয়ে উঠল কেন? আর্য জাতির এ কি দুর্দিন!

সুদর্শনের চোখের সামনে গোকর্ণ প্রদেশের ঘন ঘন রূপ পরিবর্তন ঘটতে লাগল। দ্রুতগতিতে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলল। এক-

দিন শোনা গেল, প্রাক্তন মন্ত্রীর গৃহদ্বারে প্রহরী বসানো হয়েছে। তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরোলেই প্রহরী ছায়ার মত তাঁকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে চলে। তার ফলে তিনি আর বাইরে বেরোন না। তার অর্থ তিনি স্বগৃহে বন্দী হয়ে আছেন। পরে শোনা গেল, শুধু তিনি নন, নগরের আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই একই অবস্থায় দিন যাপন করছেন। সুদর্শন স্তম্ভিত হয়ে গেল, রাজার কি সত্য-সত্যই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল নাকি? এসব ।তিনি কি করছেন?

একদিন খবর পাওয়া গেল এক দল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ পাড়ায় গিয়ে হামলা করেছে। সংবাদ পেয়ে রাজার সৈন্যদল ছুটে গেল। দু'পক্ষে বেশ কয়েকজন জখম হোল। পরে শোনা গেল, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একজন নাকি মারাও গেছে। তার নাম বসন্তক। নগরময় উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলল। আজ এখানে, কাল ওখানে, একটা না একটা ঘটনা ঘটছেই। পর পর দুটো গুপ্তহত্যার সংবাদ পাওয়া গেল। লোকে বলাবলি করে, নগরের ক'জন লোকের নাকি সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কি ভয়ানক কথা! শান্ত-শিষ্ট, সচ্চরিত্র মানুষ-গুলি, তারাও যেন কেমন উন্মত্তের মত হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ চাই, রক্তের বদলে রক্ত, সবার মুখেই এই এক কথা। মানুষ আর মানুষ নেই, মানুষ রাক্ষস হয়ে উঠেছে। রাক্ষসেরা এসে মানুষের উপর ভর করল নাকি? নাকি মানুষের মধ্যে মানুষ আর রাক্ষস পাশাপাশি বাস করে? তখন তার মনে পড়ে গেল অশ্বত্থলার সেই কথা, ব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু আছে, সবই আমাদের এই দেহ-ভাণ্ডে আছে। এক এক সময় এক একটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অশ্বত্থলার কথাই কি তবে ঠিক?

সাত্যকিকে খুঁজে বের করতে তার কয়েকটা দিন কেটে গেল। বাড়িতে নাকি বড় একটা থাকে না, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। তার বউ প্রথম প্রথম তার জন্য খোঁজ-খবর করত, এখন সে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সুদর্শন ভেবেছিল, সাত্যকি নিশ্চয়ই তার জন্য

উৎসুক হয়ে আছে, তাকে দেখলেই উল্লসিত হয়ে উঠবে। আর সে ফলাও করে তার কাছে তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করবে। কিন্তু কোথায় কি, সাত্যকি তার কাছ থেকে কোন কথাই শুনতে চাইল না, গলগল করে শুধু নিজের কথাই বলে চলল। আর কোন কথা নয়, সে-সমস্ত কথা—যা শুনে শুনে তার কান আর মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সারা নগরীতে এই এক কথা ছাড়া আর কোন কথা যেন নেই, লোকে আর সব কথা ভুলে গিয়েছে। এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, আর এমন সুন্দর একটা প্রাণ নিয়ে সাত্যকিও সেই একই ফাঁদের মধ্যে গিয়ে ধরা দিয়েছে। সুদর্শন আশা করেছিল, সাত্যকি তার মতই দু' পক্ষের নিন্দা করবে, নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন নিয়ে আত্মঘাতী হানাহানি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু কই, তা তো নয়! সাত্যকি একের পক্ষ হয়ে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগল। আর কি আশ্চর্য, রাজার বিরুদ্ধে একটি কথাও সে বলল না। আর কারু বিরুদ্ধে কোন কথা নয়, শুধু একটি মাত্র লোক তার আক্রমণের কেন্দ্রস্থল। উষস্তি চাক্রায়ন। এমন কোন গালি নেই যা সে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল না। কি আশ্চর্য, মানুষের বুদ্ধি যখন বিকৃত হয়, তখন কি আর তার কোন সীমা থাকে না? তা নইলে উষস্তি চাক্রায়নের বিরুদ্ধে এমন সমস্ত কথা কি করে বলে সাত্যকি!

তার বাল্যবন্ধু সাত্যকি। তার মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার আর কেউ নেই। সেই সাত্যকির প্রতি তার মন আজ বিরূপ হয়ে উঠল। তার সঙ্গ আজ তার কাছে অরুচিকর বলে মনে হতে লাগল। নিজের ঘরে ফিরে এল সে। আর বাইরে যাবে না। বাইরে কার সঙ্গে কথা বলবে! কার জাদুমন্ত্রে সব মানুষগুলি এমন অমানুষ হয়ে গেছে!

বসুমতী প্রশ্ন করল, তোমার মুখ অমন ভার ভার কেন গো?

সুদর্শন কোন উত্তর দিল না।

বসুমতী এবার একটু আদুরে সুরে বলল, তুমি এত দেশ ঘুরে এত সব কিছু দেখে এলে, কই, আমাকে কিছু বললে না তো।

এই একটি মাত্র লোক যে কোন পক্ষের নয়, কি যে ঘটছে নগরে সে-সব খবর সে রাখে না। আর সবাই বদলে গেছে, শুধু বসুমতী যেমন ছিল তেমনি আছে। যেন চারদিককার কঠিন রোদের মাঝখানে একটি পত্রবন, পাদপের স্নিগ্ধ ছায়া। ওর সারা দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। বেশ, সেই ভাল, এখানেই সে নেবে তার আশ্রয়।

সুদর্শন বসুমতীর কাছে তার ভ্রমণ কাহিনী বলে চলল। বলতে বলতে অম্বশলার কথা এসে পড়ল। সে তো আসবেই। অম্বশলার কথাটা এত বেশী করে না বললেই চলত। কিন্তু গল্প করতে করতে কি আর এত খেয়াল থাকে!

বসুমতী চোখ বড় করে গল্প শুনছিল। সে বলল, সে মেয়ের স্বামী আর ছেলেপিলের কথা বললে না তো কিছু?

তিনি কুমারী। একাই থাকেন। আর কেউ তাঁর নেই।

কুমারী! একাই থাকেন! সে কি গো, কোন নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ নয় তো?

আঃ, কি যে বল। তিনি সাধিকা। সাধনা করেন।

সাধনা করেন? মেয়েমানুষ বিয়ে করবে না, থাওয়া করবে না কেমন আবার সাধনা? না বাপু, আমার যেন ভাল লাগছে না। আর তুমিই বা সেই একা বাড়িতে তার সঙ্গে থাকতে গেলে কেন?

এইটুকুই। বসুমতী বড় ভাল মেয়ে, এর বেশী আর কিছু সে বলবে না। কিন্তু এইটুকুতেই সুদর্শনের মনটা তেতো হয়ে গেল। এর পর আর কথা জানতে চাইল না। একবার ভাবল, বললেই হোত মা'র মত বয়স। কিন্তু অম্বশলার হাসি হাসি মুখটা এখনও তার চোখের সামনে ভাসছে। তার সম্পর্কে এ কথাটা বলতে রুচি হোল না তার। তবে কথাটা সেখানেই থেমে গেল। সুদর্শন হতাশ

হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, কি যে হয়েছে সংসারটার, মন খুলে কথা বলবার মত একটা লোক পাওয়া যায় না।

এর দিন তিনেক বাদে সাত্যকি নিজেই এল সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করতে। সুদর্শন একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিল। সাত্যকিকে দেখে সে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। ভাবল, আজ আর ওসব কথার দিক দিয়েই যাওয়া নয়, আজ অম্বখলার কথা দিয়েই শুরু করবে। অম্বখলার কথাগুলি সাত্যকিকে না বলা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কথাগুলি যেন পেটের মধ্যে হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু বসুমতীর কাছে এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। এসব কথার অর্থ ওর মাথায় ঢুকবে না। তা ছাড়া ওর মনে যেন একটু সন্দেহও জেগেছে।

কিন্তু সাত্যকি তাকে প্রথমে কথা বলবার সুযোগ দিল না। কথা বলতে বলতেই কাছে এল—দেখেছ, দেখেছ, ওদের কাণ্ডটা।

শুধু 'ওদের' বললে নির্দিষ্ট করে কাউকেই বোঝায় না। কিন্তু ওদের বললে কাদের বুঝতে হবে সুদর্শনের তা বুঝতে বাকী ছিল না। তবু সে প্রশ্ন করল, কাদের কাণ্ডটা? কি হয়েছে? এত উত্তেজিত কেন?

কাদের কাণ্ড, সেটাও কি আবার খুলে বলতে হবে নাকি? নতুন মন্ত্রী হয়েই নতুন একটা কর বসিয়েছে, শুনেছ তো?

না, জানি না তো। কিসের কর?

কিসের কর? সাড়া দেশশুদ্ধ লোক জানে আর তুমি জান না?

আরে, আমি কি দেশে ছিলাম নাকি?

কি মুশকিল, তুমি দেশে ফিরে আসবার পরেই তো ওরা করটা ধার্য করেছে।

তা হতে পারে। কিন্তু হয়েছে কি তাতে?

হয়েছে কি! এই কর সমর্থন কর তুমি? জান, প্রথমে ওরা বলি-বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। কিন্তু চারদিকে সবাই বেঁকে বসাতে তা পারল না। এখন এই নতুন কর বসিয়ে সেইটে আদায় করে নিতে চেষ্টা করছে।

করছে তো করছে, আমরা তাতে কি করতে পারি? রাজা তার মন্ত্রী আর সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর ধার্য করবেন। আমাদের সমর্থন অসমর্থন, এ ক্ষেত্রে কি মূল্য আছে তার?

কেন থাকবে না? গতবার রাজা বলিবৃদ্ধির কথাটা তুলেছিলেন। অনেক চেষ্টাও করেছিলেন কর্ষকদের উপর এটা চাপিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কর্ষকেরা সবাই বেঁকে বসল। মন্ত্রীও এর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। শেষে বলিবৃদ্ধির প্রস্তাবটা ধামাচাপা দিতে হে.ল।

সে আর আশ্চর্য কি, মন্ত্রীর আপত্তি দেখে রাজা তাঁর মত পরিবর্তন তো করতেই পারেন।

না, এত সহজ সরল ব্যাপার নয়। রাজা যদি নিজের মধ্যে থাকতেন তা হলে আর নিজের পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বলিবৃদ্ধি করতে চাইতেন না। যে অপদেবতা তাঁর উপর ভর করে আছে, এ তারই কীর্তি। এই অপদেবতা এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

অপদেবতা বলতে সাত্যকি কাকে ইঙ্গিত করছে সুদর্শন ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, কর্ষকদের উপর কর ধার্য করেছে, তাদের ভাল-মন্দ তারা বুঝবে, তাতে তোমার আমার কি?

তোমার আমার কি! কিছুই না? পণ্ডিত-মূর্খ বলে একটা কথা আছে না? তোমার মত লোকেরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অত্যাচার আর লাঞ্ছনার ফলে শূদ্রেরা দিন দিনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। যেদিন ওদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, আর ওদের রোষবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন তার আর কি দিক-বিদিক জ্ঞান থাকবে? সামনে যাকে পাবে তাকেই পুড়িয়ে ছাই করবে, তুমি আমি-যে তার গ্রাস থেকে রেহাই পাব এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ আমার কল্পনা নয়, এই গোকর্ণ প্রদেশেই ইতিপূর্বে এমনি এক ঘটনাকে উপলক্ষ করে সর্বনাশ নেমে এসেছিল একদিন। সে কথা তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে।

সাত্যকির এতটা উত্তেজনা দেখে সুদর্শন আশ্চর্য হয়ে গেল। তার এমন মূর্তি সে আর কোনদিন দেখে নি। সে প্রশ্ন করল, কি, হয়েছে কি, তাই খুলে বল না। এত রাগ কেন তোমার?

সাত্যকি বলল, তোমরা কিছুই খবর রাখ না, কিন্তু ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নতুন মন্ত্রী তার আসনে বসতে না বসতেই নতুন করের আদেশ ঘোষণা করে দিয়েছে। শুধু ঘোষণাই নয়, গোপেরা সদলবলে কর আদায়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর এই নিয়েই হাঙ্গামা শুরু হয়ে গিয়েছে।

হাঙ্গামা মানে? সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল সুদর্শন।

হাঙ্গামা মানে হাঙ্গামাই। তুমি তো চেনো শূদ্রপল্লীর সুদাসকে। ওরা কর সংগ্রহের জন্য সুদাসের বাড়ি গিয়ে উঠল। সুদাস অক্ষমতা জানিয়ে বলল, আমি বউ-ছেলে নিয়ে আধপেটা খেয়ে আছি, কর দেব কেমন করে? গোপ অতি অসৎ লোক, দু'-একটা কথা কাটাকাটির পর সুদাসের বউ ইদার দিকে ইশারা করে বলল, বউটাকে ভাড়া খাটা না, কর দেওয়ার আবার ভাবনা!

ছি ছি, সুদর্শন জিভ কাটল।

সুদাসকে জানই তো, ও বড় তেজী ছেলে। ও আর দেরি করল না, সঙ্গে সঙ্গেই ওর গলার কণ্ঠিটা ধরে চিং করে ফেলে দিল। তার পর দমাদম দুই লাথি।

সর্বনাশ, করেছে কি! তারপর? তারপর?

তার পর গোপের অনুচরেরা ছুটে এল। কিন্তু কোথায় পাবে সুদাসকে! সে তখন বন্য হরিণের মত দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অনুচরদের সামনে এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে গোপ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। ওরা সুদাসের কুড়ে ঘরটাকে ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিল, আর ওদের জিনিসপত্র যৎসামান্য যা-কিছু ছিল, লুটেপুটে নিয়ে গেল। ওদের মাথা রাখবার জায়গাটুকুও রইল না। ইদা তার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পাড়ায় আর একজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

তাই তো, বড় মুশকিলের কথা।

থাম, গল্প এখনও শেষ হয় নি। এই ঘটনা ঘটেছে পরশু। কাল রাত্রিবেলা সেই গোপ একলা তার ঘরের দিকে ফিরছিল। বাড়ির কাছে এসে 'মাগো' 'মাগো' বলে চিৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। বাড়ির লোক চিৎকারের শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে গোপ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে! কে যেন পেছন থেকে লাঠির বাড়ি মেরে তার একটা পা ভেঙে দিয়েছে। গোপ এখন শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে, কই আমি তো কিছুই জানি না।

পুঁথির পাতায় এসব কথা লেখা থাকে না। এসব জানতে হলে ঘরের বাইরে যেতে হয়।

সাত্যকি কথাটা মিছে বলে নি। সুদর্শন এ ক'টা দিন নিজেকে বাড়ির মধ্যেই আটকে রেখেছিল।

সাত্যকি বলল, কাজটা কার সে কথা বুঝতে কারুই বাকী নেই। রাজার লোকেরা শূদ্র পল্লীতে সুদাসের খোঁজ করে ফিরছে। ধরা পড়লে তার আর রক্ষা নেই।

সুদর্শন বলল, এত অল্পেই যাদের মাথা এত গরম হয়ে ওঠে তাদের একটু সাজা হওয়াই দরকার।

ধরা যদি পড়ে, তবে একটু নয়, কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে তাকে। কিন্তু "এত অল্পেই"—এ তুমি কি কথা বললে সুদর্শন? তুমিও কি ওদের মতই অমানুষ হয়ে গেলে! "এত অল্পেই"—এ কথাটা বলতে তোমার মুখে একটু বাধল না? আচ্ছা, কেউ যদি তোমার বউকে ভাড়া খাটাতে বলে, তুমি কি তা হজম করে নিতে পার, বা সামান্য বলে উপেক্ষা করতে পার?

ছিঃ, অনার্যের মত কথা বোলো না সাত্যকি, আহত অভিমানে গর্জে উঠল সুদর্শন।

সাত্যকি হেসে বলল, অনার্যের মত কথা বলি নি ভাই, আর্যের

মতই বলেছি। সুদাস যার পা'টা চিরদিনের জন্য খোঁড়া করে দিয়েছে সেই গোপ বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ আর্য। তোমার মুখের ভাব দেখে তোমাকে খুবই বিক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে। অথচ কেউ তোমাকে এখন পর্যন্ত ও কথাটা বলে নি। আমি শুধু বলেছিলাম, যদি বলে—। আর তাতেই তোমার এই অবস্থা? সেজন্যই লোকে বলে, নিজে আঘাত না খেলে আঘাতের দুঃখটা বোঝা যায় না।

সুদর্শন একটু লজ্জিত হয়ে বলল, ঢের হয়েছে সাত্যকি, আর না, আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি।

সাত্যকি একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, শুধু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নয় ভাই এ তার চেয়ে অনেক গভীরের জিনিস। সুদর্শন, তুমি সৎ লোক, সাধু লোক, দয়ালু লোক, কিন্তু তোমার ওই বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই কৃষ্ণাঙ্গ হত-ভাগ্যদের তুমি করুণা কর, কিন্তু তারা-যে তোমার মতই মানুষ, এভাবে তুমি তাদের দেখতে পার না, তাদের মনের কথাটাও বুঝতে পার না।

আর তুমি? সুদর্শন প্রশ্ন করল।

আমি? আমি তো বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ নিয়ে জন্মাই নি। আমার রক্তে অনার্য রক্তের মিশাল রয়েছে। আজ এটাকে আমি বহু ভাগ্য বলে মনে করি। সেজন্যই সুদাসের জন্য আমার চিন্তা হয় বটে কিন্তু আমি তার এই সৎ সাহসের প্রশংসা করি।

শূদ্রদের মধ্যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়েছে বলতে পার?

কেন পারব না? ভাল করেই বলতে পারি। তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। এই ঘটনার ফলে কারু কারু মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। রাজার লোকেরা নানা রকম উৎপাতের সৃষ্টি করে এই আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা, সুদাস এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সমস্ত শূদ্রদের কাছে গর্ব ও গৌরবের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু তাই নয়, তারা সুদাসকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই ঘটনার পরেই তারা সঙ্কল্প নিয়েছে যে, একজন শূদ্রও এই কর দেবে না।

কর দেবে না, সে কি একটা সম্ভব কথা ? রাজার বিরুদ্ধে কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ?

সম্ভব কি সম্ভব নয়, সেটা তাদের কাজের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হবে। কিন্তু একটা আশ্চর্য কথা শোনো, যে-কথা রাজার লোকেরা কল্পনাও করতে পারে না, এই সঙ্কল্পের পেছনে সমস্ত শূদ্র সম্মিলিত হয়েছে। সুদাস তাদের সবার মাঝখানে স্থান পেয়েছে। তাকে খুঁজে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

সুদর্শন উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এর পরিণতি কি ?

পরিণতি ? পরিণতি হয়তো একটা বিরাট সংঘর্ষ। এই পরিণতি শূদ্রের কাছে কাম্য ছিল না, আজও নয়। কিন্তু উষস্তি চাক্রায়নের নির্বোধ নীতি তাদের সেই পথেই পরিচালিত করে চলেছে।

কিন্তু এত সব কথা তুমি জানলে কি করে ?

কেন জানব না ? আমি-যে আজ তাদেরই একজন, তারা আমাকে তাদের সুখ-দুঃখের সাথী বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমি তাদের মধ্যেই আছি।

তাদের মধ্যে আছ ? কেন ? কিন্তু তুমি কি মনে কর তারা এই সংঘর্ষে জয়ী হতে পারবে ?

হয়তো পারবে, হয়তো পারবে না।

যদি না পারে, তবে কি তাদের পিষে চূর্ণ করে ফেলবে না ?

তা হয়তো ফেলবে।

তবু তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে থাকতেই হবে। আমার পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

চৌদ্দ

রাজা বৃষকেতু অসুস্থ। কথাটা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে ছিল সামান্য জ্বর, খুসখুসে কাশি। রাজবৈদ্য এল, তিক্ত, কটু, কষায় চৌদ্দ রকমের গাছ-গাছড়া মিশিয়ে পাচনের ব্যবস্থা দিল, বিবিধ রকমের অনুপান যোগে বটিকা মর্দন করে খাওয়ান হতে লাগল। কিন্তু জ্বরের প্রকোপ কমা দূরে থাক, দিন দিন বেড়েই চলল। রাজবৈদ্য হার মানল। তার বিদ্যা-বুদ্ধির থলিতে যা-কিছু সম্বল ছিল, সব ঝেড়েঝুড়ে নিঃশেষ করল। কিন্তু কোনই সুফল দেখা গেল না।

তিন রানী রাজাকে ঘিরে বসে থাকে। রাজার মন যাতে প্রফুল্ল থাকে, তার জন্য অনুক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু রাজার সেবা-শুশ্রূষার ভার সুদক্ষিণা সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, দাসীরাও তার ভাগ পায় না। তার প্রতিদিনের সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে সুদক্ষিণা আর বৃষকেতুর মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা, উদ্বেগ, আশঙ্কা মিশিয়ে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে এক নতুন অন্তরঙ্গতার, যার আস্বাদ ইতি-পূর্বে কোনদিনই তারা পায় নি। এতদিনে তারা পরস্পরের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। অতীত দিনের মনোমালিন্য আর বাদ-প্রতিবাদের কথাগুলি এখন কি তুচ্ছ আর হাস্যকর বলেই না মনে হয়! অসহায় শিশুর মত সুদক্ষিণার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে বৃষকেতু, তার পুরুষের অহঙ্কার কোথায় তলিয়ে গেছে। আর তা তাদের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পরস্পরের আকর্ষণে ওদের মন যেন প্রথম প্রণয়ের আবেগে স্ফীত হয়ে উঠেছে। ওরা নতুন করে নিজেদের চিনছে।

তাই সুদক্ষিণা যদি ক্ষণেকের জন্যও কাছে উপস্থিত না থাকে, রাজার তৃষিত চোখ দু'টি ব্যাকুল হয়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়, আবার

কাছে ফিরে এলে আনন্দে ও তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টির মর্ম সুদক্ষিণার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। এই দৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে তার মন যেন কলাপীর মত কলাপ বিস্তার করে দেয়। রাজার এই ব্যাকুলতা মেজো রানী আর সেজো রানীর চোখেও ধরা পড়ে।

সুদক্ষিণা মনে মনে কল্পনার সৌধ রচনা করতে থাকে। এবার হয়তো উষস্তি চাক্রায়নের অশুভ প্রভাব থেকে রাজাকে ছিনিয়ে আনতে পারা যাবে। রাজাকে সে যদি তার পক্ষে পায়, কি না সে করতে পারে? চক্রী উষস্তি চাক্রায়ন দীর্ঘ দিন ধরে উর্ণনাভের মত যে-ষড়্‌যন্ত্রের জাল রচনা করে আসছে, সে জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ মন্ত্রী পুনরায় তাঁর নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, শূদ্রদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ ওই অবাঞ্ছিত নতুন কর বাতিল করে দিয়ে তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে। ষড়্‌যন্ত্রের মূল ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজ এই আত্মধ্বংসী বিরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আর সুদক্ষিণা? হ্যাঁ, এই নতুন পাওয়া ভালবাসার স্পর্শে তার জীবনও ধন্য হয়ে উঠবে। সব কিছুই সম্ভব হবে যদি সে রাজাকে সেই ব্রহ্ম-রাক্ষসের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে। পারবে না সে? সুদক্ষিণা আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ পারবে সে, নিশ্চয়ই পারবে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী উষস্তি চাক্রায়নকে হার মানতেই হবে তার কাছে। কিন্তু রাজার রোগ-যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার কি হবে? রাজার শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সুদক্ষিণার মন চিন্তাভারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

প্রাক্তন বৃদ্ধমন্ত্রী দেখা করতে এলেন রাজার সঙ্গে। রাজা লজ্জায় তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারলেন না। তিনি হাতের ইশারায় সুদক্ষিণাকে সরে যেতে বললেন। সুদক্ষিণা সরে গেল, কিন্তু দূরে চলে গেল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনল, রাজা বলছে, আমি বড় দুর্বল, বড় দুর্বল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি।

মন্ত্রী বললেন, ছি ছি ছি, এসব কি কথা! আপনি আমার কাছে

কোন অপরাধ করেন নি। কোন চিন্তা করবেন না। দেবতারা আপনাকে রোগমুক্ত করে তুলবেন। আমি দিবা-রাত্রি আপনার জন্য প্রার্থনা করছি।

আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

আমি আশীর্বাদ করছি। বৃদ্ধ তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

অন্তরালে আনন্দের আবেগে সুদক্ষিণার চোখে অশ্রু দেখা দিল।

নতুন মন্ত্রী শ্রুতকীর্তি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এল। রাজার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে রইল, কোন কথা কইল না। শ্রুতকীর্তি কতক্ষণ নিজে নিজেই কথা বলে শেষে অপ্রস্তুত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সুদক্ষিণার উল্লাস ক্রূর হাসির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠল।

রাজার ব্যক্তিগত কল্যাণ-অকল্যাণ, তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর জীবন-মৃত্যু, সবকিছু সম্পর্কেই দায়িত্ব রয়েছে রাজপুরোহিতের। তিনি প্রায় রোজই একবার করে আসছেন। সুদক্ষিণা অন্তরাল থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সে মনে মনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তির পরিমাপ করতে চেষ্টা করে। একটি সৌম্য, প্রশান্ত, প্রতিভাদীপ্ত মুখ। এই মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষের মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে।

আকর্ণ বিস্তৃত দু'টি চোখ, ঈষৎ রক্তিম। একেই বোধ হয় বলা হয় পদ্মপলাশলোচন। তবে শোনা যায়, এই দু'টি চোখই নাকি সময় বিশেষে বাঘের চোখের মত জ্বলে ওঠে।

সুদক্ষিণা লক্ষ করে, উষস্তি চাক্রায়ন যতক্ষণ উপস্থিত থাকে, রাজা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকেন। দেখে দেখে একটা উপমার কথা মনে পড়ে তার—যেন অজগরের মুখের সামনে হরিণ-শাবক। রাজা চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চান না, ক্ষীণ কণ্ঠে কি যে বলেন অত দূর থেকে শুনতে পায় না সুদক্ষিণা। উষস্তি চাক্রায়ন যখন চলে যান, রাজার চোখেমুখে পরম স্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

সুদক্ষিণার মনে তখন সন্দেহ দেখা দেয়, রাজাকে ওঁর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার মত শক্তি সত্য-সত্যই তার আছে তো?

বৈদ্যরাজ ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, রাজার উপর দানব ভর করেছে। ওষুধে কোন কাজ হবে না। রাজপুরোহিত মন্ত্রসিদ্ধ গুণীদের পাঠিয়ে দিলেন।

প্রথম গুণী রাজার কাছে এসে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল, তারপর রাজার গায়ে হাত রেখে চোখ বুজে বসে রইল। কতক্ষণ পরে চোখ খুলে সে বাতাসের মাঝে পশুর মত গন্ধ শুঁকতে লাগল। শেষে তিন বার তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল—তক্‌মন্! যারা বসে বসে দেখছিল, তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—তক্‌মন্, তক্‌মন্, তক্‌মন্!

গুণী বলল, হ্যাঁ, আর কেউ নয়, তক্‌মন্।

তখন গুণী কোমরে কাপড় আঁট করে বেঁধে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলিতে ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠল। দর্শকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে বসল। গুণী তক্‌মন্ দানবের উদ্দেশে মন্ত্রের তীর ছুঁড়ে চলল:

ও রে দানব তক্‌মন্, তোকে এবার চিনেছি। তোর বিষম জ্বালায় জ্বলে গৌরবর্ণ মানুষ হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। তুই অগ্নির মত মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়ে চলিস্।

ওরে তক্‌মন্! তোর গায়ের বল শেষ হয়ে যাক, সকল কাজের বার হয়ে যাক। যা যা, এ দেশ ছেড়ে চলে যা। পাতালে গিয়ে প্রবেশ কর, নয়তো শূন্যের মাঝে চলে যা।

অতল তলে চলে যা, সুদূর দেশে চলে যা। মুজিবনরা যেখানে বসতি করে, সেখানে চলে যা। আরও দূরে, যেখানে বহ্লিকরা ঘর বেঁধে আছে, সেখানে তাদের মধ্যে চলে যা। কামার্তা শূদ্র কন্যার উপর ভর কর। তার আপাদমস্তক কাঁপাতে থাক। তোর ভ্রাতা যক্ষ্মা, কাশি আর ভ্রাতুষ্পুত্র কণ্ডুকে নিয়ে অনার্যদের মধ্যে চলে যা।

এবার গুণী কাশির উদ্দেশে মন্ত্রবাণ ছাড়ল:

জীবাত্মা যেমন তার কামনাকে নিয়ে দ্রুত বেগে উড়ে চলে যায়, রে কাশি, জীবাত্মার গতিপথে তেমনি করে উড়ে যা। তীক্ষ্ণ তীর যেমন করে দ্রুতবেগে ছুটে চলে, তেমনি বেগে পৃথিবীর উপর দিয়ে ছুটে যা। সূর্যরশ্মি যেমন করে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি বেগে সমুদ্র-পথে ছড়িয়ে যা।

গুণী একবার, দু'বার, তিনবার—বার বার তার মন্ত্রপাঠ করল—গলা ছেড়ে মন্ত্র পড়তে লাগল, কিন্তু জ্বর আর কাশি যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে গুণী ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, না, এ তক্‌মন্ নয়। দর্শকেরা হাঁপ ছেড়ে বলল—না, না, এ তক্‌মন্ নয়। তবু মন্দের ভাল।

এবার দ্বিতীয় গুণী এসে রাজাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে ঘোষণা করল, বজ্র-নামক দানবেরা রাজার দেহে বজ্রকীটরূপে প্রবেশ করে এই ব্যাধির সৃষ্টি করেছে। দর্শকেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, বজ্রকীট, বজ্রকীট, বজ্রকীট।

গুণী একটা প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল :

হে ইন্দ্রদেব, তুমি আদেশ কর, আমি রাজদেহে প্রবেশকারী দুষ্ট বজ্রকীটদের নিধন করি। আমার মন্ত্রের জোরে এই বজ্রকীটরা নিপাত যাক, নিপাত যাক, নিপাত যাক।

যেই বজ্রকীটেরা চক্ষুমণ্ডলে, নাসিকায় আর দন্তের মধ্যে বিচরণ করে, আমি তাদের চূর্ণ করি।

এই সমবর্ণের এক জোড়া, এই ভিন্ন বর্ণের এক জোড়া, কৃষ্ণবর্ণের এক জোড়া, রক্ত বর্ণের এক জোড়া, ধূসর বর্ণের এক জোড়া, শকুনীর মত আর কোকিলের মত আকৃতি বিশিষ্ট বজ্রকীটদের আমি চূর্ণ করি।

এই-যে বজ্রকীটগুলি, যাদের স্কন্ধ শ্বেতবর্ণ, এই-যে কৃষ্ণবর্ণ বজ্রকীটগুলি, যাদের শ্বেতবর্ণ বাহু, আর এই বিচিত্র বর্ণের বজ্রকীটগুলি—আমি সবগুলিকেই চূর্ণ করি।

এই আমি বজ্রকীটদের রাজা ও উপরাজাকে নিধন করলাম। বজ্রকীটকে, তার মাকে আর তার ভাইকে নিধন করলাম। তাদের সহবাসী যারা, তাদের নিধন করলাম, তাদের প্রতিবেশী যারা, তাদের নিধন করলাম। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বজ্রকীটদের সকলকেই নিধন কবলাম। পুরুষ বজ্রকীট আর স্ত্রী বজ্রকীট, এই প্রস্তরখণ্ড দিয়ে আমি সবার মাথাই ভেঙ্গে চূর্ণ করলাম, আগুন দিয়ে তাদের মুখ দগ্ধ করলাম।

গুণী মন্ত্রের জোরে বজ্রকীটদের চূর্ণ কবল, কিন্তু রাজার রোগের উপসর্গ যেমন ছিল, তেমনি রইল। দ্বিতীয় গুণী প্রথম গুণীর মতই রণে ভঙ্গ দিল। দর্শকেরা বলল, না, এ তো তবে বজ্রকীট নয়।

এবার এল তৃতীয় গুণী। সে পিশাচসিদ্ধ।

সে বেশী পরীক্ষা না করে প্রথম দৃষ্টিতেই আসল ব্যাপারটা বুঝে নিল। সে বলল, না, অন্য কিছু নয়, রাজার উপরে পিশাচ ভব করেছে। পিশাচ! পিশাচ! দর্শকদের মধ্যে রব পড়ে গেল।

পিশাচসিদ্ধ গুণী অদৃশ্য পিশাচকে উদ্দেশ করে তীব্র কটূক্তি উদ্‌গীরণ করে চলল, আর তর্জন গর্জন করে আত্মমহিমা প্রচার করতে লাগল। সে তার মন্ত্র বলে চলল:

ষাঁড়ের মালিকদের কাছে ব্যাঘ্রের মত আমিও পিশাচদেব কাছে বিভীষিকাস্বরূপ। সিংহকে দেখে কুকুরেরা যেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়, আমাকে দেখে পিশাচরাও তাই করে। আমি কোন গ্রামে প্রবেশ করলেই সেই গ্রামের পিশাচদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হয়। যে-গ্রামে আমি আমার প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করি, সে গ্রাম পিশাচশূন্য হয়ে যায়।

রাজদেহে সত্য-সত্যই যদি পিশাচ থাকত, তবে এ সমস্ত কথা শুনবার পর সে হয়তো বা ভয় পেতেও পারত। কিন্তু কি ঘটল কিছুই বোঝা গেল না। রাজার রোগের বিন্দুমাত্র উপশম দেখা গেল না।

পনেরো

সাত্যকি চমকে উঠল !

তুমি বলছ কি উলুপী ? কি আশ্চর্য, এমন গুরুতর একটা ঘটনা, আর তিনদিন বাদে তুমি আমায় সে কথা বলতে এলে !

আমি কি করব ! কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে উঠল উলুপী। সেই থেকে তিন দিন ধরে তোমায় খুঁজে খুঁজে মরছি ! আজ তো মোটে তোমার দেখা পেলাম।

বল, সব কথা খুলে বল—গোড়া থেকে বল।

উলুপী বলে চলল :

তুমি তো জানই, রাজার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। রাজবৈদ্যেরা এলেন, গুণীরা এলেন, যার যতদূর সাধ্য করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। জ্বরের দাহ আর জ্বালা কমার কথা দূরে থাক, দিন দিন বেড়েই চলেছে। যখন জ্বরের দাহ বেড়ে যায় রাজা অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা পাগলের মত অর্থহীন কি সব কথা বলেন। তাঁর চেহারার সেই শ্রী আর নেই। সারা শরীর হলদে হয়ে এসেছে, চোখ দুটো ঘোলাটে। দেখলে সেই মানুষ বলে আর চেনা যায় না। লোকে বলাবলি করে, এ যাত্রায় আর বাঁচানো যাবে না। যে-দানব তাঁর উপর ভর করেছে, সে তাঁকে না নিয়ে যাবে না। লোকে বলে, গুণীর মত গুণী যদি থাকত তা হলে রাজাকে বাঁচানো যেত বই কি ! কিন্তু আজকালকার দিনে তেমন গুণী কোথায় ?

একদিন রানীমা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, উলুপী, এখন বল, কি করব আমি ? এত দিন ধরে দেখছি, রানীমা বড় শক্ত ধাতের মানুষ, কোনদিন তাঁর চোখে জল দেখি নি। তাঁর

অবস্থা দেখে আমার চোখেও জল এসে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে বললাম, এক কাজ করতে পার মা। এখান থেকে এক ক্রোশ দূর হবে, লখাই নামে এক চণ্ডাল বৈদ্য আছে। তার খুব নাম-ডাক। চোখে তো দেখি নি, সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে লোকে বলে, মরা মানুষও নাকি বাঁচাতে পারে। লোকটা ক্ষ্যাপার মত। আবার একটু গোঁয়ারও বটে। নিজের বাড়ি ছেড়ে সহজে আর কারু বাড়ি যেতে চায় না। তাকে আনিয়ে দেখলে পার মা একবার। উঁহুঃ, তাও তো হবে না।

কেন হবে না? রানীমা জিজ্ঞাসা করলেন।

তার তো জাত নেই, ধর্ম নেই, আচার নেই, বিচার নেই—যাকে বলে অস্পৃশ্য চণ্ডাল। তোমরা তো তাকে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। তবে আর সে চিকিৎসা করবে কেমন করে?

কেন ঢুকতে দেব না? নিশ্চয় দেব। এমন বিপদের সময় এখন কিসের আচার, কিসের বিচার। তুই যা উলূপী, যেমন করে পারিস্ তাকে বলে-কয়ে কোন মতে রাজি করা, কখন আসবে গিয়ে একবার সেই কথাটা ঠিক করে আয়।

আমি বললাম, ও মা, আমি মেয়েমানুষ, আমি একা অত দূরে কেমন করে যাব? তোমার তো কত লোকজন আছে, আর কাউকে পাঠাও।

রানীমা আমার হাত দুটো ধরে বলল, না মা, তোকেই যেতে হবে। ক্ষ্যাপা মানুষ, একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে হবে তো। যাকে তাকে পাঠিয়ে আমার বিশ্বাস হয় না। সে কখন আসবে, আগে তুই সেই কথাটা জেনে আয়। যেমন করে পারিস্ জেনে আয়।

কি আর করি, ভাবলাম তোমাকেই পাঠাব সেই লখাই বৈদ্যের কাছে। কিন্তু খুঁজে খুঁজে কোথাও তোমাকে পেলাম না। শেষে কি করব, রানীমার মুখখানির কথা মনে করে নিজেই চললাম। কোন

দিন কি আর একা অত দূরে গেছি। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল, কে জানে, কি আছে কপালে!

গিয়েছিলে তো শেষপর্যন্ত? সাত্যকি জিজ্ঞেস করল।

না গিয়ে কি করব! যেতেই হোল যে। ও অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে চেনে। খুঁজে বার করতে কোনই অসুবিধা হোল না। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই পচা গন্ধে আমার পেটের নাড়ী উল্‌টে আসতে চায়। চেয়ে দেখি উঠানের এখানে ওখানে নানা রকমের জানোয়ারের দেহ পড়ে আছে। কোনটার চামড়া ছাড়ানো, কোনটার মাংস ছাড়ানো, কোনটার বা শুধু হাড় পড়ে আছে। আমি তো দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। লোকটা মড়া জানোয়ারের মাংস খায় নাকি!

উঠানের এক কোণায় বসে ধারালো চকচকে একটা ছুরি দিয়ে লখাই বৈদ্য একটা মড়া কুকুর কাটছিল। পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দিকে মুখ ফেরাল। তখন দেখলাম, সে কি তার চেহারা! ইয়া লম্বা লম্বা চুল-দাড়ি, চোখ দুটো লাল টকটকে। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কে রে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, আমি—আমি উলূপী

কি, উলূপী? সেটা আবার কি? তুই কি মেয়েমানুষ নাকি?

আমি বললাম, হ্যাঁ গো, আমি মেয়েমানুষ

মেয়েমানুষ? কই, কোন মেয়েমানুষ তো একা একা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে সাহস করে না। আমি যদি পরীক্ষার জন্য তোকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলি, কি করবি তবে?

কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। ও বাবা, এ আবার কি কথা বলে! আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে সে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, কি রে, খুব ভয় পেয়েছিস্ নাকি? ভয় পাবার তো কথাই। তেমন বিপদে না পড়লে কেউ তো আমার এখানে আসে না।

তার এই কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে চট করে একটা কথা বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, আমিও খুব বিপদে পড়েই এসেছি। এই বলে কথা শুরু করে আমি রাজার অসুখের কথা সমস্ত খুলে বললাম। সে মন দিয়ে আমার কথা শুনল, শেষে বলল, ভাগ্, আমি তোর রাজার বাড়ি-টারি যেতে পারব না। সে ডাকবে আর আমি দৌড়াব! কেন, আমি তার কি ধার ধারি? রানীমার মুখখানি আমার মনে পড়ল। অমনি ভয়-টয়ের কথা ভুলে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম।

অনেক বলতে বলতে শেষে একটু যেন নরম হয়ে এল। বলল, আমার সঙ্গে চুক্তি কর—কি দিবি আমাকে?

কি চাও তুমি বল না। রানীমা তোমাকে খুশি করে দেবেন।

ও সমস্ত আলগা কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সোজা কথা। যদি রাজা আমার চিকিৎসায় সেরে ওঠে, আমাকে তিন ছিলিম গাঁজা খাওয়াবি। আর যদি রাজা মরে যায়, তবে রাজার লাশটা আমাকে দিবি। আমার একটা মড়া মানুষের বড় দরকার।

আমি বললাম, ওমা, কি সর্বনেশে কথা গো, এ কি কেউ দেয়? আর তুমি তার চিকিৎসা করবে, তবে সে মরবে কেন?

নাঃ, মরবে কেন? মুখ ভেংচে কেটে উঠল লখাই। চিকিৎসা করলেই যেন লোক বাঁচে আর কি। মানুষের মধ্যে কি আছে না আছে, মানুষ তার কি জানে? কেমন করে চিকিৎসা করবে? আর কত বৈদ্য আছে, তারা তো যমের দোসর। যে-রোগী এমনিতেই বেঁচে উঠত, এই সব বৈদ্যের হাতে পড়লে তারা চিকিৎসার গুণে মরে। থাক ওসব কথা। এ কথা তোকে বলে হবে কি! এখন তোর কথা তুই বল। রাজা মরলে তার লাশটা দিবি তো আমাকে?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মড়া দিয়ে করবে কি তুমি?

করব কি? দেখছিস্ না কি করব? কেটে কুটে দেখব ওর ভিতরে কি আছে। দেখব, কোন যন্তরটা কি রকম। আর দেখব, এমনি

মানুষ আর রাজা মানুষ তার মধ্যে তফাৎটা কি? রাজা কি বাইরেই রাজা না ভিতরেও রাজা? না তুই আমার দরকারী সময় নষ্ট করে দিচ্ছিস্। যা বলবার চটপট করে বলে ফেল।

আমি বললাম, না গো না, ও চিন্তা তুমি ছাড়। রাজা যদি মরে যায় তার লাশ তোমাকে কিছুতেই দেবে না। এমনি মানুষ, তারাই দেয় না, এ তো রাজরাজড়ার কথা।

লখাই বৈদ্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, হুঁ, ঠিকই বলেছিস্ তুই। মানুষ জাতটা বিষম পাগলের জাত। মানুষ যখন মরল, তখন তার আর রইল কি? কিছু মাটির পিণ্ডি আর কিছু জল—এই তো? কিন্তু কে বোঝে সেই কথা! এই চিকিৎসা করে কত লোককে বাঁচালাম, আর কত লোককে মারলাম, কিন্তু একটা মড়া কেউ দেবে না। অন্যের কথা বলব কি, আমার নিজের ছেলেটা মরল। একটা মাত্র ছেলে, দুঃখ হবেই তো। যতক্ষণ কাঁদবার কাঁদলাম, তার পর চোখের জল মুছে নিয়ে এই ছুরিটা দিয়ে ফেড়ে ফেললাম ওর দেহটা। তাই না দেখে আমার বউটা আছাড় পিছাড় খেয়ে কি যে করল কাণ্ডটা, আমি আর ওকে সামলে রাখতে পারি না। তার পর দিন আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই-যে গেল, আর তার কোন খবর জানি না। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তাই বা কে বলবে!

তার কথা শুনে.আমার হাত-পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। এ কি মানুষ না আর কিছু! কিন্তু মানুষ হোক আর যাই হোক, ওকে না হলে-যে আমার চলবে না। আমি বললাম, দেখ, আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। এক জন আছে বটে, কিন্তু সে তো থেকেও নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি; আমি মরলে তুমি আমার লাশটা নিয়ে নিও। আর সেই লাশটা নিয়ে তুমি কেটে ছিঁড়ে যা খুশি তাই কোরো। এখন বল তুমি রাজবাড়িতে কখন যাবে?

আমার কথা শুনে সে হো হো করে বিকট হাসি হেসে উঠল

শেষে বলল, কবে তুই মরবি, তত দিন আর আমি সেই আশায় বেঁচে থাকব !

পাগল হোক আর যাই হোক, লোকটা আসলে খারাপ নয়। শেষ পর্যন্ত আমার কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, যা তুই এখন। আমি ওষুধ-বিষুধ যোগাড় করে নিই। বনের মধ্যে গাছগাছড়া খুঁজে বার করতে সময় লাগবে তো। কাল এমনি সময় একজন লোক এসে যেন আমাকে নিয়ে যায়। আমি জংলী মানুষ, রাজবাড়ির পথঘাট চিনি না। আর আমার মত লোককে রাজবাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতেও দেবে না।

সাত্যকি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, তুমি তো তোমার লখাই বৈদ্যের কথা বলতে বলতেই সময় কাটিয়ে দিলে। আসল কথাটা তো কিছুই বলছ না।

উলুপী একটু তেতে উঠল, তবে-যে বড় বলছিলে, গোড়া থেকেই বল। আগে যদি বলতে, আমি না হয় আগা থেকেই বলতাম। আর তোমার আক্কেলটাই বা কেমন ! আমি একলা মেয়েমানুষ এত সাহস করে গেলাম, আর এত কষ্ট করে ওকে রাজি করালাম, সে কথা একটু বলব না !

সাত্যকি হেসে উঠল, লখাই বৈদ্যের কথা শুরু হলে মুখ বুঝি আর থামতে চায় না। লোকটার ঘরে বউ নেই শুনেছ, আর অমনি তোমার চোখ পড়েছে। এ কি, এ কি, অমন করে চোখ পাকিয়ে উঠছ কেন ? থাক, থাক, মাপ চাইছি, আর এমন হবে না। এখন যে-কথা বলছিলে সেই কথাই বল। তবে এবার গোড়া ছেড়ে একটু আগার দিকে ওঠ।

উলুপী হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, এখন হাসছি বটে, কিন্তু হাসবার কথা নয় বাড়ি গিয়ে রানীমাকে বললাম, লখাই বৈদ্যের সঙ্গে তো সব ঠিক করে এসেছি। এখন তোমরা বললেই হয় ! রানীমা রাজার কাছে গিয়ে এ কথা বললেন। রাজা তাঁর কথা শুনে মাথা

নেড়ে বললেন, না না, তা কি হয়! অশুচি, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, সে কেমন করে রাজার চিকিৎসা করবে? আমাদের রাজবংশে এমন ঘটনা এখনও ঘটে নি।

রানীমা বললেন, ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল, রোগের পক্ষে সে কথা গৌণ। দক্ষ বৈদ্য কিনা, এ ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বিবেচ্য।

রাজা ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, রানী, তুমি বুঝছ না, তুমি তোমার অধিকার বহির্ভূত কথা বলছ। আমার রোগমুক্তির ব্যাপারে যা করণীয় তা রাজপুরোহিতই করছেন ও করবেন। এ বিষয়ে তোমার বা আমার কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রানীমা কিছুতেই এ কথা মানতে চাইলেন না। তিনি নানা রকম যুক্তি দিয়ে রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। শেষপর্যন্ত রাজা বললেন, আচ্ছা, রাজপুরোহিতকে লোক পাঠিয়ে আনানো যাক। দেখি, তিনি কি বলেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া এ কাজ কখনোই হতে পারে না। এই অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারে রানীমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি রাজবংশের এই চিরাচরিত বিধিকে লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

যথাসময়ে রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন এলেন। রানীমা আর আমি যবনিকার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। ঘরের মধ্যে রইলেন একমাত্র রাজপুরোহিত আর রাজা। রাজা রাজপুরোহিতকে সব কথা খুলে বললেন। উষস্তি চাক্রায়ন রাজার বক্তব্য শোনবাব পর একটু সময় চুপ করে থেকে শেষে বললেন, না, না, সে কেমন করে হবে? অশুচি অস্পৃশ্য চণ্ডাল পবিত্র রাজঅঙ্গ স্পর্শ করবে বা তাঁর চিকিৎসা করবে, এ একেবারেই অশাস্ত্রীয়, কাজেই অসম্ভব।

কথাটা আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কিন্তু রাজার মুখে আর কোন কথা ফুটল না। এর উত্তরে কিছু একটা বলা দরকার, অথচ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না, দূর থেকে হলেও রাজার মুখের ভাব থেকে এ কথাটা আমরা বুঝতে পারছিলাম।

কে গিয়েছিল সেই চণ্ডালের কাছে? উষস্তি চাক্রায়ন রাজার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

একটু সময় নিঃশব্দতায় কেটে গেল। তারপর রাজা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমাদের এক দাসী গিয়েছিল।

দাসী? কে পাঠিয়েছিল তাকে? এত অতি-উৎসাহ কার? এই অনধিকার চর্চার ধৃষ্টতা কোথা থেকে পেল সে?

এ কথা শুনে আমার বুক ভয়ে দুর দুর করে উঠল। কি ঘটবে এখন কে জানে! রাজা কিন্তু তাঁর এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

কে পাঠিয়েছিল তাকে? আবার সেই প্রশ্ন। এবার গলার স্বর এক পর্দা উঁচুতে উঠে গেছে। তবু কোন উত্তর নেই। হঠাৎ চমকে উঠলাম। রানীমা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে ঠেলে, পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে উষস্তি চাক্রায়নের মুখোমুখী গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমার বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল। এতদিন বাদে রানী সুদক্ষিণা আজ উষস্তি চাক্রায়নের মুখোমুখী হয়েছেন। তাঁর এত দিনের কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ যেন আগুনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ছুটে চলেছে পতঙ্গ। হায় হায়, কে তাঁকে রক্ষা করবে?

আমি—আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।

উষস্তি চাক্রায়ন চমকে উঠে রানীমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম রাজার চোখে সে কি এক আতঙ্কের দৃষ্টি!

তুমি কে? তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন উষস্তি চাক্রায়ন।

আমি রানী সুদক্ষিণা।

হুঁ, সেই রকমই অনুমান করছিলাম। তা নইলে কার এমন ধৃষ্টতা! রানী সুদক্ষিণা, তুমি তোমার অধিকারের সীমানা পদে পদেই ভুলে যাচ্ছ, সে কথাটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটু সহজ ও স্পষ্ট করে বলুন, রানীমা বললেন।

উষস্তি চাক্রায়ন স্থির দৃষ্টিতে রানীমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে নিয়ে তারপর বললেন, অনেক কথা জমে আছে, সে সব যথাসময়ে হবে। কিন্তু আপাতত এই কথাটার উত্তর দাও, রাজার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভার নিজ হাতে তুলে নেবার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে? কেন তুমি সেই চণ্ডালের কাছে দাসীকে পাঠিয়েছিলে?

রানীমা বললেন, পত্নী রুগ্‌ণ স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করবে, চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে, এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত কথা। এখানে অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন ওঠে না।

রাজার স্বাস্থ্যের প্রশ্ন নিয়ে ভাববার জন্য তোমার চেয়ে যোগ্যতর লোক যখন রয়েছে, তখন তোমার তা নিয়ে চিন্তা করবার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। তোমার রানীর অধিকার ও দায়িত্ব রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতি উৎসাহের বশে তার বাইরে হাত বাড়ানোটা বাঞ্ছনীয় নয়। নারী জাতি আপনার নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পদক্ষেপ করবে, এটা শাস্ত্রসম্মত কথাও নয়।

আপনি কোন্ শাস্ত্রের উল্লেখ করছেন, অনুগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা করে বলুন। রানীমার কণ্ঠে তাঁর সুপরিচিত বিদ্রূপের ভঙ্গি ফুটে উঠল।

উষস্তি চাক্রায়ন যেন তা গায়ে মাখলেন না, বললেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করি না। কিন্তু আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে চলা-ফেরা করা ভাল, নইলে তার পরিণাম শুভ হয় না।

এর উত্তরে রানীমা যে উক্তি করলেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। যেন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কি দুঃসাহস! কি দুঃসাহস! সেই দুঃসাহসই তাঁর কাল হোল। ঠোঁটের আগায় কুটিল হাসি হেসে রানীমা বললেন, অধিকার-ভেদ বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু এই রাজ্যে কে-ই বা সে কথা মেনে চলে! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সমাজকে পথ দেখাবেন যাঁরা, তাঁরা কি করছেন!

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শাস্ত্রচর্চা, যজন ও যাজনের সাত্বিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে তাঁদের মন আর আটকে থাকতে চাইছে না। তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে সিংহাসনের দিকে।

অমন-যে উষস্তি চাক্রায়ন, এবার তাঁর মুখেও কোন কথা ফুটল না। কতক্ষণ হাঁ করে রানীমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। এমন খোলাখুলিভাবে এমন স্পষ্ট কথা কেউ তো কোনদিন তাঁর সামনে বলতে সাহস পায় নি। এ তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা। বোধ হয় সেজন্যই তিনি অমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

রানীমা তখনও বলে চলেছেন, এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। রাজশক্তিকে করায়ত্ত করবার আশায় ভার্গব পরশুরাম দীর্ঘ একুশ বছর ধরে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, পৃথিবীবাসী সে কথা কোনদিন ভুলবে না। আমার পিতার রাজ্যেও আমি ব্রাহ্মণদের এই শক্তির খেলা খেলতে দেখেছি। কিন্তু গোকর্ণ প্রদেশে এ খেলার পদ্ধতিই স্বতন্ত্র। এ যেন এক জাদুকরের ভেলকি। জাদুকর তার মন্ত্র পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেত আর অপদেবতাদের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। তখন ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে, গুপ্তহত্যায় রাজপথের মাটি লাল হয়ে যায়, শান্তির দেশে অশান্তির বান ডাকে। আর জাদুকর আড়ালে বসে হাতে হাতে তাল বাজায়।

উষস্তি চাক্রায়ন হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন, আঃ পাপিনী, তোর ওই চক্ষুযুগল দগ্ধ হোক, রসনা খসে পড়ুক।

আড়াল থেকে দেখলাম, উষস্তি চাক্রায়নের চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে। মনে হোল ওই চোখ যার উপরে পড়বে, তার আর রক্ষা নেই। কিন্তু রানীমা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলেন আর বললেন, গুরুদেব, আমি পতঙ্গও নই, কোন সহজ দাহ্য বস্তুও নই যে, ওই চোখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। আপনি অন্য শিকার দেখুন।

উষস্তি চাক্রায়নের সেই বাঘের গর্জনে রাজপ্রাসাদের বাসিন্দারা এদিক থেকে ওদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। তাই দেখে তিনি

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে আপনাকে সামলে নিলেন। আবার সেই সৌম্য, প্রশান্ত, উজ্জ্বল মুখশ্রী। কে বলবে একটু আগে এই মুখমণ্ডলই কি বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল! কেউ লক্ষ করে নি, উষস্তি চাক্রায়নের এই গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই রোগশয্যায় শায়িত দুর্বল রাজা উত্তেজনার ঝোঁকে উঠে বসেছেন। তাঁর চোখে ভীষণ আতঙ্ক! আমিও প্রথমে দেখি নি। প্রথমে দেখলেন রানীমা। তিনি ছুটে গিয়ে শিশুর মত রাজাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে-আস্তে তাঁকে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, তুমি কিছু ভেবো না। ওসব কিছু না, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো।

উষস্তি চাক্রায়ন দু'পা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বললেন, পতিব্রতা সতী, তোমার কোন্ কথা আমি না জানি! রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য ক্ষত্রিয় যুবদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের উত্তেজিত করছে কে?

রানীমার হাত দু'টি তখনও রাজাকে ঘিরে জড়িয়ে আছে। উষস্তি চাক্রায়নের কথা শোনবার পর রাজার মুখের ভাবটা কেমন হোল ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হোল যেন তাঁর চোখ দু'টি রানীমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল, এ কি সত্যি?

না, না, না, ওগো সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। এই মিথ্যাবাদী চক্রান্তকারী ব্রাহ্মণের কোন কথা তুমি বিশ্বাস করো না। তোমার বিরুদ্ধে নয়, তোমার বিরুদ্ধে নয়, আমি চেয়েছিলাম তোমাকে ওর চক্র থেকে বার করে নিয়ে আসতে। কিন্তু আমি পারি নি, সেদিন আমার হার হয়েছে। কিন্তু আজ তো তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, আজ আর আমাকে ওর কাছে হেরে যেতে দিও না। তুমি ওর হাতে ধরা দিও না।

রানীমার লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই ছিল না। রাজার মাথা নিজের কোলের উপর তুলে নিয়েছেন। আমি এবার দেখতে পাচ্ছিলাম রাজা চোখ বুজে পরম নির্ভরতায় শুয়ে আছেন। উষস্তি চাক্রায়ন কাছেই

দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁকে যেন ওরা দেখেও দেখছেন না। কি সুন্দর-যে লাগছিল দু'জনকে, এমন আর আমি কোনদিন দেখি নি।

উষস্তি চাক্রায়ন বলে উঠলেন, পতিব্রতা সতী, তোমার কোন্ খবর আমি না জানি? তুমি কি প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র কর নি যে, রাজাকে বন্দী করে রেখে তোমার শিশুপুত্র চিত্রকেতুকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে তুমি রাজ্য চালাবে? পতিব্রতা সতী, তুমি কি তোমার রূপ-যৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণ ক্ষত্রিয় বীরদের তোমার পক্ষে টেনে আনতে চেষ্টা কর নি? আমার কাছে কোন কথা চাপা থাকে না। দেবতারা নিজেরা আমাকে খবর দিয়ে যান। পতিব্রতা সতী. সমস্ত পৃথিবীকে তুমি ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু উষস্তি চাক্রায়নের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

কি ভয়ানক সব কথা! আমি তাঁর ধীর-স্থির সৌম্য মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ওই মুখ থেকে এমন কথাগুলি কেমন করে বেরিয়ে আসছে! প্রত্যেকটা কথা রাজার উপর কঠিন ভাবে ঘা মারছিল। রাজা ছটফট করে বলে উঠলেন, রানী, রানী, বল, ওসব কথা মিথ্যা, না? আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করি। তুমি শুধু বল, এসব মিথ্যা, সব মিথ্যা।

এতক্ষণে রানীমার মুখ আশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে রাজার কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ মিথ্যা, সব মিথ্যা। এই পাপমূর্তি ব্রাহ্মণ মিথ্যাচারী, চক্রান্তকারী, তার কোন কথায় কান দিও না। সে তোমার শত্রু, আমার শত্রু, সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শত্রু। অনন্ত নরক তাকে প্রজ্বলিত করুক। রাজা যেন তারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করলেন, হ্যাঁ, অনন্ত নরক তাকে প্রজ্বলিত করুক। তারপর কি মনে করে কে জানে রাজা চোখ মেলে উষস্তি চাক্রায়নের মুখের দিকে তাকালেন। উষস্তি চাক্রায়নের তীব্র দৃষ্টি এবার রাজার দৃষ্টির সঙ্গে মিলল। সঙ্গে সঙ্গেই রাজা যেন সাপ দেখে আঁতকে উঠে রানীমার কোলে মুখ লুকালেন।

রানীমা বুঝলেন, রাজা উষস্তি চাক্রায়নকে দেখে ভয় পেয়েছেন। পাখি যেমন করে তার শাবককে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘিরে ধরে, রানীমা তেমনি করে রাজাকে আবৃত করে রাখতে চাইলেন। উষস্তি চাক্রায়নের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বিড় বিড় করে কি যেন পাঠ করছেন। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভরে উঠল আমার মন। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। তার পর উষস্তি চাক্রায়ন ডাকলেন, রাজা বৃষকেতু!

রাজা কোন উত্তর দিলেন না।

উষস্তি চাক্রায়ন দ্বিতীয় বার ডাকলেন, রাজা বৃষকেতু!

এবারও রাজা কোন উত্তর দিলেন না!

উষস্তি চাক্রায়ন তৃতীয়বার ডাকলেন, রাজা বৃষকেতু!

এবার রাজা যেন কোন গভীর প্রদেশ থেকে উত্তর দিলেন,— উঁ।

রাজা বৃষকেতু, এবার তুমি বুঝতে পারছ, রানী সুদক্ষিণা চক্রান্ত-কারিনী, সে তোমার বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল— তোমাকে বন্দী করে রেখে নিজে রানী হতে চেয়েছিল?

রাজা এবার ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

রাজার কথা শুনতে পেয়ে রাণীমা আর্তনাদ করে উঠলেন।

রাজা বৃষকেতু, এবার তুমি বুঝতে পারছ, রানী সুদক্ষিণা ব্যাভিচারিণী?

রাজা এবার স্পষ্টতর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

এবার উষস্তি চাক্রায়ন আর আমি দু'জনেই চমকে উঠলাম। রানীমা বাঘিনীর মত উষস্তি চাক্রায়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। উষস্তি চাক্রায়ন এ রকম একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে উঠে প্রথমে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। পরক্ষণেই দু' হাতে রানীমাকে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝের উপর। আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রানীমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম, রানীমা

অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। অন্যান্য দাসদাসীরাও কাছেই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে তারাও একে একে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে রাজা তাঁর শয্যায় অসাড়ের মত পড়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে আছেন বুঝবার উপায় নেই। উষস্তি চাক্রায়ন তাঁর শিয়রের পাশে গিয়ে বসেছেন। যেখানে এতক্ষণ রানীমা ছিলেন। তিনি রাজার কানের কাছে কি যেন বিড় বিড় করে বললেন, রাজা এবার তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠেই ডাকলেন, দাসদাসীরা, তোরা এদিকে আয়।

তাঁর ডাকে দাসদাসীরা কাছে এগিয়ে গেল। উষস্তি চাক্রায়ন ঝুঁকে পড়ে বিড় বিড় করলেন। রাজা বললেন, তোরা রানীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা। দাসদাসীরা অবাধ্যতা করলে শাস্তির জন্য তাদের যে-অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হয়, সেখানে রানীকে আটকে রাখ। দাসদাসীরা একথা শুনে চমকে উঠল। তারা কথাটা শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিল না, জিজ্ঞাসা করল, কি বললেন?

উষস্তি চাক্রায়ন আবার ঝুঁকে পড়লেন। রাজা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিয়ে আটক করে রাখ। কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে না পারে। এর পর তার বিচার হবে।

দাসদাসীরা রানীমার অচেতন দেহটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আমি যেমন ছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

একটু পরেই রাজার মেজো রানী আর ছোট রানী এসে ঘরে ঢুকলেন। উষস্তি চাক্রায়ন তাদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা দু'জন পালা করে সব সময় রাজার কাছে থাকবে। আর খুব সাবধান, রানী সুদক্ষিণা যেন কোন মতে ও ঘর থেকে পালিয়ে এ ঘরে চলে আসতে না পারে। তারপর আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, তোমাদের এই দাসীটাকে এখনই বিদায় করে দাও।

উলুপী তার কাহিনা শেষ করে থামল। তারপর উলুপী আর

সাত্যকি দু'জনেই কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। শেষে সাত্যকি বলল, অদ্ভুত, অদ্ভুত এই কাহিনী। উলুপীও তেমন করেই বলল, হ্যাঁ, অদ্ভুত, অদ্ভুত এই কাহিনী। কিন্তু সাত্যকি, বল তো, এর পর কি হবে?

এর পর কি হবে? সাত্যকি কেমন করে তা বলবে? এ কথার উত্তর দিতে পারে এমন কে আছে? স্বয়ং উষস্তি চাক্রায়ন—সেও হয়তো এর উত্তর দিতে পারবে না।

রাজার অবস্থা দিন দিন দ্রুত অবনতির পথে চলল। শেষপর্যন্ত দেখা দিল মারাত্মক উদরী রোগ। উদরী রোগ তো সাধারণ রোগ নয়। শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন, বরুণ দেবের কুদৃষ্টি পড়লে মানুষের উদরে জল জমতে থাকে। জল জমতে জমতে উদর প্রদেশ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত হয়ে ওঠে; হাত-পা'গুলি কাঠি কাঠি হয়ে আসতে থাকে। চোখমুখ বসে গিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করে। মানুষের চেহারা আর মানুষের মত থাকে না।

স্বয়ং ধন্বন্তরির অসাধ্য এই রোগ। এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। দু'দিন আগেই হোক বা পরেই হোক, রোগীর মৃত্যু অবধারিত। বরুণ দেব যার উদ্দেশে তাঁর পাশ নিক্ষেপ করেন, তার আর রক্ষা নেই। পাশবদ্ধ বন্দী পশুর মতই তিনি তাকে সংহার করেন। একমাত্র বরুণ দেব যদি প্রসন্ন হন, তবেই তার আরোগ্য-লাভ সম্ভব। কিন্তু বরুণ দেবের ক্রোধ চণ্ডালের মত প্রচণ্ড ক্রোধ, সেই ক্রোধকে শান্ত করা তো সহজ কথা নয়।

উষস্তি চাক্রায়ন নাকি বলেছেন, বরুণ দেবকে প্রসন্ন করবার জন্য পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে হবে। বরুণ দেবকে প্রসন্ন করতে হলে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এ নিয়ে বিচারে বসেছিলেন সবাই এ কথা সমর্থন করলেন। শুধু পশু বলি নিয়ে বরুণ-দেব তৃপ্ত হন না, সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বলি চাই। তারই

নাম পুরুষমেধ যজ্ঞ। কিন্তু পুরুষমেধ যজ্ঞের কথা স্মরণ করে চিন্তিত হয়ে উঠলেন সবাই। পুরাকালে লোকে এই যজ্ঞ করত, শাস্ত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইদানীং এই যজ্ঞ কেউ করে না। এখনকার লোকদের মন বড় নরম হয়ে উঠেছে, তারা মানুষ বলির কথা শুনলে চমকে ওঠে।

যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে স্বচ্ছন্দে মারে, তাতে কারু বাধে না। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে জল্লাদ যখন বধ করে, বহু কৌতূহলী দর্শক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। দেখবার জন্য অনেক দূর দূর থেকেও লোকেরা আসে। একটা মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। জন্মের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে মৃত্যু। তবু এই জ্ঞান-বৃদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যেন মন খুলে সায় দিতে পারছেন না। মৃত্যু অতি সুলভ, অতি তুচ্ছ, এ কথা সত্য। কিন্তু যজ্ঞভূমিতে মানুষকে পশুর মতই যূপবদ্ধ করে হত্যা করা—তার মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে যেন লাঞ্ছিত করা হয়। এখনকার মানুষের মন এভাবে মানুষকে পশুর সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে সন্নিবিষ্ট করতে চায় না। তাই তাদের অন্তরে অন্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগে। কিন্তু সেই প্রতিবার জানাবার মত উপযুক্ত যুক্তি বা ভাষা তারা খুঁজে পায় না।

কে একজন তরুণ বেদজ্ঞ নাকি আবেগের ভরে বলে উঠেছিলেন, একজন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আর একজনের প্রাণ রক্ষা করা, এব সার্থকতা কি? কোন প্রবীণ লোক অবশ্য এমন কথা বলেন নি, সেই তরুণের অবুঝ তারুণ্যই তাঁকে এই কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

উষস্তি চাক্রায়ন নাকি অবহেলার ভঙ্গিতে তাঁর এই কথাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, একজন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে রাজার জীবনের কখনোই তুলনা হয় না। সহস্র সহস্র লোকের জীবনের বিনিময়ে হলেও রাজার জীবন রক্ষা অবশ্য কর্তব্য। একজন

মানুষ শুধু নিজের জন্যই বাঁচে, আর রাজা জীবন ধারণ করেন সকল প্রজাদের জন্য। রাজার কল্যাণে রাজ্যের কল্যাণ, রাজার ক্ষয়ে রাজ্যের ক্ষয়। রাজা মানুষ হলেও মানুষ নন, শাস্ত্রে রাজাকে দেবতাদের মধ্যে দেবতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই রাজার কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ কথা তো অবিসংবাদিত সত্য। এর বিরুদ্ধে কারু কিছু বলবার মত থাকতে পারে না। তরুণ বেদজ্ঞ লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছিল।

সিদ্ধান্ত হোল যজ্ঞ করতেই হবে। এবার পুরুষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনায় বসলেন ব্রাহ্মণেরা। এই যজ্ঞ প্রাচীন কালের রীতি। শাস্ত্রাদি ঘেঁটেঘুঁটে এই যজ্ঞের ব্যবস্থা পাওয়া গেল —এই যজ্ঞে ১৮৪ জন মানুষকে বলি দিতে হয়। ১৮৪ জন! কথাটা চমকে উঠবার মতই। অবশ্য "সহস্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে হলেও রাজার জীবন রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য", সে বিষয়ে কারু মনে কোন সন্দেহ নাই। তা হলেও, ১৮৪ জন মানুষের বলির বিধান দেখে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমবেত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ হারীত বললেন, পুরুষমেধ যজ্ঞ বলতে-যে এক রকমের যজ্ঞই বোঝায়, তা নয়। দেবতা ও প্রয়োজন ভেদে তার নানা রকম রূপ হতে পারে। আবার স্বতন্ত্র ভাবে পুরুষমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেও অন্যান্য নামের যজ্ঞের মধ্যেও মনুষ্য বলি দেওয়া যেতে পারে। ১৮৪ জন মনুষ্য বলি-যে সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য-প্রতিপাল্য তা নয়।

তাই নাকি? স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সবাই বৃদ্ধ হারীতের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। তারা বললেন, আর্য, আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন।

তিনি বললেন, তোমরা কি শুনঃশেপের কাহিনী জান না?

কেউ কেউ বলল, না, আমরা জানি না।

আবার কেউ কেউ বলল, আমরা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু এখন সঠিক মনে করতে পারছি না। আপনি বিস্তার করে বলুন।

হারীত বলে চললেন, রাজা হরিশচন্দ্র বরুণ দেবের নিকট প্রার্থনা করলেন, আমার পুত্র হোক, তদ্দ্বারা তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক। তখন তাঁর রোহিত নামে পুত্র জন্মাল। তখন বরুণ হরিশচন্দ্রকে বললেন, তোমার পুত্র জন্মেছে, তদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি তখন বললেন, (জন্মের পর অশৌচকালে) দশ দিন গত না হলে পশু মেধ্য (যাগ যোগ্য) হয় না। এর দশ দিন উত্তীর্ণ হোক, তখন তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক।

পরে দশ দিন উত্তীর্ণ হলে বরুণ বললেন, দশ দিন উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন একে দিয়ে আমার যাগ কর। রাজা বললেন, যখন পশুর দাঁত ওঠে, তখন সে মেধ্য হয়। এর দাঁত বার হোক, তখন তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক।

পরে তার দাঁত উঠলে বরুণ বললেন, এর দাঁত উঠেছে, এখন একে দিয়ে আমার যাগ কর। রাজা বললেন, পশুর দাঁত যখন পড়ে যায়, তখন সে মেধ্য হয়। এর দাঁত পড়ুক তখন তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক।

পরে তার দাঁত পডলে বরুণ বললেন, এর দাঁত পড়েছে, এখন একে দিয়ে যাগ কর। তিনি বললেন, পশুর দাঁত যখন আবার জন্মে, তখন সে মেধ্য হয়। এর দাঁত আবার উঠুক, তখন তোমার যাগ কবব। বরুণ বললেন, তাই হোক।

পরে তার দাঁত আবার উঠলে বরুণ বললেন, এর দাঁত আবার উঠেছে, এখন একে দিয়ে আমার যাগ কর। রাজা বললেন, ক্ষত্রিয় যখন সন্নাহ (ধনুর্বাণ কবচাদি) ধারণে সমর্থ হয়, তখন সে মেধ্য হয়। এ সন্নাহ প্রাপ্ত হলে তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক।

পরে সেই (বালক) সন্নাহ প্রাপ্ত হলে বরুণ বললেন, এ সন্নাহ প্রাপ্ত হয়েছে, এখন একে দিয়ে আমার যাগ কর। তাই হোক, বলে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে ডেকে বললেন, হায়, তোমাকে দিয়ে আমার যাগ করতে হবে।

তা হবে না, এই বলে সেই রোহিত ধনু গ্রহণ করে অরণ্যে প্রস্থান করলেন।

তখন বরুণ ইক্ষ্বাকুবংশধর রোহিতকে চেপে ধরলেন—তার উদরি রোগ উৎপন্ন হোল।

রোহিত ষট্ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করলেন এবং সূয়বসের পুত্র ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্তকে দেখতে পেলেন। এই অজীগর্তের শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ, শুনোলাংগুল নামে তিন পুত্র ছিল। রোহিত সেই অজী-গর্তকে বললেন, ওহে ঋষি, তোমাকে এক শত গাভী দিচ্ছি, আমি এদের (তোমাদের পুত্রদের) মধ্যে এক জনকে নিষ্ক্রয় রূপে দিয়ে আপনাকে মুক্ত করব। তখন অজীগর্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে টেনে নিয়ে বললেন, আমি একে কিছুতেই দেব না। মাতা (অজীগর্তের পত্নী) কনিষ্ঠকে (টেনে নিয়ে) বললেন, আমি একে দেব না। তাঁরা উভয়ে মধ্যম শুনঃশেপকে দান করলেন। তখন অজীগর্তকে একশত (গাভী) দিয়ে তিনি সেই শুনঃশেপকে নিয়ে অরণ্য থেকে গ্রামে এলেন। (তদনন্তর) তিনি পিতার নিকট গিয়ে বললেন, অহো, আমি এই ব্যক্তিকে নিষ্ক্রয়স্বরূপ দিয়ে আপনাকে মুক্ত করতে চাই। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণকে বললেন, আমি এই ব্যক্তি দ্বারা তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন, তাই হোক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। এই বলে তাকে রাজসূয় নামক যজ্ঞক্রতু অনুষ্ঠান করতে বললেন। হরিশ্চন্দ্রও রাজসূয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনে শুনঃশেপকে পুরুষ (মনুষ্য) পশুরূপে নির্দেশ করলেন।

হারীত এখানেই তাঁর কাহিনী বন্ধ রেখে বললেন, এই থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ, একটি মনুষ্য বলি পেলেই বরুণ দেব তৃপ্ত হন।

এবার সবাই বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কাহিনী এখন আমাদের সকলেরই মনে পড়েছে। আর্য হারীত সঙ্গত কথাই বলেছেন। এ ক্ষেত্রে একটি মনুষ্য বলি দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

এখন প্রশ্ন উঠল, কোন্ বর্ণের মনুষ্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র?

একজন বললেন, আমাদের যখন বিশেষভাবে কোন মানত নেই, তখন যে-কোন মনুষ্য বলি দিয়ে পুরুষমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করা যাবে।

মন্ত্রী শ্রুতকীর্তি বলল, তাই যদি হয়, তবে শূদ্র বলিই ভাল। আর তা সংগ্রহ করাও সহজ হবে।

বলি সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলের গোপদের ডাকানো হোল। এ কাজের দায়িত্ব কে নেবে? লাঠির উপর ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল এক গোপ, যার নাম নকুল। মাত্র ক' দিন হয় সে শয্যা ছেড়ে উঠেছে।

সে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, এক বৎসরের শিশু হলে চলবে তো?

ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করে বললেন, কেন চলবে না? এই বলিই সর্বোৎকৃষ্ট হবে। শুনঃশেপের কাহিনী থেকে দেখা যায়, শিশুর কচি মাংসের দিকেই বরুণ দেবের রোখটা একটু বেশী।

উষস্তি চাক্রায়ন সংবাদ পাঠিয়েছেন, অবিলম্বে যজ্ঞের আয়োজন শুরু করে দাও। রাজার অবস্থা খুবই খারাপ। ব্রাহ্মণেরা বললেন, এখন আর বিলম্বের কি আছে? নকুল অগ্রণী হয়ে বলি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। মন্ত্রী শ্রুতকীর্তি যজমান হবেন। রাজার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কামনায় তিনিই যজ্ঞ করবেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের দিন-ক্ষণ স্থির করতে বসলেন।

রাজা মৃত্যুশয্যায়, এই সংবাদ সারা নগরময় ছড়িয়ে পড়েছে। পথে ঘাটে এই নিয়ে আলোচনা। দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে ভিড় করে। রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে, ও প্রান্ত থেকে

বৈদ্যরা আসছে, গুণীরা আসছে, আসছে আর যাচ্ছে, কিন্তু রাজার অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাক, দিন দিনই খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। লোকে বলাবলি করে, বরুণ দেবের কোপ যার উপরে পড়েছে, বৈদ্য আর গুণীরা তার কি করবে!

এদিকে এপক্ষ আর ওপক্ষ থ খেয়ে গেছে। রাজা যদি সত্য-সত্যই না বাঁচেন, কার অবস্থা কি দাঁড়াবে? ভবিষ্যৎ বড়ই ঝাপসা মনে হচ্ছে। রাজা বৃষকেতু উষস্তি চাক্রায়নের হাতের যন্ত্র। এই যন্ত্র তাঁর ইঙ্গিতেই চলে। কিন্তু এই যন্ত্র যদি না থাকে? তখন রাজা হবে শিশু চন্দ্রকেতু। সে তো নামে রাজা। শিশু রাজার পক্ষ হয়ে রাজত্ব চালাবেন তার মা অথবা মন্ত্রী। কিন্তু রানী সুদক্ষিণা সে সুযোগ আর পাচ্ছেন না। তাঁর উদ্যত ফণা থেঁতলে চূর্ণ করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তা হলে রাজার প্রতিনিধি হয়ে প্রজাদের সামনে দাঁড়াচ্ছেন কে? শ্রুতকীর্তি। কিন্তু প্রজারা কি তাঁকে মানবে? বৃদ্ধ মন্ত্রীকে যেই মর্যাদা তারা দিত, তাঁকে কি সেই মর্যাদা দেবে? অসম্ভব। এ কথা উষস্তি চাক্রায়ন খুব ভাল করেই বোঝেন। শুধু তিনি নন, তাঁর দলের লোকেরাও এ কথা বোঝে। তাই রাজা বৃষকেতুকে বাঁচাবার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর দল বুঝে উঠতে পারছে না, তাদের পক্ষে রাজার বেঁচে থাকাটা ভাল, না মরে যাওয়াটা ভাল। রাজা বৃষকেতু বেঁচে থাকলে সুবিধাটা কি তাদের? উষস্তি চাক্রায়ন রাজার মারফৎ নিজের ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে কাজে পরিণত করে আসছেন। রাজা তাঁর মুঠোর মধ্যে সুরক্ষিত বন্দী, বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। ফলে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা এমনি ভাবেই চলতে থাকবে। আর রাজা যদি মরে যান, মন্ত্রীর দলের তাতেই বা লাভ কি? তাদের যে-অবস্থা সে অবস্থাই থাকবে। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, তাতে বিপদ আরও বাড়বে। শ্রুতকীর্তির হাতে যখন রাজ্যশাসনের ভার পড়বে, কেউ কাউকে মানতে চাইবে না, দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। আর

তার মধ্যে এই দুই দলের বিরোধ রাজাকে দুর্বল ও ছিন্ন ভিন্ন করে চলবে। ওদিকে শূদ্রেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা যদি একবার সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারে, তখন আমাদের কি গতি হবে ?

দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয়েরা মনে করছে, ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত, এখন আত্মকলহে মত্ত হয়ে থাকবার মত সময় নয়। কিন্তু মনে করলে কি হবে, এত দিন দু'পক্ষ মিলে যে-বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে এসেছে তার ফল কি ফলবে না ? ঘরে আগুন লাগাবার কাজটা মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু আগুন যখন একবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন থাম থাম বললেই সে থামে না। একটার প্রতিক্রিয়ায় আর একটা ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলল।

রাজার মরণাপন্ন রোগের কথা শূদ্রপল্লীর লোকেরাও জানে। কিন্তু তা নিয়ে এখানে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য বা সাড়াশব্দ নেই। রাজা থাকলেই কি আর মরলেই কি ! রাজা বেঁচে থাকতেও তারা দুর্ভোগ ভুগে আসছে, রাজা মরলেও তাদের দুর্ভোগই ভুগে চলতে হবে, তাতে কোন ইতর বিশেষ ঘটবে না।

রাজকর্মচারীরা ওদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। আগে কোন কিছু নিয়ে গোলমাল লাগলে পর স্থানিকদের কাছে মহৎদের ডাক পড়ত। এখন আর মহৎদের ডাকাডাকি করে না। নতুন কর সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা শুরু করছিল। নকুল গোপ খোঁড়া হবার পর থেকে এখন কিছুদিন আসা-যাওয়াটা একটু কমিয়েছে। এখন প্রায়ই আজ এ পাড়া থেকে, কাল ও পাড়া থেকে, আজ এ গ্রাম থেকে, কাল ও গ্রাম থেকে জওয়ান জওয়ান ছেলে-গুলিকে স্থানিকের কাছে ডাকিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে ওদের নিয়ে দাবড়ানি দেয়, নানা ভাবে শাসায়। তারা এদের এক মাস সময় দিয়ে বলেছে, যারা এই এক মাসের মধ্যে নতুন কর পরিষ্কার না

করবে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, যেমন করে সুদাসের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ওরা এদের ভয় দেখিয়ে বলে, যদি ভাল চাস্ তো এখনও বল সুদাসকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্। দু' দিন আগেই হোক আর পরেই হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। তখন তাকে তো শূলে চড়াবই, যারা তাকে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখছে, তাদের শুদ্ধ শূলে চড়িয়ে ছাড়ব।

ছেলেগুলি ডাক পেলেই যায়, সেদিক দিয়ে কোন রকম অবাধ্যতা করে না। ওখানে গিয়ে নেহাৎ যতটুকু কথা না বললেই নয়, ঠিক সেই পরিমাণ কথাই বলে। ভালমানুষের মত চুপচাপ বসে শোনে, তারপর হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসে। স্থানিকেরা, গোপেরা ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কিছুই বুঝতে পারে না। শূদ্রদের এমন নিঃশব্দ মূর্তি ওরা আর কোনদিন দেখে নি। তাই ওরা একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে।

সুদাস আর সাত্যকি বসে কথা বলছিল। পাশেই ইদা খেতুকে নিয়ে বসে আছে। খেতু খেলছে, আর মাঝে মাঝে কখনও মা, কখনও বা বাবার কাছ থেকে আদর কেড়ে নিচ্ছে।

যে-পাড়ায় ওরা বসে ছিল, সেটা সুদাসদের পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কথা বলতে বলতে অপরাহ্ণ হয়ে এল। এমন সময় দু'টি ছেলে এসে ঘরে ঢুকে বলল, সুদাস, খবর বেশী ভাল নয়। পাড়ার অবস্থাটা মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি একটু সরেই পড়।

কেন? কি হয়েছে? সুদাস আর সাত্যকি দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করল।

আমাদের দু'জনকে কাল নিয়ে গিয়েছিল স্থানিকের কাছে। যে-সমস্ত প্রশ্ন করল, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল আমাদের এখান থেকে অনেক খবর ওদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

আমাদের এখান থেকে খবর যাচ্ছে? আমাদের মধ্যে কে আছে এমন? সুদাস আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

সেটাই তো কথা। কিন্তু কেউ না কেউ আছেই। তা না হলে এ সমস্ত কথা ওরা কেমন করে জানবে? ওই খোঁড়াটা নাকি খুব উঠে-পড়ে লেগেছে। এইমাত্র সেদিন বিছানা ছেড়ে উঠেছে, এখনও লাঠি নিয়ে চলতে হয়, এর মধ্যেই তার ফোঁসফোঁসানি শুরু হয়েছে।

সুদাস বলল, ওটাকে সেদিন শেষ করে দিলেই ভাল হোত। বড় ভুল হয়েছে।

এমন সময় একটা মেয়ে ছুটতে ছুটে এসে খবর দিল, সাবধান গো, তোমরা সাবধান!

কি হয়েছে? ওরা চমকে উঠল।

একটা অজানা লোক এসে ঘোরাঘুরি করছে। ক্ষেতে বসে কাজ করছিলাম, এমন সময় আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুন্দুরুর ঘর কোথায়? ওর কথা শুনেই আমার মনে ডাক দিয়ে উঠল, এ তো ভাল লক্ষণ নয়। আমি বললাম, কে জানে, আমি তুন্দুরু-ফুন্দুরু কাউকে চিনি না। এই না বলে আমি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম। তারপর আমাদের পেছনের পথটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি। এখন তোমাদের যা করবার কর।

তুন্দুরু ইতিমধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে প্রশ্ন করল, সে কি গৌরবর্ণ?

না না, কালো। আমাদের চেয়েও কালো। আর সে আমাদের লোক নয়।

তুন্দুরু বলল, যাই, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি।

যুবক দু'টি বাধা দিল, না তুন্দুরু, তুমি এখানেই থাক, আমরা গিয়ে দেখে আসছি। ওরা বেরিয়ে গেল। ইদা বলল সুদাসকে, তোমার আর আজ এখানে থেকে কাজ নেই। তুমি সরে পড়।

সাত্যকি বলল, দাঁড়াও না, সে পরে দেখা যাবে। এখন সুদাস আর ইদা, তোমরা দু'জন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়।

একটু বাদেই ওরা দু'জন আর একজন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে

ফিরে এল। তৃতীয় লোকটিকে দেখে সাত্যকি হো হো করে হেসে উঠল। সাত্যকির হাসি শুনে সুদাস আর ইদা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার সবাই মিলে হাসাহাসি। আব্বন এসেছে—আব্বন।

সুদাস জিজ্ঞাসা করল, আরে আব্বন ভাই, তুমি কেমন করে জানলে যে, আমি এখানে আছি।

সেটাই তো কথা, আব্বন বলল, হাসির কথা নয়। তোমাদের হাসিটা একটু থামাও।

ওরা বলল, ওরে বাপ রে বাপ, একটু হাসতেও পারব না? কেন, এমন কি হয়েছে?

সুদাস, আমাকে ওরা গুপ্তচর পাঠিয়েছে তোমার খোঁজ নেবার জন্য। তুমি এখনও সময় থাকতে পালাও বলছি।

তোমাকে আবার কে পাঠাল? প্রশ্ন করল সাত্যকি।

যাদের পাঠাবার তারাই পাঠিয়েছে গো। আমার প্রভু পুনর্বসুর বাড়িতে রোজই ওদের গোপন সভা বসে। ভাবে-সাবে বুঝি, তোমাদের নিয়ে অনেক কিছুই বলাবলি হয়। আজ ওদের গোপন সভার পরেই আমার প্রভু আমাকে ডেকে বলল, যা তো একবার তুন্দুরুর বাড়িতে। আমরা খবর পেলাম, সুদাস আর তার বউ ইদা এখন তুন্দুরুর বাড়িতেই আছে। তুই দেখে আয় ওরা এখনও ওই বাড়িতে আছে কিনা। আমি বললাম, বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুন্দুরুর কাছে গিয়ে আমি বলব কি? একটা কিছু তো বলতে হবে।

আমার প্রভু বলল, গিয়ে বলবি—শুনলাম, তুমি তোমার গরুটা নাকি বিক্রি করবে। আমার প্রভু একটা গরু কিনতে চান। সেই জন্যই তিনি আমাকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন।

সাত্যকি বলল, তুন্দুরুর বাড়ির খবরটাও ওদের কাছে পৌঁছে গেছে! এ তো মারাত্মক। এই তো মোটে দু'দিন হয় তোমরা এখানে এসেছ, এরই মধ্যে ওরা খবর পেয়ে গেল। চিন্তার কথাই বটে।

যুবক দু'টি বলল, আমরাও তো সেই কথাই বলছিলাম।

তখনই স্থির হয়ে গেল, সুদাস অন্য জায়গায় চলে যাবে। ইদা বলল, সুদাস, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

সবাই বলে উঠল, না না, তুমি আবার কোথায় যাবে! তুমি এখানেই থাকবে।

কি করে বেচারা ইদা, চুপ করেই রইল।

সাত্যকি আব্বনকে বলল, আব্বন, তোমার প্রভুকে গিয়ে বোলো, ইদা তুন্দুরুর বাড়িতেই আছে, কিন্তু সুদাস সেখানে নেই।

রওনা হবার সময় সুদাস বলল, খেতুটা কই? খেতু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইদা ঘুমন্ত ছেলেকে সুদাসের কোলে তুলে দিল। একটু ক্ষণ ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ওকে ইদার কোলে ফিরিয়ে দিতে দিতে সুদাস বলল, দেখিস্, খুব সাবধান, খুব সাবধানে রাখবি।

ইদা উত্তর দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। কোন অপদেবতা ওকে ছুঁতে পারবে না।

সুদাস বলল, অপদেবতার ভয় এখন আমি আর করি না। অপদেবতাদের আমরা যত খারাপ বলি, ওরা তত খারাপ নয়। আমার এখন ভয় শুধু মানুষকে।

ষোলো

গোকর্ণ প্রদেশের অন্তর্গত ইভ্যগ্রামে গোতমপুত্র সন্দীপনের বাস। সামান্য পরিমাণ রাজপ্রদত্ত নিষ্কর ভূমি, এই তাঁর জীবিকার প্রধান সংস্থান। স্বল্পে সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ, নগরের কোলাহল ও জটিলতা তাঁর সহ্য হয় না। তাই নগর থেকে বহু দূরে গাছপালায় ঢাকা ছায়া-শীতল গ্রামের এক প্রান্তে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করে আসছেন। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ, স্বামী আর স্ত্রী, সংসারে এই দু'টি মাত্র প্রাণী। অঋণী, অপ্রবাসী যে-গৃহস্থ শাকান্নহারী হলেও সে প্রকৃত সুখী। ব্রাহ্মণ সন্দীপন ধর্মাচরণ আর শাস্ত্রপাঠে মগ্ন হয়ে থাকেন, এভাবেই তাঁর দিন কাটে।

কিন্তু সেই শাকান্নও যখন দুর্লভ হয়ে ওঠে, তখন? এবার প্রচণ্ড শিলাবর্ষণে এই অঞ্চলের শস্য ব্যাপক ভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে যে-শস্য হয়েছিল, তার অতি সামান্য অংশই ঘরে উঠেছিল। সেই শস্য কবেই শেষ হয়ে গেছে, এখন সন্দীপনের ঘরে অন্ন নেই। এ অঞ্চলের লোক বড়ই দরিদ্র। তা হলেও, ইতিপূর্বে নানা পর্ব, অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি উপলক্ষে সন্দীপনের গৃহে নানা রকম উপহার ও 'ভুজ্যি' আসত। কিন্তু এখন লোকে নিজেরাই খেতে পায় না, কোত্থেকে তারা দেবে! সন্দীপন আর তাঁর গৃহিণীকে মাঝে মাঝেই উপবাসে কাটাতে হয়। তবে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রেরা সময় সময় তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর অভাবের কথা কোনদিন মুখ ফুটে কারু কাছে বলেন না। গৃহিণীও তাঁরই মত। ফলে না খেয়ে খেয়ে তাঁর শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে আসছে, তবু কোনদিন নিজের কষ্টের কথা স্বামীর কাছে বলেন না। স্বামীর ক্ষুধাক্লিষ্ট কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। গৃহিণী কোন কিছু না বললেও নিজের ক্ষুধার জ্বালা দিয়ে

সন্দীপন তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পারেন। অভাবের দুঃখ কাকে বলে, এবারই তা তিনি বুঝতে পারছেন। দান প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু অগ্রণী হয়ে কারু কাছে কিছু চাইতে তাঁর মুখে বাধে।

এমনি সময় লোকমুখে সংবাদ শোনা গেল, রাজার আরোগ্য কামনায় বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করা হচ্ছে। এই কথাটা শোনবার পর একটা কথা তাঁর মনে পড়ল, যখন তিনি নগরের অধিবাসী ছিলেন, তখন কোন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হলে প্রধান ঋত্বিক সংগ্রহের সময় লোকে তাঁর কথাই মনে করত। কে জানে, হয়তো আজও তাঁরা তাঁর কথা একেবারে ভুলে যায় নি। এই যজ্ঞে ঋত্বিকের কাজ করতে পারলে বেশ কিছু দিনের মত অন্নকষ্ট দূর হোত।

সেই কথাই তিনি আক্ষেপ করে গৃহিণীর কাছে বলছিলেন। বলছিলেন, কাল বাদে পরশু যজ্ঞ। নগর কাছে নয়, তবু কাল সকালে যাত্রা করলে দিন থাকতে থাকতেই নগরে গিয়ে পৌঁছানো যাবে। আজ-কালকের মধ্যে যদি গিয়ে পৌঁছতে পারি তা হলে ঋত্বিকের কাজটা হয়তো পেয়ে যেতে পারি। কেন না, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা আর রাজপুরুষেরা হয়তো এখনও আমার কথা ভুলে যায় নি। কিন্তু আমি-যে সেখানে যাব, আমার পাদুকা কোথায়! আর পাদুকা না হয় না-ই থাকল, ব্রাহ্মণের পক্ষে নগ্ন পদে চলাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক বা দৃষ্টিকটু হবে না। কিন্তু উত্তরীয় একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। নতুন উত্তরীয় কিনবার সামর্থ্যও নেই। অথচ উত্তরীয় ছাড়া নগ্নদেহে নগরে যাওয়াটা নিতান্তই বিসদৃশ দেখাবে। ওটা বর্বরতার পরিচায়ক।

গৃহিণী বললেন, আমি সূঁচ-সুতো দিয়ে ওই উত্তরীয়টিকে সীবন করে রেখেছি। তুমি দেখ না একবার।

সন্দীপন হেসে বললেন, দূর, ওই উত্তরীয়টা-যে একেবারেই ছেঁড়া, সূঁচ-সুতো দিয়ে কি আর তার এত বড় ফাঁকটাকে বন্ধ করা যায়!

সন্দীপন-গৃহিণী সেই সারাই করা উত্তরীয়টি তাঁকে এনে দেখালেন। এই উত্তরীয়ই-যে সেই উত্তরীয় এ কথাটা বুঝতে সন্দীপনের বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। শেষে নেড়ে চেড়ে অবাক হয়ে বললেন, তাই তো! এই উত্তরীয় গায়ে দিয়ে তো দিব্যি যাওয়া যাবে নগরে। কেউ বুঝতেও পারবে না। গৃহিণী তাঁর কৃতিত্বের এই সুখ্যাতিতে ছোট মেয়ের মত খুশিতে ঝলমল হয়ে উঠলেন।

পরদিন সকালবেলা প্রবল ক্ষুধা নিয়ে ঘুম ভাঙল। এই ক্ষুধা নিয়ে এত দীর্ঘ পথ কেমন করে অতিক্রম করবেন, সেই কথা মনে করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সন্দীপন। কিন্তু ভেবে আর কি হবে. প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করে তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর গৃহিণী তাঁকে খাবার জন্য ডাকলেন।

এমন সময় কোথায় পেলে অন্ন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন সন্দীপন।

গত রাত্রির উদ্বৃত্ত অন্ন ছিল।

আমাদের সংসারে উদ্বৃত্ত অন্নও থাকে? তুমি কাল রাত্রিতে খেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ, গৃহিণী মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলেন।

কথার সুরে তাঁর সন্দেহ হোল, কথাটা বোধ হয় সত্য নয়। কিন্তু যাক, এখন আর সন্দেহ মিটিয়ে কাজ নেই। সামনে দীর্ঘ পথ। সন্দীপন খেতে বসে গেলেন। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে উঠলেন।

সেদিন অপরাহ্নে যজ্ঞের যজমান মন্ত্রী শ্রুতকীর্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোল। প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু শ্রুতকীর্তিকে তিনি চেনেন না।

শ্রুতকীর্তি বলল, আমি আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করি। সন্দীপন উত্তর দিলেন, আমি ইভ্যগ্রাম নিবাসী গোতমপুত্র সন্দীপন।

আপনিই গোতমপুত্র সন্দীপন! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের মুখে

আপনার কথা শুনে প্রধান ঋত্বিকের পদে বরণ করবার জন্য আপনার অন্বেষণ করেছিলাম। কিন্তু আপনার সন্ধান না পেয়ে অন্য লোককে এ পদে বরণ করেছি। আপনি অনুগ্রহ করে ঋত্বিকের পদ গ্রহণ করুন। আমি প্রধান ঋত্বিককে-যে পরিমাণ অর্থ দেব, আপনাকেও তাই দেব'। সন্দীপন সন্তুষ্ট চিত্তে তার এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানালেন। আগামী কয়েক মাসের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি তাঁর চোখের সামনে ঝলসে উঠল।

পরদিন বিশুদ্ধ দেহে বিশুদ্ধ চিত্তে সন্দীপন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য ঋত্বিকেরাও এসেছেন। ঋত্বিকগণ যজ্ঞের রীতি অনুযায়ী ব্রহ্মা, হোতা, উদ্‌গাতা ও অধ্বর্যু—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে বসলেন।

হোতা বা আহ্বানকারিগণ দেবতাদের বন্দনা করবার জন্য যজ্ঞস্থলে তাঁদের আবাহন করবার মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। উদ্‌গাতাগণ সামগান করেন। অধ্বর্যুগণ গদ্য ছন্দে বন্দনা ও মন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করেন। ব্রহ্মার কাজ যজ্ঞকে সকল রকম অনিষ্ট ও বিঘ্ন থেকে রক্ষা করা। যজ্ঞকে সুসম্পন্ন করা বড় সহজ কাজ নয়। তার ভিতরে ও বাইরে বহু বাধা। তাই যদি না হোত, যে-কোন লোক যজ্ঞানুষ্ঠান করে রাজত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ করতে পারত। তা হলে এত রাজাকে বা এত ইন্দ্রকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না। কত লোক যজ্ঞ করতে গিয়ে নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছে! যজ্ঞ করতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক বিধির যদি কোথাও তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটে, যদি কোন মন্ত্র বা স্তব বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত না হয়, কিংবা কোন সামগান যদি অশুদ্ধ সুরে গীত হয়, তবে যজ্ঞফল লাভ দূরে থাক, যজমানের মাথায় সর্বনাশ ভেঙে পড়বে। শুধু তাই নয়, মানব বিদ্বেষী দানব ও রাক্ষসেরা সব সময়েই যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকে। সেজন্যই ব্রহ্মা যজ্ঞের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত থাকেন। কেননা দক্ষিণং যমমন্দিরম্। যমের বাড়ি

দক্ষিণ দিকে, আর দক্ষিণ দিক থেকেই দানবেরা আক্রমণ করে। ব্রহ্মা তাঁর মন্ত্রবাণ বর্ষণ করে এই ব্যূহমুখ রক্ষা করেন।

ঋত্বিকগণ কেন্দ্রস্থ যজ্ঞবেদীকে বেষ্টন করে আপন আপন স্থানে উপবিষ্ট হন। এই যজ্ঞবেদী 'অগ্নি' নামে অভিহিত হয়ে থাকে এবং দেবদেব অগ্নি যজ্ঞের সময় এই যজ্ঞবেদীতে আবির্ভূত হন। এই যজ্ঞবেদী ১০,৮০০ ইষ্টক দিয়ে গঠিত বিস্তারিতপক্ষ একটি বিরাট বিহঙ্গের মত আকৃতিবিশিষ্ট। যজ্ঞবেদী গঠন করবার সময় তার সর্বনিম্নস্তরে পাঁচটি উৎসর্গীকৃত পশুর মস্তক প্রোথিত করা হয়। সেই পশুদের দেহগুলি জলে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানকার কাদা দিয়ে যজ্ঞবেদীর ইষ্টক ও কটাহ নির্মাণ করতে হয়।

প্রথমে অরণি কাষ্ঠযুগল ঘর্ষণ করে যজ্ঞবেদীতে অগ্নিদেবকে জাগ্রত করতে হবে। তারপর হোতাগণ যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবগণকে আহ্বান করবেন। এইভাবে যজ্ঞের কাজ শুরু হবে।

সন্দীপন তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় একটা জিনিস তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করল। বসতে গিয়েও তাঁর বসা হোল না। যূপকাষ্ঠের সামনে রজ্জুবদ্ধ বলির পশুগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সবার আগে যূপকাষ্ঠের গা ঘেঁষে—ও কি! কি জানি, বার্ধক্যদোষে দৃষ্টিশক্তির হয়তো বিভ্রম হয়েছে, তাই স্পষ্ট করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে গেলেন। না, তাঁর চোখের ভুল নয়; একটি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র শিশু যূপকাষ্ঠের পাশে হয় ঘুমিয়ে আছে, নয় তো অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। আরও দু' পা এগিয়ে গেলেন সন্দীপন। দেখলেন, গোবৎসের মত একটা খুঁটির সঙ্গে ওকে রজ্জুবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

সন্দীপন অধ্বর্যুদের প্রধানকে সম্বোধন করে সেই শিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এ কি?

প্রধান অধ্বর্যু উত্তর দিলেন, এ বলির শিশু।

তার অর্থ? এই শিশুকে ওই পশুদের সঙ্গে বলি দেওয়া হবে! বিস্ময়ে, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন সন্দীপন।

প্রধান অধ্যর্যু বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, কেন, আপনি জানেন না? যে-কথা সবাই জানে, আপনি ঋত্বিক হয়েও সে কথা জানেন না, এ কেমন কথা?

ততক্ষণে ঋত্বিকেরা যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে বসে গিয়েছেন। যজ্ঞের লগ্নক্ষণ হয়ে গেছে। প্রধান হোতা সন্দীপনকে উদ্দেশ্য করে ডাকাডাকি করছেন। পিছিয়ে এসে হোতাদের কাছে চলে এলেন সন্দীপন, তারপর সমস্ত ঋত্বিকদের উদ্দেশ করে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: না না, আমি এ যজ্ঞের ঋত্বিক নই, এ যজ্ঞে আমি অংশগ্রহণ করতে পারব না। সবাই দেখল সন্দীপন থর থর করে কাঁপছেন।

সমস্ত যজ্ঞস্থলে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। দর্শকেরা পক্ষে বিপক্ষে নানারকম উক্তি করে কোলাহলের সৃষ্টি করে তুলল। ঋত্বিকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পারের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। যজমান শ্রুতকীর্তি উৎকণ্ঠিত হয়ে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি—কি—কি হয়েছে?

সন্দীপন তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, আমি এই যজ্ঞের ঋত্বিক নই।

কেন? কেন?

সন্দীপনের বিস্ময়, আতঙ্ক ও উত্তেজনা মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তিনি গর্জন করে উঠলেন, এ যজ্ঞ রাক্ষসের যজ্ঞ, পিশাচের যজ্ঞ, কোন মানুষ এই যজ্ঞের অংশী হতে পারে না।

ঋত্বিকদের মধ্যে বিশিষ্টেরা এবং আরও আরও সব শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ঘিরে ধরলেন তাঁকে, শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মনুষ্যবলির বৈধতা প্রমাণ করে দেখাতে চাইলেন।

কিন্তু কে শোনে তাঁদের সেই যুক্তি! চিরদিনের শান্ত ও সংযত সন্দীপন ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে উঠলেন, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। যে-শাস্ত্র যজ্ঞে নরবলির বিধান দেয়, সে শাস্ত্র অপশাস্ত্র। যে-যজ্ঞে মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বলি দেওয়া

হয়, সেই যজ্ঞের ঋত্বিকগণ, যজমান ও সকল প্রকার অংশগ্রাহীকে অনন্ত কাল নরক ভোগ করতে হবে।

ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত শুনে দর্শকেরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল। যজ্ঞের অংশগ্রাহী বলতে তাদেরও তো বোঝায়। ঋত্বিকদের পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। শ্রুতকীর্তি অনুনয় করে বলল, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনি যখন যজ্ঞের ঋত্বিক থাকতে অনিচ্ছুক, না-ই বা থাকলেন। আপনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে আসন গ্রহণ করুন।

না, আমি আর মুহূর্ত কালও এখানে অপেক্ষা করব না। এই কথা বলে ক্রোধের জ্বালা ছড়াতে ছড়াতে তিনি যজ্ঞস্থল থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে ঋত্বিকদের মধ্যে জন কয়েক দাঁড়িয়ে পড়ল, আরও কয়েক জন উঠি-উঠি করতে লাগল। অবস্থা কঠিন বুঝতে পেরে শ্রুতকীর্তি খুবই তৎপরতার সঙ্গে একটি মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগ করল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, ঋত্বিকদের যার যা নির্ধারিত প্রাপ্য, তার উপর প্রত্যেককে অতিরিক্ত পাঁচটি করে গাভী দান করা হবে। এই ঘোষণাটা ওষুধের মত নয়, মন্ত্রের মতই কাজ করল। যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারা চটপট নিজ নিজ স্থানে বসে পড়ল। যারা উঠি-উঠি করছিল তারা নড়া চড়া বন্ধ করে শক্ত হয়ে বসে রইল। উষস্তি চাক্রায়ন এখনও যজ্ঞস্থলে এসে পৌছান নি। তাঁকে ডেকে আনবার জন্য লোক চলে গেছে।

শুভকর্ম শুরু হবার আগেই বিঘ্ন ঘটল! বিঘ্ন থেকে যজ্ঞকে রক্ষা করবার ভার ব্রহ্মার উপর, যিনি দক্ষিণ দুয়ার পাহারা দিচ্ছেন! কিন্তু এ রকম একটা বিঘ্ন-যে আসতে পারে, এ তিনি কখনও ভাবতে পারেন নি, তাই সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। এই জাতীয় বিঘ্ন তাড়াবার মত মন্ত্রও তাঁর জানা নেই।

কিন্তু তাই বলে যজ্ঞের কাজ থেমে গেল না। সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একজন হোতা নিয়োগ করা হোল। যজ্ঞের কাজ এগিয়ে চলল।

সতেরো

নগরের লোক নিত্য নতুন উত্তেজনা নিয়ে মেতে ওঠে। এটাই নগরের ধর্ম। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাজার চিন্তাকে ছাপিয়ে পুরুষমেধ যজ্ঞের কথা নিয়ে বাদ-বিতর্ক জল্পনা কল্পনা প্রাধান্য লাভ করল। নগরবাসীরা বলাবলি করতে লাগল, যজ্ঞ অবশ্য সম্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু এ যজ্ঞের ফল কখনও ভাল হবে না। গোতমপুত্র সন্দীপন সহজ লোক নন, তাঁর অভিসম্পাতের কোন ফলই কি ফলবে না?

কেউ কেউ বলল, এই রাজ্যের দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। তার লক্ষণগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেদিন রাজা মতিভ্রষ্ট হয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে পদচ্যুত করে সেই জায়গায় অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক শ্রুত-কীর্তিকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলেন, সেই দিনই আমরা বলেছি, এই রাজ্যের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। তারপর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে এই যে-সব খুনোখুনি কাণ্ড, এ রাজ্যে কি আর এমন কোন দিন হয়েছে? প্রতিবেশী রাজ্যের লোকেরা আমাদের কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। না-ই বা করবে কেন? ওদিকে শূদ্রদের এইসব দেখে শুনে সাহস বেড়ে উঠেছে। তারা মূর্খ হোক, গরীব হোক, তাদের একতা আছে। আমাদের মত তাদের পাঁচজনের দশ মত নয়। তারা সবাই একমত হয়ে এক কথায় জানিয়ে দিয়েছে, তাদের উপর যে-নতুন কর ধার্য করা হয়েছে, তা তারা কেউ দেবে না। যেমন মুখে বলেছে, কাজেও তেমনি। রাজার গোপেরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে, একজনের কাছ থেকেও কর আদায় করতে পারে নি। আমরা হলে এমন পারতাম? গোপদের মধ্যে নকুলের মুখ ছোটে সবচেয়ে বেশী। বড় মুখ করে দলবল নিয়ে কর আদায় করতে গিয়েছিল, কার ঘরে নাকি আবার আগুনও লাগিয়ে দিয়েছিল। আর তার

পরিণামে কি হোল? দিয়েছে একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে। শয্যাশায়ী হয়ে ছিল এতদিন। আবার নাকি বলেও দিয়েছে, এইবার একটুখানি শিক্ষা দিয়ে দিলাম। এরপর আবার গেলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। আমরা হলে এমন পারতাম? রাজকর্মচারীর গায়ে হাত তুলবে, আমাদের মধ্যে এমন বুকের পাটা কার আছে? এই শূদ্রেরা, আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে কথা বলবার মত সাহস যাদের ছিল না, আমরা যে-পথ দিয়ে হাঁটতাম, তার বিশ হাত দূর দিয়ে হাঁটত, তারা এখন মুখের সামনে এসে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনায়। ছোঁড়াগুলি ঘাড় বাঁকা করে জবাব দেয়, ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেলে কাজ করবে না। দাসদাসীরাও বেয়াড়া হয়ে উঠেছে, কথা বললে কথা মানতে চায় না। ওদের এত সাহস আসে কোত্থেকে? আমরাই তো এর জন্য দায়ী। হ্যাঁ, একশো বার দায়ী। আমরা ব্রাহ্মণেরা আর ক্ষত্রিয়েরা অনর্থক খুনোখুনি করে মরি, আর তাই দেখেই তো ওদের এমন করে সাহস বেড়ে যাচ্ছে। একদিন দেখবে, ওরা ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের এক জোয়ালের তলায় চাপিয়ে লাঙল চালাবে। বলে দিচ্ছি, সেদিন আর বেশী বাকী নেই।

কেউ বলে, কথা মিথ্যা নয়। দেখ না, দেবতারাও এখন আমাদের উপর বিরূপ হয়েছেন। আগে দেবতারা যখন প্রসন্ন ছিলেন, সময়মত বৃষ্টি হোত আর ঋতুগুলি তাদের ঋত রক্ষা করে চলত। তখন বনে শিকারের অভাব ছিল না, ক্ষেতে যত্ন ছাড়াই অজস্র শস্য ফলত, গাভীরা প্রচুর দুধ দিত। অভাব কাকে বলে মানুষ তা জানত না। কিন্তু এখন? অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, গোমড়ক, মহামারী, একটার পর একটা লেগেই আছে। এখন মানুষ ঋত রক্ষা করে চলে না, দেবতারাও তাদের ঋত রক্ষা করেন না। এই দেখ না কেন, আমরা নিজেরা দেখা দূরে থাক, বাপ-ঠাকুর্দার মুখেও কোনদিন পুরুষমেধ যজ্ঞের কথা শুনি নি। দেবতারা তো পশুবলি পেয়েই তুষ্ট থাকেন। তবে কোন্ প্রয়োজন ছিল পুরুষমেধ যজ্ঞ করবার?

এক দল বলল, যাই বল, সব কিছুর জন্য দায়ী রাজপুরোহিত নিজে। রাজা বৃষকেতু আর শ্রুতকীর্তি—এরা তো শুধু উপলক্ষ, আসলে তাঁর ইঙ্গিতেই সব কিছু চলছে। উষস্তি চাক্রায়নের ভক্তেরা এর প্রতিবাদ করে বলল, না না, এ তোমাদের ভুল কথা। তোমরা তো আসল কথা জান না, তাই এ কথা বলছ। আমরা ভিতরের খবর রাখি। রাজপুরোহিত প্রথম থেকেই পুরুষমেধ যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। এ সবই শুধু শ্রুতকীর্তির গোঁয়ার্তুমি। দেখ না কেন, যজ্ঞের শুরুতেই যখন গোলমালটা বাধল, রাজপুরোহিত তখন উপস্থিত ছিলেন? তিনি রাগ করে যজ্ঞক্ষেত্রেই আসেন নি। শেষে গোতম পুত্র সন্দীপন যজ্ঞক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাবার পর অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকিয়ে আনানো হয়। কিন্তু তখন আর কি করবেন তিনি? সঙ্কল্প করা যজ্ঞ কি আর অসম্পূর্ণ রাখতে পারা যায়! তা হলে কি আর রক্ষা আছে!

অপর পক্ষ এ কথা মানতে চাইল না। তারা বলল, হ্যাঁ, আমাদের আব বোকা-বুঝ বুঝিও না। রাজপুরোহিতের আপত্তি থাকলে শ্রুতকীর্তির সাহস হোত এ কাজে হাত দেবার! আমাদের মত লোকের উপরেই শ্রুতকীর্তির যত প্রতাপ, রাজপুরোহিতের সামনে দাঁড়িয়ে পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়ে।

এভাবে যে যেমন বোঝে, সে সেই মত কথা বলে। তবে নগরের প্রায় সকলেরই মত যে, এমন যজ্ঞ না করাটাই ভাল ছিল।

যজ্ঞে নরবলিদানের ব্যাপারটা এক জনের উপর এক এক রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। নরবলি, বিশেষ করে এই শিশুবলির বীভৎসতা শান্ত ও মধুরস্বভাব সন্দীপনকে অস্থির ও উন্মত্ত করে তুলেছিল। তিনি অভিসম্পাত দিয়ে যজ্ঞক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। নগরের উচ্চবর্ণের লোকেরা সামান্য একটা কৃষ্ণকায় শূদ্র-শিশুর কথা চিন্তা করে তেমন বিচলিত হয়ে পড়ে নি। তারা ভয় পেয়েছে গোতমপুত্র সন্দীপনের অভিসম্পাতের জন্য। এই তেজস্বী

ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁর তেজ আপনার অন্তরেই সংহিত রাখেন, কোনদিন কারু উপরে ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করেন না, তাঁর অভিসম্পাত কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে!

সুদর্শন ভাবছিল অন্য কথা। এই কি তার চির-আরাধ্য বরুণ-দেবের সত্যিকারের স্বরূপ? সুদর্শন বহুদেবপূজক আর্যজাতির সন্তান। তা হলেও আর সমস্ত দেবতাকে উপেক্ষা করে সে একমাত্র বরুণদেবকে আরাধনা করে এসেছে। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে, কিন্তু সে-সব কথা সে গায়ে মাখে নি। সে জানত, আর সব দেবতা গৌণ. তারা সেই পরমদেবতার অবয়বস্বরূপ। এক বরুণ প্রীত হলে সর্বদেবতা প্রীত হন।

ধ্যানের মধ্য দিয়ে সে তার কল্পনা-লোকে এক মহান ও সর্বমানবের প্রতি করুণাপরায়ণ পরম সত্তার সৃষ্টি করে তুলেছিল। সেই উপলব্ধি তাকে এই বাস্তব সংসারের পঙ্কিলতা থেকে উর্ধ্বে তুলে রাখত। সুদর্শন কোনদিন অন্য আর সকলের মত অন্নের জন্য, গাভীর জন্য, সম্পদের জন্য বা বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তার আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় নি। বরুণদেবের উদ্দেশে প্রতিদিন সে এই প্রার্থনাই জানিয়ে এসেছে :

যদি আমরা কখনও বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ভাই, বন্ধু, সাথী, প্রতিবেশী বা বিদেশী যারা আমাদের প্রতি প্রীতি ভাব পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পাপ কার্য করি, তবে তুমি আমাদের সেই পাপ পথ থেকে নিবৃত্ত করো। হে বরুণ, আমি তোমাকে বন্দনা করি।

কিন্তু সেই বরুণদেবের একি বিকৃত মূর্তি! শুনঃশেপের কাহিনী তার জানা ছিল না। পুরুষমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব নিয়ে যখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতর্ক উঠেছিল, সেই উপলক্ষেই শুনঃশেপের কাহিনী সে সবিস্তারে জানতে পারল। চমকে উঠল সুদর্শন। সকল দেবতার অধিপতি সেই মহাদেবতা, যিনি আপনার মায়ার বলে পৃথিবী আর

সূর্যকে ধারণ করেন, যাঁর অমোঘ বিধানে প্রাণী ও অপ্রাণী সকলেই আপন আপন ঋত রক্ষা করে আসছে, সেই বরুণদেব কেমন করে এমন হীন স্তরে নেমে আসতে পারেন ?

শুনঃশেপের কাহিনী শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী। তবু সুদর্শন আজ আর সেই শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস রাখতে পারে নি। প্রবল উত্তমর্ণ যেমন দুর্বল অধমর্ণের উপর চাপ দিয়ে আপনার প্রাপ্য আদায় করে, ঠিক সেই ভাবেই শিশুর কচি মাংসের জন্য লুব্ধ বরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে বারংবার তাগিদ দিয়ে ফিরছেন, এমন একটা কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে সুদর্শন ! শাস্ত্রের উক্তি হলেও এ কখনও সত্য নয়, এ মানুষের মনগড়া কথা, এই শাস্ত্র-বিরোধী চিন্তা সুদর্শনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তবু তার মনে আশা জেগে রইল, বরুণদেব কিছুতেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না।* তাঁর মহিমায় যজ্ঞের উদ্যোক্তাদের মনের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে যজ্ঞের দিন এসে গেল। সুদর্শন ঘরে বসে থাকতে পারল না, কি হয় না হয় দেখবার জন্য আশা, নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে সে যজ্ঞস্থানে গেল। গোতমপুত্র সন্দীপন যখন রাক্ষসের যজ্ঞ, এই ধ্বনি করতে করতে যজ্ঞস্থান থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন সুদর্শন বুঝল, এ আর কিছুই নয়, বরুণ-দেবের মায়া। ওই ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়ে তিনিই এই যজ্ঞ বন্ধ করবার জন্য আদেশ জানালেন। আবেগে ভরে উঠল সুদর্শনের বুক, সে বলে উঠল, ধন্য ধন্য দেবতা, অপার তোমার লীলা।

কিন্তু কোথায় কি, একটু বাদেই রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়ন যজ্ঞস্থলে এসে উপনীত হলেন। তাঁর নির্দেশমত সন্দীপনের স্থলে নতুন হোতা নিয়োগ করা হোল। তারপর যথানিয়মে যজ্ঞের কাজ এগিয়ে চলল। যথাসময়ে অধ্বর্যুগণ যখন বলির জন্য উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করল, সুদর্শন তখন নিঃশব্দে যজ্ঞস্থল থেকে বেরিয়ে ঘরে ফিরে এল।

মনের কোণায় ক্ষীণ একটু আশা ছিল, হয়তো শেষ মুহূর্তে একটা কিছু হয়ে যাবে। তার ফলে যজ্ঞের নাম করে এই বীভৎস ঘটনা ঘটবে না, বরুণ দেবের নামেও এমন করে কলঙ্ক পড়বে না। কিন্তু সুদর্শন ঘরে বসেই সংবাদ পেল, শেষপর্যন্ত যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। সুদর্শনের মনে হোল, ঘরে বাতাসের চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেছে। বুক ভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল সে। কিন্তু নগরের পথে বড় বেশী লোক, সমস্ত বাতাস যেন ওরা টেনে নিচ্ছে। এখানেও বাতাস নেই। সেই ঘুমন্ত শিশুর কচি মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আহা, কোন মায়ের কোলের ধন! বাতাস—বাতাস চাই সুদর্শনের। নগর ছেড়ে প্রান্তরের পথে বেরিয়ে পড়ল সে।

মিথ্যা, সবই মিথ্যা। শাস্ত্র মিথ্যা, দেবতারা মিথ্যা, বরুণদেব মিথ্যা, মানুষের অসার কল্পনা। সুদর্শন পার্থিব সুখ-সম্ভোগ চায় নি, সে যা চেয়েছিল, তাও মিথ্যা।

সাত্যকি কত দিন কত কথা বলেছে, নানা কথায় শাস্ত্র সম্পর্কে তার মনে কত রকম সংশয়ের সৃষ্টি করে তুলেছে। তার চেয়েও স্পষ্টভাষিণী অম্বখলা তীক্ষ্ণ যুক্তি আর কঠিন বিদ্রূপের আঘাতে তার ধ্যানের দেবলোককে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে প্রয়াস পেয়েছে। সুদর্শন তাদের কাছে ঘা খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, কত রকমের কত সংশয় তার মনে জেগেছে। কিন্তু তার ধ্যানলোকের মহিমাময় বরুণদেবকে ওরা মুহূর্তের জন্যও অপসারিত করতে পারে নি। তাকেই অবলম্বন করে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন চোখ বুজলেই ছবির মত ফুটে ওঠে ঘুমন্ত সেই নিষ্পাপ শিশুর মুখ। তার পেছনে ও কি? মানুষের মত দেহ, বাঘের মাথা ওৎ পেতে আছে, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। এই কি তার সেই বরুণদেব? হ্যাঁ, গোকর্ণ প্রদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেছিল বটে, শিশুর কচি মাংসে বরুণদেব পরম পরিতুষ্ট হয়ে থাকেন।

মিথ্যা, সবই মিথ্যা। যা শুনেছ সব ভুল, যা ভেবেছ সব মিথ্যা। পেছনেও কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। চারি দিকে শুধু নিঃসীম শূন্যতা। কেমন করে দাঁড়াবে সে? কাকে অবলম্বন করে দাঁড়াবে? কেমন করে বাঁচবে? কেনই বা বাঁচবে? কি হবে এইজীবন দিয়ে? এর চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? উত্তরহীন অসংখ্য প্রশ্ন তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। আর সেই সব উত্তরের সন্ধানে সুদর্শন দিশেহারা হয়ে পথে-বিপথে ঘুরে মরতে লাগল।

আঠারো

ইদা দিনের বেলা অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন ঘুম সে ঘুমায় না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ ঘুমটা এমন করে চেপে এল! বিপদ যখন আসে, এমন হঠাৎই আসে।

খেতু তখন উঠানে কাদামাটি নিয়ে খেলা করছিল। এমন তো রোজই করে। বড় চঞ্চল ছেলে। মাঝে মাঝে হামা দিয়ে পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলে যায়। তখন খোঁজাখুঁজি করে নিয়ে আসতে হয়। তবে পাড়ার মাঝখানে, ভয়ের কিছু নেই। বন-জঙ্গলও কাছা-কাছি নেই। দিনের বেলা কোন জন্তু-জানোয়ারও এসে হামলা করে না।

ইদা ঘুম থেকে উঠে দেখল খেতু নেই। ওকে না দেখে বুকটা তার কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। ইদা ব্যাকুল হয়ে খেতু খেতু বলে ডাকতে লাগল। খেতু বড় চালাক ছেলে। সবাই বলে, বাপের চেয়েও চালাক হবে। ডাকলে পরে শুনলেও প্রথম ডাকে সে সাড়া দেয় না। একটু সময় উৎকর্ণ হয়ে শোনে। অনেক পরে সে সাড়া দেয়। আজ কিন্তু ইদা ডেকে ডেকেও সাড়া পেল না।

ভয় পেয়ে গেল ইদা। এমন ভয় সে আর কখনও বুঝি পায় নি। ওর হাতে-পায়ে কাঁপন ধরল। ও নিজের মনে বলল, আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? যাবে আর কোথায়, এই পাড়ায় কোন বাড়িতেই নিশ্চয় আছে। কিন্তু কাছাকাছি যে-ক'টা বাড়ি আছে সব জায়গায় গিয়ে খোঁজ করে দেখল। তারা বলল, কই, এখানে আসে নি তো! ওগো খেতুর মা, কি করছিলে তুমি? কতক্ষণ ধরে পাও না?

কি করছিল সে, কেমন করে বলবে! এমন পোড়া কপাল তার, নইলে এমন সময় এমন ঘুম কেউ ঘুমায়? আর কতক্ষণ-যে ঘুমিয়েছে,

তাই বা কেমন করে বলবে ? সে তাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। সবাই সান্ত্বনা দিল, আহা, কাঁদবার কি হয়েছে। যাবে আর কোথায়! দাঁড়াও, আমরা খোঁজ করে দেখছি। তখন তারা মেয়ে-পুরুষ সবাই তার খোঁজ করতে লেগে গেল।

তুন্দুরু গেছে কাজে। তার বউ তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ও পাড়ায় তার মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। এমনও তো হতে পারে, মাঝখানে একবার এসেছিল, সে-ই খেতুকে কোলে করে নিয়ে গেছে। ইদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তা কেমন করে হবে, নিয়ে গেলে আমাকে কি একবার বলে যেত না! তা হলেও তখনই লোক ছুটল তুন্দুরুর মেয়ের বাড়িতে। খবর পেয়ে তুন্দুরুর বউ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। কই, সে তো নিয়ে যায় নি। তখন সারা গ্রামময় খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় খেতু? ইদা অচৈতন্যের মত পড়ে রইল।

কেউ বলল, শিয়ালে নিয়ে গিয়েছে। কেউ বলল, কোথায় শিয়াল, এখানে দিনের বেলা শিয়াল কোনদিনই আসে না। কেউ বলল, অপ্সরাদের কীর্তি। ওদের নিজেদের তো ছেলেপিলে হয় না। ওরা সুযোগ পেলেই মানুষের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালায়। এ রকম অনেক শোনা যায়। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে! ইদা-যে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ওর কোমরের তাগায় নীলকণ্ঠ পাখির হাড় ঝুলিয়ে রাখত। ঐ হাড় থাকলে অপদেবতার সাধ্য নেই যে, তাকে স্পর্শ করতে পারে। কেউ বলল, এ কোন জাদুকরের কাজ। মন্ত্রের জোরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কত লোক কত রকম কথা বলতে লাগল। কত লোক কত ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু ইদা অচৈতন্যের মত পড়ে রইল।

সুদাসের কাছে খবর গেল। খবর পেয়ে সুদাস ছুটতে ছুটতে এল। এই দু' দিন ইদা মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়েছিল। সুদাস আসতেই সে তার পায়ের কাছে কাটা পশুর মত পড়ে আছড়াতে

লাগল, আর কেঁদে বলতে লাগল, আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল তুমি। আমিই তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

ওর কথা শুনে সবাই অবাক। সুদাসের বুকটা ভিতর থেকে পুড়ে যাচ্ছিল। তবু সে আপনাকে সামলে নিয়ে বলল, এ কি কথা বলছিস্ তুই ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তুমি যাবার সময় বার বার করে বলে গেলে, সাবধানে রাখিস্, আর আমি পোড়াকপালী, কি কাল ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেজন্যই তো এমন হোল।

ও-যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে কথাটা এ পর্যন্ত কাউকে বলতে পারে নি ইদা। তাই অপরাধের বোঝাটা ওর বুকের মাঝখানে আটকে থেকে ওকে দম ফেলতে দিচ্ছিল না। সুদাসের কাছে গোপন কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে ও গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। ও যেন দম ছেড়ে বাঁচল।

সবাই বলল, কেঁদে আর করবে কি ? অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে।

একজন বলল, অপদেবতার উপর কি কারু হাত আছে ? ওরা জাগা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তা না হলে এমন অসময়ে কে ঘুমায় ?

না, না অপদেবতা নয়, গর্জন করে উঠল সুদাস, অপদেবতারা আমাদের শত্রু নয়, আমাদের শত্রু ওরা—ঐ উচ্চ বর্ণের আর্যেরা। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ ওই ল্যাংড়াটার কাজ।

সবাই তার কথা শুনে চমকে উঠল। এ কথাটা একবারও কারু মনে হয় নি। কিন্তু ওরা কেমন করে নেবে ? গৌর বর্ণের লোক যদি পাড়ার ভিতরে আসত, তবে কি আর কারু চোখে পড়ত না ?

ওরা নিজেরা আসবে কেন ? আমাদের নিজেদের মধ্যেই তো ওদের লোক রয়েছে। মনে নেই আব্বনের কথা ?

কিন্তু ওরা সুদাসের কথাটা তেমন গায়ে মাখল না। ভাবল,

ল্যাংড়াটার উপর সুদাস এত চটা যে, যা-কিছু ঘটে, সবই ওর ঘাড়ে চাপায়।

কিন্তু তার পরদিন ওদের ভুল ভাঙল। সুদাস যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। খেতু হারিয়ে যাবার তিন দিন বাদে খবর পাওয়া গেল, রাজার আরোগ্য কামনায় যে-যজ্ঞ হয়েছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি কৃষ্ণকায় শিশুকে বলি দেওয়া হয়েছে। এবার আর কারু মনে কোন সন্দেহ রইল না। যজ্ঞের মধ্যে মানুষ বলি, এমন কথা কেউ কোনদিন শোনে নি। ওরা তো মানুষ নয়, ওরা রাক্ষস। ওরা সবকিছুই করতে পারে।

খবর শুনে ইদা চিৎকার করে আছড়ে পড়ল। কিন্তু সুদাস একটুও কাঁদল না। সে চুপ করে শক্ত হয়ে বসে রইল, ইদার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। শুধু হিংস্র শ্বাপদের মত তার চোখ দুটো প্রতি হিংসার আগুনে ধক ধক করে জ্বলতে লাগল। শুধু সুদাস নয়, সমস্ত শূদ্রদের চোখেই এই আগুনের শিখা দেখা দিল। খেতু এখন আর শুধু সুদাসের সন্তান নয়, তাদেরও সন্তান। তাকে হারিয়ে শুধু সুদাসই সন্তানহারা হয় নি, সমস্ত জাতি সন্তানহারা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রামে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যেখানেই শূদ্র আছে, সেখানেই এই সংবাদ গিয়ে প্রবেশ করল। আর এই সংবাদ যেখানেই প্রবেশ করল, সেখানেই আগুন জ্বলে উঠল। এই সংবাদ শোনামাত্র সংবাদটা সত্য কিনা জানবার জন্য দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসতে লাগল।

বুড়ো আর জওয়ানদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য অবশিষ্ট ছিল, এবার তা আর রইল না। ছোট-বড় সবাই আর মেয়ে-পুরুষ সবাই একবাক্যে বলল, পড়ে পড়ে অনেক তো মার খেয়ে এলাম, এবার মার দিতে হবে। আমরা তো মরতে বসেছি। এমনিতেই তো মরছি, এবার না হয় ওমনিতে মরব। আমাদের আর মরার ভয়টা কি? আমাদের আর মরার ভয়টা কি—এই কথাটাই সকলের মুখের কথা আর মনের কথা হয়ে দাঁড়াল।

একদিন শোনা গেল মাতঙ্গি বুড়িকে নাকি ভর করেছে। গ্রাম-শুদ্ধ ভেঙে পড়ল মাতঙ্গি বুড়ির বাড়িতে। লোকের ভিড়ে তার বাড়িতে ঢোকাই কঠিন। মাতঙ্গি বুড়ির এমন মূর্তি কেউ কোনদিন দেখে নি। চুলগুলি আলুথালু, চোখ দুটো বিস্ফারিত, আর ক্রোধে বিকৃত মুখ দেখতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

সারাটা দিন এমনি ভাবে কাটছে তার। মাঝে মাঝে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। আবার থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে। তখন মুখের দিকে তাকালে ভয় করে। পট পট করে চুলগুলি টেনে টেনে ছিঁড়ছে, ঘন ঘন শ্বাস টানছে আর বলছে—জাঙ্গালী বুড়ির আদেশ। আমি, আমি চম্পি বুড়ি। আমি চম্পি বুড়ি। আমি আছি তোদের সঙ্গে। মার মার, ওদের পিটিয়ে পিটিয়ে মার। পূর্ব থেকে, পশ্চিম থেকে, উত্তর থেকে আর দক্ষিণ থেকে ওদের ঘেরাও করে ফেল। ওদের টিপে টিপে মার, আর পুড়িয়ে পুড়িয়ে মার। কোন দয়া নেই, কোন মায়া নেই। ওদের আছড়ে আছড়ে মার, আর পুড়িয়ে পুড়িয়ে মার।

এই একই কথা। একই কথা বার বার বলছে। এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসছে। মাতঙ্গি বুড়ির এই কথা শুনে নিয়ে ওরা আবার যে-যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। প্রত্যেকের ভিতরেই যেন মাতঙ্গি বুড়ির অধিষ্ঠান হয়েছে। সকলেরই ভিতর থেকে সে ক্রমাগত বলে চলেছে—মার মার, টিপে টিপে মার, আর পুড়িয়ে পুড়িয়ে মার। কোন দয়া নেই, কোন মায়া নেই, আছড়ে আছড়ে মার, আর পুড়িয়ে পুড়িয়ে মার।

বুঝতে পারছ উলুপী, কি ভীষণ দিন আসছে সামনে। আসছে নয়, এসে পড়েছে। এ আগুন যে-কোন সময়ে জ্বলে উঠবে। আর যখন জ্বলে উঠবে, তখন তার পরিণতি কি যে হবে, আমি ভাবতে

পারছি না। কে-যে মরবে আর কে-যে বেঁচে থাকবে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। উলুপীর ঘরে বসে উলুপী আর সাত্যকি কথা বলছিল।

উলুপী বলল, শুনেছি অনেক দিন আগে আরও নাকি একবার এমন হয়েছিল। শূদ্রেরা নগর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। তার পর সেই নগরকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

ঠিকই শুনেছ। রাজা বৃষকেতুর প্রপিতামহের আমলে এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেই শিক্ষা কোন কাজেই লাগল না। আবার তেমনি ঘটনা ঘটতে চলেছে। অবিচার, অত্যাচার আর কর বৃদ্ধির চাপে দিন দিন দাহ্য পদার্থ স্তূপীকৃত হয়ে উঠছিল, এবার এই নৃশংস শিশু হত্যা তার মধ্যে স্ফুলিঙ্গের সঞ্চার করল। এবার এ আগুনকে চাপা দিয়ে রাখবে কে?

জান সাত্যকি, যেদিন গোতমপুত্র সন্দীপন অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন, তার পর থেকেই নগরবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে দিন যাপন করছে। কি আশ্চর্য, তার পরদিনই কি অদ্ভুত ভাবে সুদর্শনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গ থেঁতলে গেছে, মাথা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। গোপালকেরা গাভী চড়াতে গিয়েছিল, তারা তার শবদেহকে বহন করে নিয়ে এল। কোথায় নগর, আর কোথায় সেই পাহাড়! কেনই-বা সে সেখানে গিয়েছিল, কেমন করেই-বা এমন ভাবে মারা পড়ল! নগরবাসীরা বলছে, গৌতমপুত্র সন্দীপনের অভিশাপ এরই মধ্যে ফলতে শুরু করেছে। সাত্যকি, তুমি সুদর্শনের মৃত্যুর কথা শুনেছ তো?

সাত্যকি উত্তর দিল, হ্যাঁ, শুনেছি। জান উলুপী, এই সুদর্শন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল।

তোমার বন্ধু? সুদর্শন? সে কেমন কথা? সুদর্শন তো ধর্মপরায়ণ লোক বলে সুপরিচিত। কিন্তু তুমি তো ধর্ম বিষয়ে চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব কেমন করে সম্ভব?

তুমি ঠিক কথাই বলেছ। অনেকেই এই প্রশ্ন করেছে। এই প্রশ্নের উত্তর সুদর্শনও দিতে পারে নি, আমিও না। বড় মধুর আর আবেগময় প্রাণ ছিল সুদর্শনের। তার মত মানুষ হয় না। সুদর্শন নেই, এ কথাটা যেন ভাবতেও পারছি না। কিন্তু থাক সে কথা। এখন রাজপ্রাসাদের খবর বল। কেমন আছেন রাজা? আর রানী সুদক্ষিণার অবস্থাই বা কি?

এই কথা বলবার জন্যই তো আমি মনে মনে তোমার খোঁজ করছিলাম। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ তুমি। রাজার ওই একই অবস্থা। প্রাণটা কোন মতে আছে। শুয়ে শুয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদেন। কিন্তু রাজার কথা থাক। আমি বলছি রানীমার কথা। উঃ, তাঁর কথা বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। সমস্ত রাজপ্রাসাদের যিনি ছিলেন একেশ্বরী, তিনি আজ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দিনী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। উষস্তি চাক্রায়ণের কঠিন আদেশ—ঘর থেকে একটু বেরোতেও দেয় না। এত বুদ্ধি, এত তেজ, এত শক্তি কোন কাজেই লাগল না।

তুমি কি দেখা করতে পেরেছ তার সঙ্গে? কথা বলতে পেরেছ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। আহা, কি চেহারা হয়ে গেছে তাঁর, চেনাই যায় না। রুদ্ধ কক্ষের সঙ্কীর্ণ এক গবাক্ষ, সেই পথ দিয়ে একটু একটু আলো প্রবেশ করে। সেই গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, রানীমা! ঘরের ভিতরকার অন্ধকারটা একটু নড়ে উঠল। আমার সাড়া পেয়ে সড় সড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন দেখলাম, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, অমার্জিত রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর এসে পড়েছে। আর তাঁর দুই চোখে যেন উন্মাদিনীর মত দৃষ্টি। আমাকে দেখে সেই চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডেকে বললেন, কে, উলূপী?

আমি বললাম, হ্যাঁ. মা

শোন্ উলুপী শোন্, তোর কথাই ভাবছিলাম। তুই তো এখানকার অভিসন্ধি সব কিছুই জানিস্। শুধু এক বারের জন্য আমাকে মুক্ত করে রাজপ্রাসাদের বাইরে রেখে আসতে পারিস্? শুধু একটি বার বাইরে যেতে চাই। আর কিছু না। আমার জীবনে আমি আর কিছুই চাই না। শুনে আমার বুক যেন ভেঙে গেল, তবু বললাম, তুমি মা রাজরানী, বাইরে গিয়ে ওদের চোখ এড়িয়ে কেমন করে থাকবে তুমি? তার চেয়ে কিছু দিন ধৈর্য ধরে থাক, সুদিন কি আর আসবে না?

না, সুদিন আর আসবে না রে, সুদিন আর আসবে না। এখন যেদিকে তাকাবি সেদিকেই দুর্দিনের ঘনঘটা। কিন্তু আমার-যে একটা কাজ করতে বাকী রয়ে গেছে। এই কাজটা শেষ করতে পারলেই আমার ছুটি।

আমি তাঁর কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। একবার সন্দেহ হোল, রানীমা সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলছেন তো? রানীমা আমার চোখের দৃষ্টিতে আমার মনের কথাটা পড়তে পারলেন। তিনি বলে উঠলেন, আরে না, না, আমি পাগল হই নি। যা বলছি ঠিকই বলছি। ধৈর্য ধরে আমাকে এখানে থাকতে বলছিস্, আমি কেমন করে ধৈর্য ধরব? জানিস্. ওরা কি ষড়্‌যন্ত্র করেছে? ওরা সমস্ত নগরবাসীর সামনে আমাকে ব্যভিচারিণী বলে অভিযুক্ত করবে, দণ্ড দিতে চাইবে, তবু আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে বলিস্! উলুপী, লক্ষ্মী মা আমার, শোন শোন, আমাকে এইটুকুন দয়া কর।

রানীমার কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কিন্তু আমি বুদ্ধি স্থির করে উঠতে পারলাম না। শেষকালে ভাল করতে গিয়ে কি তাঁর সর্বনাশ করব। শেষে আমি কোন কথা না বলে চোরের মত তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। তার পর থেকেই আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার কাছ থেকে হয়তো ঠিক বুদ্ধি পাব। আর আমি ভাবতে পারছি না, তুমি যা বলবে, আমি

তা-ই করব। কিন্তু তোমাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব? তোমার বাড়িতে গেলে তোমার বউ-যে আমাকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে আসে। আমার ভাগ্য ভাল, তুমি নিজেই চলে এলে।

সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি তাকে মুক্ত করবে কেমন করে? সে শক্তি কি তোমার আছে?

জোর করে বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। রাজ-বাড়ির দাসীরা বেশীর ভাগই মনে মনে রানীমার দিকে। তুমি তো জান, আমার ঘটে বেশী বুদ্ধি নেই, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি আছে। হয়তো তাই দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারব। তুমি যদি বল, যে-কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমি চেষ্টা করে দেখব। রানীমার সেই মুখের ছবিটা সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসে। আমাকে অস্থির করে তোলে।

সাত্যকি স্থির হয়ে একটু ভাবল, শেষে বলল, স্বাভাবিক সময়ে এ অবস্থায় কি বলতাম জানি না। হয়তো নানা রকম বুদ্ধি বার করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন বাতাস হয়ে উঠেছে এলোমেলো, কোন কিছুই স্থির থাকতে চায় না। কিসের উপর নির্ভর করে কি বলব? সব কিছুর গোড়া-যে টলমল করে উঠছে। তার চেয়ে রানী সুদক্ষিণা যা বলছেন, যদি সম্ভব হয় তাই কর। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী, বৃথাই তিনি এ কথা বলছেন না। একটা কিছু লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি এ কথা বলছেন। হয়তো-বা পিত্রালয়ে যাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাও নয়, কি যেন একটা বুদ্ধি তাঁর মাথার মধ্যে খেলছে। সেটা ধারণা করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু উলূপী, এ কাজে বিপদের ঝুঁকি বড় বেশী। যদি ধরা পড়, রক্ষা নেই। আর না-ও যদি ধরা পড়, ওদের সন্দেহ কিন্তু তোমার উপরেই পড়বে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ইতিমধ্যেই তুমি রাজপুরোহিতের সন্দেহের পাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছ।

উলূপী হেসে বলল, হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু আমি বিপদকে

ভয় করি না। এ বিদ্যা তোমার কাছ থেকেই আমি শিখেছি। আগে আমি বড়ই দুর্বল আর ভীরু ছিলাম। তুমিই আমায় সাহসী করে তুলেছ।

আমার কাছ থেকে? মিথ্যা কথা। আমি কোনদিন এমন কোন কথা তোমায় বলি নি।

না, মিথ্যা নয়। তুমি মুখে বল নি, সে কথা সত্য। কিন্তু না বলেও তুমি বলেছ। কেমন করে বলেছ, সে কথা নিজেই তুমি জান না।

উলুপী আর সাত্যকি স্থির দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাত্যকি, একটা কথা আমায় বলবে? উলুপী প্রশ্ন করল।

কি কথা?

তুমি তো শূদ্র নও, কিন্তু শূদ্রদের সঙ্গে নিজের ভাগ্য এমন করে কেন জড়িয়ে ফেললে?

উলুপী, এই প্রশ্ন সুদর্শনও একদিন আমায় করেছিল। আর আজ তুমি করলে। আমি নিজেও কত দিন নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি। তুমি তো জান, সমাজে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃত হলেও আমার দেহে অনার্য রক্ত আছে। সেজন্যই বোধ হয় উচ্চ বর্ণের আর্য্যদের মত আমি ওদের ঘৃণা করতে পারি না।

ঘৃণা করবে কেন? ঘৃণা করবার কথা কি আমি বলছি? কিন্তু তাই বলে তুমি নিজের সমাজ ছেড়ে, তোমার বউ আর ছেলেদের ছেড়ে এমন করে ওদের সঙ্গে মিশে যাবে? এই দুর্যোগের দিনে এতে-যে কত বিপদ তা তো তুমি ভাল করেই জান, তবু তুমি জেনে-শুনে সেই বিপদের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়বে? এমন তো কেউ করে না। তুমি কি আশা কর যে, ওরা উচ্চ বর্ণের আর্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

সাত্যকি একটু হেসে বলল, একেবারে আশা-যে করি না তা নয়, কিন্তু আমার আশার চেয়ে আশঙ্কাটা বড়।

তবু তুমি ওদের সঙ্গেই থাকবে?

হ্যাঁ, তবু আমি ওদের সঙ্গেই থাকব।

কেন? যা কেউ করে না, তুমি তা করবে কেন?

সত্যিই কি সে কথা শুনতে চাও উলুপী? তবে শোন, বলছি। ছোটবেলা পিতার কাছে কত পুরাণ-কথা আর কত কাহিনীই-যে শুনেছি! তার অনেক কথাই বুঝতাম না। যা-ও বা বুঝতাম, তার অনেক কিছুই ভুলে গেছি। তবু কোন কোন কথা এখনও মনের মধ্যে গেঁথে আছে। তারই মধ্যে একটি কাহিনী, যেমন সুন্দর তেমনি মধুর! শুনবে তুমি সেই কাহিনী?

বল। আমি শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

সাত্যকি বলে চলল,

তবে শোন, রাজা বিপশ্চিতের কাহিনী। শাস্ত্রকার যাই বলুন না কেন, এ কখনও পুরাণ ইতিহাস নয়, সত্য ঘটনা নয়। কেন না, স্বর্গ, নরক এগুলি মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র। ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। রাজা বিপশ্চিতের কাহিনীও মানুষের রচিত কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার রচয়িতা মানব ধর্মের সার কথা বলে গিয়েছেন।

ধর্ম? তোমারও তবে ধর্ম আছে? উলুপী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল।

আছে বই কি। কিন্তু সে কথা কেউ জানে না। আজ শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি জান, আমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। শুধু আর্যদের শাস্ত্র নয়, আর্যেতর অন্যান্য জাতির শাস্ত্রও আমি আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন শাস্ত্রই আমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছেলেবেলায় পিতার মুখে শোনা সেই রাজা বিপশ্চিতের কাহিনী আমার মনে পড়ে গেল। এতদিনে আমি তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। এতদিনে আমি আমার ধর্ম পেয়ে গেলাম।

কই, বললে না তো রাজা বিপশ্চিতের কাহিনী।

হ্যাঁ, এই-যে বলছি। রাজা বিপশ্চিত, সমস্ত পৃথিবীতে যাঁর ধার্মিক বলে খ্যাতি, তিনি পূর্ণ-শত বর্ষ জীবন যাপনের পর মানবলীলা সংবরণ করলেন। মৃত্যুর পর যমদূত তাঁকে নরকে নিয়ে গেল। রাজা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, আমি কি এমন পাপকার্য করেছি যে, আমাকে নরকে নিয়ে এলেন? যমদূত বললেন, আপনি আপনার জীবিতকালে একদিন আপনার ঋতুমতী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করতে অবহেলা করে শাস্ত্রাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। সেই পাপে আপনার সামান্য মাত্র নরকবাসের দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই নিয়ে কথা বলাবলি করতে করতে দণ্ডকাল শেষ হয়ে গেল। যমদূত বলল, চলুন, আমরা নরকের বাইরে যাই। যেইমাত্র তাঁরা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, অমনি চতুর্দিক থেকে অসংখ্য কণ্ঠে যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা গেল। কারা যেন কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে বলছিল, মহারাজ, চলে যাবেন না, চলে যাবেন না, আর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ান। আমরা নরকের আগুনে দগ্ধ হয়ে মরছিলাম। আপনার স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস বায়ুতে আমাদের গা জুড়িয়ে গেল, সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল, মহারাজ, দয়া করে আর একটু দাঁড়ান। রাজা বিপশ্চিত বিস্মিত হয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে যমদূতকে প্রশ্ন করলেন, এ কি? যমদূত তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, তাঁর সৎকর্মসমূহ স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস রূপে নির্গত হয়ে নরকবাসীদের যন্ত্রণার উপশম করছে।

তখন রাজা বিপশ্চিত বললেন, আমি মনে করি, যন্ত্রণাকাতর প্রাণীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার মধ্যে যে-আনন্দ, স্বর্গলোক বাসেও সে আনন্দ নেই।

যমদূত বলল, আসুন, মহারাজ, চলে আসুন। আপনি স্বর্গলোকে গিয়ে আপনার পুণ্যকর্মের ফলভোগ করুন। আর যারা তাদের পাপকার্যের ফলে শাস্তির যোগ্য, তারা এই যন্ত্রণা ভোগ করুক।

রাজা বললেন, না, নরকের এই হতভাগ্য অধিবাসীরা যদি আমার

সাহচর্যে সুখী হয়, আমি কিছুতেই তাদের ছেড়ে চলে যাব না। যে মানুষ নির্যাতিতের জন্য বেদনা বোধ করে না, সে মানুষের জীবনে ধিক। নিপীড়িতকে পীড়ন থেকে রক্ষা করবার জন্য যার প্রাণ কাঁদে না, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলের প্রতি যার হৃদয় পাষাণের মতই কঠিন, তাকে আমি মানুষ বলে বিবেচনা করি না। সে পাষণ্ড। যাগযজ্ঞ, দান, কৃচ্ছ্রসাধন যত কিছুই সে করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল। কোন কিছুই তার ইহলোক আর পরলোকের সহায়ক হতে পারে না। এই নরকবাসী দুর্ভাগ্যদের সাহচর্যের ফলে যদি আমাকে এই নরকের অগ্নিদাহ ও পুতিগন্ধ সহ্য করতে হয়, ক্ষুধা আর তৃষ্ণার যাতনায় যদি জ্ঞান লোপ পায়, তবে তাও আমার কাছে স্বর্গসুখের চেয়ে মধুরতর— যদি আমি ব্যথাতুরকে আরাম দিতে পারি, আমার এই দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে বহু অসুখী যদি সুখী হয়ে ওঠে, তবে তার চেয়ে বেশী আর কি আমার কাম্য হতে পারে? যমদূত, আমার জন্য দাঁড়াবেন না। আমি এখানেই থাকব। আপনি স্বস্থানে চলে যান।

তখন যমদূত বললেন, দেখুন, দেখুন, ওই ধর্ম আর দেবরাজ শক্র আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসছেন। মহারাজ, এখান থেকে যেতেই হবে আপনাকে।

ধর্ম তাঁকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি। আপনি স্বর্গবাসের অধিকারী। আপনি অগৌণে এই দেবরথে প্রবেশ করুন। চলুন আমরা যাই।

রাজা তার উত্তরে বললেন, হে ধর্ম, এখানে এই নরকে কি কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করছে এরা! তারা আমার দিকে চেয়ে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, রক্ষা কর! রক্ষা কর! এদের ছেড়ে আমি কেমন করে চলে যাব? না, আমি যাব না।

এবার দেবরাজ শক্র তাঁকে ডেকে বললেন, মহারাজ, এদের কথা

ভাববেন না। এরা নিজ নিজ পাপকার্যের ফল ভোগ করছে। আপনি আপনার পুণ্যের ফল ভোগ করবার জন্য স্বর্গে চলুন।

রাজা বললেন, হে ধর্ম, আপনি পাপ-পুণ্যের বিচারক। আপনি দয়া করে বলুন, আমার কি কি পুণ্য কাজ আছে?

ধর্ম উত্তর দিলেন, আপনার পুণ্যকার্যের পরিমাপ করা যায় না। সমুদ্রের জলবিন্দুর মত, আকাশের তারকারাজির মত, নদীর বালিকণার মত তা অপরিমেয়।

রাজা করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, হে দেবতাগণ, আপনারা আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমার যত কিছু পুণ্যকার্য আছে, তাঁদের বিনিময়ে এই হতভাগ্যেরা এই অসহ নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করুক।

তখন দেবতারা তাঁর এই প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর কামনা পূর্ণ করলেন। নরকের অধিবাসীরা যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করল, আর রাজা বিপশ্চিত স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

এই হোল রাজা বিপশ্চিতের কাহিনী। কিন্তু এ কি উলুপী, তোমার চোখে জল কেন? সেই নরকবাসীদের যন্ত্রণার কথা মনে করেই কি তোমার কান্না পেয়ে গেল?

উলুপী চোখ মুছতে মুছতে বলল, না, তা নয়। তোমার এই কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, আমিই যেন সেই নরকবাসী, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মরছি। আর তুমি রাজা বিপশ্চিতের মত মুক্তির আলো নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাক, তোমার স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত জ্বালা মিলিয়ে যায়। কিন্তু তুমি যখন দূরে চলে যাও, আমার অন্তরাত্মা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে।

সাত্যকি স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইল। শেষে বলল, উলুপী, তোমার এতই দুঃখ? আমি তো এমন করে কখনও ভেবে দেখি নি।

ভেবে দেখ নি? তবে কেমন করে ছেলেবেলায় পিতার মুখে

শোনা রাজা বিপশ্চিতের কাহিনীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলে ? কোথায় দেখেছিলে এমন নরকের ছবি ?

ভাল কথাই বলেছ। সুদর্শনের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একদিন শূদ্র পল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে তাদের জীবন-যাত্রার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলাম। আর সেইদিনই আমি প্রথম রাজা বিপশ্চিতের কাহিনীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করলাম। সেইদিনই আমি মানব ধর্মকে খুঁজে পেলাম।

সেই নরকটাই তোমার চোখে পড়ল, আর আমার নরক তুমি দেখেও দেখলে না, এমনি একচক্ষু তুমি! থাক সে কথা। এখন সেই পুরানো কথাটাই আবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি চিরদিনের জন্য ওদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নিলে ?

হ্যাঁ, উলুপী।

তোমার বউ, আর তোমার ছেলেরা ?

সে প্রশ্ন আমাকে কোরো না। আমি এ বিষয়ে নিরুত্তর। কেমন করে জানি না, আমার সমস্ত দায়-দায়িত্বের বন্ধন যেন কেটে গেছে।

এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাবে তুমি, আর কি তোমার খুঁজে পাব ? সাত্যকি, আমি তো তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাই নি। বল, আমার একটা কথা তুমি রাখবে ?

সাত্যকি বলল, উলুপী, কেন জানি না, আজ মনে হচ্ছে তোমাকে আজ যেন নতুন করে পাচ্ছি।

উলুপীর চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, আমি তো পুরানো দিনের সমস্ত আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে তোমার কাছে নতুন হয়েই যেতে চাই, যদি তুমি নাও।

তুমি আমার কাছে কি যেন চেয়েছিলে উলুপী ? আজ মনে হচ্ছে, তোমাকে যেন অনেক কিছুই দিতে পারি। কিন্তু তুমি এমন কিছু চেয়ো না, যাতে আমাকে আমার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়।

ছিঃ, তা কেন চাইব? তোমার ওই ধর্মের জন্যই তো তুমি আমার কাছে এসেছিলে, সে কথা কি আমি বুঝি না? তোমার ধর্মের পথে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ সাত্যকি। এটাই আমার চাওয়া। আমি কি অতিরিক্ত কিছু চাইলাম?

না, অতিরিক্ত নয়। কিন্তু বড় দুর্যোগের দিন যে।

দুর্যোগ বলেই তো। তা না হলে হয়তো এমন একটা কথা বলতে পারতাম না। আমি জানি, তুমি মৃত্যুর মুখে ছুটে চলেছ। আমার ভয় হয়, তুমি আমাকে ফেলে একদিন চলে যাবে। আমি তার খবরটুকুও জানতে পারব না। সারা জীবন বৃথা খুঁজে খুঁজে বেড়াব। না, সাত্যকি, তা হবে না। যদি মরতে হয়, দু'জনে এক সঙ্গেই মরব।

তুমি কি এদের মধ্যে থাকতে পারবে? এরা-যে অন্ত্যজ।

আমার চেয়েও অন্ত্যজ এরা?

ওরা-যে তোমাকে সমাজচ্যুত করবে।

আমার কি সমাজে স্থান আছে? তুমি কেন আমাকে মিছে ভয় দেখাচ্ছ?

যাক, আর তবে ভয় দেখাব না। তুমি সাধ করে দুঃখ ভোগ করতে চাও, আমি কেমন করে ঠেকিয়ে রাখব!

উনিশ

যে-ঝড়ের প্রতীক্ষায় সারা আকাশ থমথম করছিল, অবশেষে সেই ঝড় এসে গেল। প্রথম আক্রমণ হোল সেই খোঁড়া নকুলের বাড়িতে। এতদিন ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণে যেভাবে ঠোকাঠুকি চলত, এ আক্রমণ সে রকম নয়। এর জাতই আলাদা। ওরা যখন দল বেঁধে বনে পশু শিকার করে তখন কতকটা এই ভাবেই করে।

সাত্যকি যখন উলুপীকে বলছিল, তুমি সাধ করে দুঃখ ভোগ করতে চাও, আমি কেমন করে ঠেকিয়ে রাখব, তার একটু বাদেই একটা কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। ওরা দু'জনেই চমকে উঠল, এত রাত্রিতে কিসের কোলাহল ? ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, নগরের উত্তর দিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন আগুন লেগেছে। শুকনো খটখটে দিন। এ সময়টায় এখানে প্রায়ই আগুন লাগে।

সাত্যকি বলল, যাব নাকি একবার ?

উলুপী বাধা দিয়ে বলল, না। আজ উলুপী সাত্যকিকে জীবন-মরণের সঙ্গীরূপে নতুন করে পেয়েছে। এখন এক মুহূর্তের জন্যও সাত্যকিকে ছেড়ে দিতে সে রাজি নয়। সাত্যকি মুখে বললেও আসলে তার যাবার ইচ্ছা ছিল না। সে উলুপীর হাত ধরে ঘরে এসে ঢুকল। ওরা সারা রাত ধরে গল্প করল। তার পর ভোর হবার কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বেশ একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই উলুপী বাধা দিল, না, এখন কোথায় যাবে ? আমি এখনই রান্না বসিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে-দেয়ে তারপর যেখানে খুশি বেরোও। ওর কথায় রীতিমত কর্ত্রীর সুর। সাত্যকি মনে মনে হাসল। ভালও

লাগল। ভাবল, এক রাত্রির মধ্যে অনেক বদলে গেছে উলুপী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, সে নিজেও তো কম বদলায় নি। ভারী মিষ্টি লাগছে ওর এই শাসনটুকু। অথচ উলুপী তো তার কাছে নতুন নয়। আগেকার দিনে সে ওর সঙ্গে কত রাত্রি যাপন করেছে। সকাল-বেলায় ওর পাওনাটা বুঝিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে চলে গেছে। সারা দিন আর ওর কথা মনেও পড়ে নি। রাত্রিবেলায় আবার মনে পড়েছে ওর কথা। কিন্তু ও তো আর তার ঘরের বউ নয় যে, নির্জন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে শুধু তারই জন্য প্রতীক্ষা করবে। কোনদিন পেয়েছে, কোনদিন বা দেখেছে তার জায়গায় অন্য লোক বসে আছে। তখন মুখ ঘুরিয়ে সে অন্য মেয়ের খোঁজে গেছে। কিন্তু এখন কি-যে হয়েছে, ওকে ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। ও আসছে, যাচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে দুটো একটা কথা বলছে, একটু হাসছে, সবকিছু মিলিয়ে ভারী মিষ্টি লাগছে। এর একটা আলাদা রকম স্বাদ। এই আস্বাদটুকু সাত্যকির কোনদিন জানা ছিল না।

উলুপী এতদিন শুধু নিজের জন্যই রেঁধে আসছে। অন্যের জন্য রাঁধবার সুযোগ পায় নি। এতদিন রান্নাটা ওর কাছে ছিল একটা কঠিন কর্তব্য। কোনমতে দায়-সারা করে চুকিয়ে দিতে পারলেই বাঁচত। কিন্তু আজ রান্নাটা যেন একটা উৎসবের মতই মনে হচ্ছে। ওর যত বিদ্যা আর যত বুদ্ধি সব রান্নার মধ্যে ঢেলে দিল। আজ ওর মনে পড়ছে ওর ছোটবেলার কথা। মনে পড়ছে, মা কেমন করে বাবাকে মিষ্টি মিষ্টি বকুনি দিত। আর কি আশ্চর্য, ওর মা'র মুখের বকুনি খেয়ে বাবার মুখটা কেমন হাসি হাসি হয়ে উঠত। উলুপীর বকুনি খেয়ে সাত্যকির মুখটাও অবিকল সেই রকম হয়ে উঠছে। রান্না করতে করতে উলুপী কত রকম স্বপ্নের জাল বুনে চলে। কিন্তু আচমকা কার একটা হ্যাঁচকা টানে জাল ছিঁড়ে যায়। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়, এই দুর্যোগের দিনে এসব কি কথা ভাবছে সে? ওরা তো বাঁচবার আশা নিয়ে ঘর বাঁধছে

না, ওদের মিলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, যদি মরতেই হয়, এক সঙ্গে মরব।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, উলুপীর ধমক খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বিকাল বেলায় পথে বেরোল সাত্যকি। পথে বেরোতেই দেখল এ কি কাণ্ড, নগর শুদ্ধ তোলপাড়, কেবল সে-ই কোন খবর রাখে না। কাল রাত্রিবেলা যে-আগুন দেখেছিল, তা সাধারণ অগ্নিকাণ্ড নয়। কাল নিশুতি রাত্রিতে শূদ্রেরা দল বেঁধে নকুলের বাড়ি আক্রমণ করেছিল। এসেই ওরা বাড়িটাকে ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দিল। বাড়িতে নকুল, তার বউ আর তিনটা ছেলে-মেয়ে। ওরা জেগে উঠে লাফালাফি করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাবে সাধ্য কি! যমদূতের মত লাঠিসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব। ওরা তাদের লাঠিপেটা করে আগুনের মধ্যে ফেল দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু ঘটে গেল। পাড়ার লোক যারা, তারা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল, কাছে এগোতে সাহস করল না। পরে চার দিক থেকে বহু লোক যখন ছুটোছুটি করে এল, তখন ওদের কাউকেই দেখতে পেল না। ওরা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে। নকুলের ঘরগুলি দাউ দাউ করে শত শিখা বিস্তার করে জ্বলতে লাগল। সামনে এগোয় কার সাধ্য!

অনেকেই জানত, নকুল গোপই বলির শিশুটিকে চুরি করে আনিয়েছিল। কাজেই এ কথাটা কারু বুঝতে বাকী রইল না যে, নকুল গোপকে সপরিবারে উচ্ছন্ন করে দিয়ে ওরা তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। কেউ কেউ আফসোস করে বলল, সামান্য একটা শূদ্র ছেলের জন্য পাঁচ-পাঁচটি মূল্যবান প্রাণ গেল। আবার কেউ-বা বলল এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ? গোতমপুত্র সন্দীপনের অভিশাপ এই তো সবে ফলতে শুরু করেছে। দেখ না, পরিণামে কি হয়। গোকর্ণ প্রদেশের আর রক্ষা নেই।

এমন একটা ঘটনায় নগরবাসীদের উত্তেজিত হয়ে উঠবার কথা।

কিন্তু তারা যতটা উত্তেজিত হোল, সন্ত্রস্ত হোল তার চেয়ে বেশী। শূদ্রপল্লীগুলি মনে করেছিল রাজার সৈন্যদল ও উচ্চ বর্ণের আর্যেরা তার পরদিনই প্রতি-আক্রমণ করবে। সেজন্য তারা তৈরি হয়েই ছিল। কিন্তু এই তরফের কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেল না। সারা দিন শান্তিতেই কেটে গেল। শূদ্র পাড়ার নেহাৎ চ্যাংড়ারা বলল, ওরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু আর সবাই বলল, ওরা ভিতরে ভিতরে কি যেন মতলব আঁটছে। খুব হুঁশিয়ার থেকো সবাই।

চুপচাপ আরও ক'টা দিন কাটল। শূদ্রপল্লীর লোকেরা এর মানে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। ইতিমধ্যে নগরে নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে লাগল। শূদ্রদের কাছ থেকে এমন একটা ঘা খেয়ে নগরের দুই পক্ষের দলাদলি ও দাঙ্গাহাঙ্গামাটা বন্ধ হয়ে গেল! সত্য-মিথ্যা বলা কঠিন, তবে একটা কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, উষস্তি চাক্রায়ন ও প্রাচীন বৃদ্ধ মন্ত্রী একদিন নাকি মিটমাটের জন্য গোপনে বসেছিলেন। পরে আরও শোনা গেল, মিটমাটের আলাপ-আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অবশেষে ঐ ঘটনার ঠিক চার দিন বাদে রাজার নামে ঘোষণা প্রকাশিত হোল যে, নতুন পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে শ্রুতকীর্তির পরিবর্তে ভাস্করদেবকে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হোল। তখন সবাই বুঝল, এর আগে এ সম্পর্কে যে-সব জনরব শোনা গিয়েছে, সেগুলি সবই সত্য।

ভাস্করদেব শূদ্র কর্ষকদের উপরে নতুন কর ধার্য করবার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী হয়ে বসবার পর তিনি মত পরিবর্তন করে ফেললেন। তিনি বললেন, এই অবস্থায় এই কর তুলে দেওয়া যায় না। তা হলে ওরা আমাদের দুর্বল মনে করবে। ওদের স্পর্ধা বড় বেশী বেড়ে গেছে। এবার এমন করে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারে। রাজা বৃষকেতুর প্রপিতামহও একদিন এই রকম শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষার মর্ম শিক্ষাদাতাকেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছিল।

তার ফলে পরবর্তী রাজারা বুঝে-শুনে পা ফেলতেন। দু' পুরুষ পর্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। তার পর এতদিন বাদে উষস্তি চাক্রায়ন বলিবৃদ্ধির উপদেশ দিয়ে সেই একটানা শান্তির একঘেয়েমিটাকে ভেঙে দিলেন। চারদিককার চাপে পড়ে বলিবৃদ্ধির প্রস্তাবটা তুলে নিতে হয়েছিল। কিন্তু যে-অশান্তির আগুন উস্‌কিয়ে তোলা হয়েছিল, সেই আগুন ইন্ধনের পর ইন্ধন পেয়ে গর্জে গর্জে উঠতে লাগল। ভাস্করদেব সিদ্ধান্ত করলেন, উষস্তি চাক্রায়ন যেখানে তাদের নিয়ে এসেছেন, সেখান থেকে আর ফিরবার পথ নেই, এগিয়েই চলতে হবে। এক্ষেত্রে আগুন দিয়েই আগুন নেভাতে হবে।

শূদ্র-বিদ্রোহের সেই অতীত কাহিনী সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সে তো দূর অতীতের কাহিনী, তার কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা, সে কথা কে বলতে পারে! কিন্তু আজ আর কাহিনী নয়, বিদ্রোহ আজ হিংস্র বাঘের মতই এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কে ভাবতে পেরেছে, ওরা এমন প্রকাশ্য ভাবে নগরের বুকে এসে এক জন রাজ-কর্মচারীকে সপরিবারে হত্যা করবার মত সাহস পাবে? যা ভাবনার অতীত, তাও হয়ে যায়। কে জানে, এর পরে আরও কত কি আছে! নগরবাসীরা অবাক হয়ে দেখল, সেনাপতি আর সৈন্যদলের কোন সাড়া-শব্দ নেই, কোন উদ্যোগ আয়োজন নেই, এত বড় একটা আঘাত কি এরা নিঃশব্দেই হজম করে নেবে? শূদ্রেরাও বিমূঢ় হয়ে বলল— এ কি!

কিন্তু এ পক্ষ চুপ করে বসে ছিল না। পাকা শিকারীর মত মোক্ষম জায়গায় মারাত্মক আঘাত হানবার জন্য ওরা তাক করে বসেছিল। শূদ্রদের মধ্যেও ওদের পোষমানা লোক আছে, যারা ওদের গুপ্তচরের কাজ করে। তারা এসে খবর দিল, মাতঙ্গি বুড়ি শত্রু-নাশের ব্রত শুরু করেছে। এই ব্রত বড় কঠিন ব্রত। এই ব্রত সহজে ওরা করতে চায় না। ব্রতের নিয়ম-শৃঙ্খলার তিলমাত্র স্খলন হলে ব্রতচারিণীর অবধারিত মৃত্যু। সেজন্যই এই ব্রত করতে এরা

সাহস করে না। কিন্তু এই ব্রত সুসম্পন্ন করতে পারলে স্বয়ং জাঙ্গালী বুড়ি যুদ্ধের সময় তাদের সামনে থাকবেন। তখন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের হঠাতে পারবে।

মাতঙ্গি বুড়ি ক্ষেপে উঠেছে। সে বলল, আমি এই ব্রত করব। আমার কোন মেয়ে নেই, আমি মরে গেলে পর শূদ্রদের মাঝে আর কোন বুড়ি আসবে না। আমি শেষ বুড়ি, শেষ বারকার মত এই ব্রত করে যাব। আমার এই ব্রতের গুণে পৃথিবীময় শূদ্রের জয়জয়-কার হবে। সমাজের লোক প্রথ˙ে সাহস পায় না, কিন্তু মাতঙ্গি বুড়ি কিছুতেই ছাড়বে না। সে বলল, তোরা আমাকে এতদিন ধরে দেখে আসছিস্, আমার কোন ব্রত কোনদিন ভঙ্গ হয়েছে? ওরা বলল, না, এমন কথা আমরা বলতে পারব না।

তবে?

কিন্তু তবু ওরা সাহস পায় না। যদি দৈবাৎ কিছু ঘটে যায়, তখন? মাতঙ্গি বুড়ি না থাকলে বিপদে-আপদে কে তাদের রক্ষা করবে?

মাতঙ্গি বুড়ি বলল, হা রে, অবোধের দল, আমি কি তোদের জন্য চিরকাল বেঁচে থাকব? আমার মরার দিন-যে ঘনিয়ে এসেছে। মরার আগে তোদের সবার জন্য বড় রকম কিছু একটা করে যেতে চাই, যাতে তোরা ভবিষ্যতে সুখে থাকতে পারিস্। এ কাজে তোরা আমাকে বাধা দিস্‌নে।

শেষপর্যন্ত মাতঙ্গি বুড়ির মতে সবাইকে মত দিতে হোল। মাতঙ্গি বুড়ি সবাইকে বাব বার করে সতর্ক করে বলল, খুব সাবধান। নিজের ঘবে বসেও মুখ ফুটে এই ব্রতেব কথা কেউ কাউকে বলবি না। এ কথা যদি শত্রুপক্ষের কানে যায়, ওরা বন্য কুকুরের মত দল বেঁধে এসে হানা দেবে,—আমাদের ব্রত ভঙ্গ করবে। খুব সাবধান! মাতঙ্গি বুড়িকে অনুসবণ করে সবাই সবাইকে সতর্ক করে বলল, —খুব সাবধান! খুব সাবধান!

প্রথম চার দিন গ্রামবাসীরা দল বেঁধে অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্রত-স্থানকে ঘেরাও করে পালা করে দিন-রাত্রি অষ্টপ্রহর পাহারা দেবে, যাতে ব্রতভঙ্গের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে কেউ হামলা করতে না পারে। পঞ্চম দিবসের দিবাভাগেও তাদের এই পাহারা চলবে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার আগেই ব্রত-স্থান ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। মাতঙ্গি বুড়ি তখন একাই থাকবে। নিশীথ রাত্রিতে জাঙ্গালী বুড়ি পৃথিবীতে আব যত বুড়ি ছিল সবাইকে নিয়ে বেষ্টিত হয়ে নেমে আসবেন ব্রত-স্থলে। এইখানে জাঙ্গালী বুড়ি মাতঙ্গি বুড়ির সঙ্গে চুক্তবিদ্ধ হবেন। এই চুক্তি হয়ে গেলে পর ব্রত সুসম্পন্ন হবে। তখন আর কোন ভয় নেই। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শূদ্রদের সামনে থাকবেন জাঙ্গালী বুড়ি।

এই সমস্ত গোপন কথা শূদ্রদের মধ্যে ওদের যারা গুপ্তচর ছিল, তারাই বহন করে নিয়ে গেল। শুনে কেউ কেউ হাসল, কিন্তু অনেকেই হাসল না। উষস্তি চাক্রায়ন বললেন, এসব হাসবার কথা নয়। মাতঙ্গি বুড়ি ডাইনী। এসব ডাইনীরা পিশাচীসিদ্ধ, পিশাচীদের সহায়তায় ওরা অনেক কিছুই করতে পারে। আমরা প্রথমে ওদের ব্রতভঙ্গ করব, তারপর সেই ডাইনী বুড়িকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে পুড়িয়ে মারব। ডাইনীদের পুড়িয়ে মারাই শাস্ত্রসম্মত বিধি। ওদের অদ্ভুত প্রাণ, ওরা মরেও মরতে চায় না। শরীরের একটু অংশও যদি অবশিষ্ট থাকে, তাই থেকেই ডাইনীরা আবার বেঁচে উঠতে পারে।

মাতঙ্গি ডাইনীর কথা স্মরণ করে অনেকেই শিউরে উঠল। যারা পরামর্শ করতে বসেছিল, তারা সবাই বলল, হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক। ওদের সমস্ত বল-ভবসা মাতঙ্গি বুড়ি। মাতঙ্গি বুড়ি না থাকলে ওরা একেবারেই ভেঙে পড়বে। সবচেয়ে আগে মাতঙ্গি বুড়িকে শেষ কব, তার পর অন্য কথা।

ওদিকে শূদ্র পল্লীতে সকলের চোখে-মুখে উল্লাসের দীপ্তি। ব্রতের চাব দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। আর একটা মাত্র দিন। তা কি আর

যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। মাতঙ্গি বুড়ির জীবনে কোনদিন কোন বিষয়ে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। পঞ্চম দিনের দিবা ভাগও কেটে গেল। সন্ধ্যা নামবার আগেই মাতঙ্গি বুড়ি বলল, এবার যা, তোরা সব চলে যা।

ওরা বলল, বুড়ি-মা, আজকের এই রাত্রিতে তোমাকে একা ফেলে চলে যেতে আমাদের মন সরছে না। তুমি আজ্ঞা কর, আমরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিই।

মাতঙ্গি বুড়ি হেসে বলল, তোরা কি পাগল হলি? এখানে আমার আজ্ঞা খাটবে কেন? এ নিয়ম-যে জাঙ্গালী বুড়ির নিয়ম। যা রে, তোরা যা।

মাতঙ্গি বুড়ি বলল বটে, কিন্তু ওদের চিন্তিত আর কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটা কেমন হু হু করে উঠল। আহা, কি মায়ায় ভরা মন ওদের, তাকে ফেলে কিছুতেই যেতে চাইছে না। কিন্তু যেদিন ওদের ছেড়ে একেবারেই চলে যেতে হবে, সেদিনের তো আর বেশী বাকী নেই। মাতঙ্গি বুড়ি নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করল— কবে আসবে সেদিন? আহা, ওরা-যে তার উপরেই নির্ভর করে থাকে। সে না থাকলে ওদের কি দশা হবে?

ওরা চলে গেল। সন্ধ্যা যখন ঘন হয়ে নেমে এল, মাতঙ্গি বুড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ির চারদিক ঘুরে গণ্ডী টানল। কোন অনিষ্টকামী মানুষ বা পশু এই গণ্ডী ভেদ করে ঢুকতে পারবে না।

কি আনন্দের দিন আজ! আজ সে স্বচক্ষে জাঙ্গালী বুড়িকে, চমূণি বুড়িকে আর অতীত দিনের সমস্ত বুড়িদের স্বচক্ষে দেখবে .েবে। দেখবে তার নিজের মা-দিদিমাকেও। মৃত্যুর পর রো শোক পাপ-তাপ-থেকে মুক্ত হয়ে আর সব বুড়িদের মত সে জাঙ্গালি বুড়ির অনুচরী হয়ে ফিরবে। কি ভাগ্য তার! কি ভাগ্য তার! কিন্তু যারা এখানে এত দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার মধ্যে পড়ে রইল আর যারা ভবিষ্যতে এই দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার বোঝা বইতে আসবে

তাদের কি হবে? জাঙ্গালি বুড়ির পাশে পাশে থেকেও সে কি ওদের কথা ভুলে থাকতে পারবে? আহা, ওরা-যে বড় অসহায়। ওদের দিকে তাকাবার মত কেউ থাকবে না। মনে মনে ভাবল মাতঙ্গি বুড়ি, জাঙ্গালী বুড়ি এলে তার তুই পা জড়িয়ে ধরে বলবে, মা গো, তুমি ওদের দেখো, ওরা-যে বড় দুঃখী।

চারদিক নিঃঝুম। রাত্রি ঝিম ঝিম করছে। পাঁচদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে অবসন্ন হয়ে এল মাতঙ্গি বুড়ির দেহ। চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। এ কি, করছে কি সে? ঘুমুলে তো চলবে না। ওঁরা যে আসবেন। তাকে ঘুমন্ত দেখে ওঁরা যদি ফিরে চলে যান! চোখ কচলে উঠে বসল সে। কিন্তু একটু বাদেই আবার ঘুমের ভারে ভেঙে পড়ল। এক বার যেন কাদের পায়ের শব্দ শুনল। কে এল? কিন্তু ঘুমোতে ঘুমোতেই সে ভাবল, কে আবার আসবে? আমার গণ্ডী তো টানাই আছে, এর মধ্যে ঢুকবে কে? আর ওঁরা? ওঁরা তো আসবেন আকাশ বেয়ে। ওঁদের পা তো মাটিতে পড়ে না, শব্দ হবে কেমন করে!

স্বপ্ন দেখল মাতঙ্গি বুড়ি। ছোট্ট শিশু হয়ে সে যেন তার মা'র কোল আকড়ে ধরে আছে। মা তাকে দোলাচ্ছেন, দোলাচ্ছেন, আব তাকে নিয়ে উড়ে চলেছেন। বাতাসের ঝাপটা ওর চোখে-মুখে লাগছে। বাঃ, কি মজা! আবাব কতদিন বাদে সে তার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলে চেয়ে চমকে উঠল মাতঙ্গি বুড়ি। এ কি, এ কোথায় এসেছে সে? কত লোক তার চারদিকে। ওদের হাতে হাতে মশাল। মশালের আলোয় অন্ধকার রাত্রি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওরা সবাই গৌরদেহ উচ্চবর্ণের আর্য। এদের মধ্যে সে কেন? তার ব্যগ্র চোখ দু'টি সেই ভিড়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল। না, তার মধ্যে কোথাও একটু চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধ কালো রং খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভাববার মত বেশী সময় ছিল না। একটা বলিষ্ঠ লোক তাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার হাত পা বাঁধতে লাগল। বাঁধনগুলি যেন কেটে কেটে বসছে। ব্যথা পেয়ে সে বলে উঠল, এ কি, এমন করে বাঁধছ কেন? লাগছে যে। তারা ওর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। ওরা হাসতে লাগল, কত রকম কত কথাই যে বলতে লাগল, কিন্তু ওদের কোন কথাই বুঝল না সে।

ওর পাশেই মোটা একটা লোহার দণ্ড পোঁতা আছে। একটা লোহার শিকল দিয়ে লোকটা তাকে দণ্ডটার সঙ্গে বাঁধল। সে ভাবল, ওরা কি করছে আমাকে নিয়ে? আমাকে মেরে ফেলবে নাকি? তারপর ওরা যখন বোঝা বোঝা কাঠ দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল, তখন সে বুঝতে পারল ওরা তাকে পুড়িয়ে মারবে। এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্রতস্থলে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর ওরা তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। এ কি সর্বনাশ, এ কি করেছে সে? কেন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল? এত কঠোর ব্রত, যে-ব্রত করতে কেউ সাহস পায় না, সেই ব্রত তো প্রায় সমাপণ করেই এনেছিল সে। শেষকালে একটুকুর জন্য ব্রতভঙ্গ হয়ে গেল। এখন তো তাকে মরতেই হবে। তা হোক, কিন্তু তাতেই তো শেষ হবে না, এর ফলে সমস্ত শূদ্র জাতের উপর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে যে। মনের যন্ত্রণায় সে ছটফট করে কাতরাতে লাগল। তাই দেখে দর্শকেরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল।

একজন লোক মৃত পশুর চর্বি দিয়ে কাঠের বোঝা আর মাতঙ্গি বুড়ির সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল। আর একজন মশালধারী লোক তার হাতের জ্বলন্ত মশালটা কাঠের উপর চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে একটা অগ্নি মণ্ডল মাতঙ্গি বুড়িকে ঘিরে ফেলল। সেই আগুনের ছোঁয়ায় তার কাপড়টা জ্বলে উঠল। মাতঙ্গি বুড়ি মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু প্রস্তুত হয়ে থাকলেই মৃত্যু-যন্ত্রণাকে এড়ানো যায় না। অগ্নিদাহের তীব্র যন্ত্রণায় সে দুই দুইবার তীক্ষ্ণ আকাশ ফাটানো

চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার শুনে উল্লাসমত্ত দর্শকেরা আতঙ্কে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। একজন বলে উঠল, ডাইনী ছাড়া এমন বীভৎস চিৎকার আর কেউ করতে পারে না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মাতঙ্গি বুড়ি তার শেষ কথাটি বলেছিল, বুড়িমা, বুড়িমা, ওদের তুমি দেখো। কিন্তু সে কথা কেউ ওরা শুনতে পায় নি।

পরদিন ভোরে শূদ্র পল্লীর সমস্ত লোক দল বেঁধে মাতঙ্গি বুড়ির ওখানে গেল। গিয়ে দেখল, মাতঙ্গি বুড়ি নেই। অনেক খুঁজেও তাকে আর পাওয়া গেল না। কেউ বলল, ব্রত সম্পূর্ণ করতে পারে নি বলে হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যদি হয়েই থাকে, তবে তার মৃতদেহ কোথায় গেল? একজন বলল জাঙ্গালী বুড়ি তাকে তার নিজের কাছে নিয়ে গেছে। যা-ই হয়ে থাক, আর তাকে তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, এ কথাটা সবাই বুঝল। মাতঙ্গি বুড়িকে স্মরণ করে ছোট বড় সবাই লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। সেইদিনই কিছু পরে তারা আসল ব্যাপারটা জানতে পারল।

ওরা ভেবেছিল মাতঙ্গি বুড়ির মৃত্যুতে শূদ্রেরা ভেঙে পড়বে। কিন্তু ফল হোল উল্টো। শূদ্র অঞ্চলের সমস্ত মানুষ ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল। যে-সব গ্রাম আগে ঠাণ্ডা ছিল, তারাও এদের সঙ্গে যোগ দিল। এটা ওদের হিসাবের মধ্যে ছিল না।

সংঘর্ষ এখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। আজ এখানে, কাল ওখানে লেগেই আছে। শূদ্রেরা সুযোগ পেলেই দল বেঁধে এসে লুটপাট করে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎবেগে আসে, আবার বিদ্যুৎবেগে মিলিয়ে যায়। রাজার সৈন্যেরা দেখতে পেলে ওদের তাড়া করে যায়, আর শূদ্রেরা অসুবিধায় পড়লে বনের মধ্যে মিশে যায়। রাজার সৈন্যেরা বনের মধ্যে ঢুকতে সাহস পায় না। শূদ্রেরা বিপদে পড়লেই পিছিয়ে যায়। দুঃখে-কষ্টে গড়া ওদের জীবন, ওরা যেখানে যায় সেখানেই পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু নগরবাসীরা পেছোতে পারে না, ঘরবাড়ি, স্থায়ী আস্তানা ছাড়া চলে না। এই নাঙ্গা ফৌজের

সঙ্গে ওরা কেমন করে এঁটে উঠবে! তা'ছাড়া শূদ্রেরা সংখ্যায় অনেক বেশী।

নগরবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। গৌর বর্ণের লোকদের বাইরে গেলে জীবন সংশয়। ওরা যেন নগরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। কত দিন চলবে এভাবে ঠিক আছে কিছু!

সুধন্বা বলেছিল শ্রুতকীর্তিকে, এ ভাবে আর কতদিন চলবে বল দেখি। আর তো ভাল লাগে না।

শ্রুতকীর্তি হেসে বলল, এরই মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়লে। দেখ না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আর কত দেখব, দেখতে আর বড় কম দেখলাম না। এতদিনের এত চেষ্টার পর তোমাকে মন্ত্রী করা গেল। ভাবলাম আমার দিকে তুমি একটু নজর দেবে। কিন্তু কোথায় কি, যেমন ছিলাম তেমনি আছি।

আহা, সময় পেলাম কখন? দেখ না, বসতে বসতেই গোলমাল, একটার পর একটা। আচ্ছা, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ঠিক করে দিচ্ছি মানে? তোমারটা ঠিক করে দেয় কে, তার ঠিক আছে?

আমি? আমি তো শীগ্‌গিরই আমার পদে ফিরে যাচ্ছি।

অসম্ভব। ভাস্করদেব ধুরন্ধর লোক। তার সঙ্গে টক্কর দেও অত সহজ নয়।

তার চেয়ে ধুরন্ধর লোকও সংসারে আছে।

তা থাকবে না কেন? কিন্তু সে তুমি নও। তুমি কার কথা ব[illegible]?

আমার সম্বন্ধে তোমার যখন এত আপত্তি, তখন না হয় না-ই বললাম। আমি বলছি গুরুদেবের কথা।

কিন্তু তিনি নিজেই তো সাগ্রহে ভাস্করদেবের মন্ত্রীত্বের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

তা দিয়েছিলেন। এখন প্রয়োজন হয়েছিল, দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। কাজেই শ্রুতকীর্তিকে আবার তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে।

কেমন করে তা হবে?

কেমন করে, তা জানতে চেও না। সময়ে সবই দেখতে পাবে।

আর এই মারামারি কাটাকাটি?

তাও শীগ্‌গিরই থেমে যাবে।

কেমন করে, তাও কি জিজ্ঞাসা করতে পারব না?

নগরপ্রান্তে শূদ্রপল্লী জনশূন্য হয়ে গেছে। ওখানে নতুন নতুন শূদ্রেরা এসে বসবাস করবে। তারপর শুরু হবে নতুন শূদ্র আর পুরানো শূদ্রের পরস্পরের সঙ্গে লড়াই। আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে নতুন শূদ্রদের সাহায্য যোগাব।

সুধন্বা বলল, বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু নতুন শূদ্রেরা আসবে কোত্থেকে? এদিককার শূদ্রেরা কেউ আসতে রাজি হবে না।

বুড়ো মন্ত্রী নতুন মন্ত্রী ভাস্করদেবের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছিলেন। ভাস্কর, কেমন বুঝছো?

ভাল না।

শূদ্র-দমন কাজটা যা মনে করেছিলে, তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন, তাই নয়?

সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

রাজপুরোহিত উষস্তি চাক্রায়নের খবর কি?

তিনি আমাকে সর্ব বিষয়েই সাহায্য করছেন।

কি কি বিষয়ে?

এই যেমন, বুদ্ধি-পরামর্শ যুগিয়ে।

বেশ, বেশ, তবে আমার কাছে একটা সংবাদ আছে, সত্য কি

মিথ্যা জানি না। তুমি তো জান, তিনি চিরদিনই তাঁর নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে চলতে ভালবাসেন। এই হাঙ্গামাটা বাধবার কিছু পরেই তিনি নাকি শোণপুরের রাজা কৃতবর্মার কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ভাস্করদেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, তিনি রাজপুরোহিত, এ বিষয়ে অনুরোধ জানাবার তিনি কে?

তিনি কোনদিনই রাজপুরোহিতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চান না। কিন্তু তুমি তো অনেক কথা জান না। তোমাকে তিনটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এক, রাজা কৃতবর্মা উষস্তি চাক্রায়নের অনুরক্ত ভক্ত। দুই, গোকর্ণ প্রদেশের উপর রাজা কৃতবর্মার বহুদিন থেকেই লোলুপ দৃষ্টি আছে। তিন, ইতিপূর্বে রাজা কৃতবর্মা শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করতে গিয়ে কাম্যক-নগর নামে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যকে গ্রাস করে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারগুলি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। অবশ্য আমার এই সংবাদ অসত্যও হতে পারে। অসত্য হোক, এটাই কামনা করি।

ভাস্করদেব একটু চিন্তান্বিত থেকে শেষে বললেন, না না, আপনার এই সংবাদ অসত্য বলে মনে হচ্ছে না।

কেন, হঠাৎ এমন কথা বলছ যে?

বলবার কারণ আছে। এখন আমার স্মরণ হচ্ছে, তিনি কিছু-দিন আগে আমাকে বলেছিলেন, প্রতিবেশী রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে দেখাটা কেমন মনে করেন? আমি বললাম, তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন কেন?

কেন করবেন না? সুসময়-দুঃসময় সবারই আছে, প্রজাবিদ্রোহ সব দেশেই ঘটে থাকে। বুদ্ধিমান রাজারা এ বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে সাহায্য বিনিময় করবেন, এইটাই তো স্বাভাবিক। তাঁর কথাটার তখন আমি ততটা গুরুত্ব দিই নি। আপনার কথা শুনে এখন মনে

পড়ছে। কিন্তু এই গুহ্যতম কথাটা আপনি কেমন করে জানলেন? আশ্চর্য মানুষ আপনি।

আশ্চর্য কিছু নয়, তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের কারবার কিনা, কাজেই তাঁর খবরাখবর আমাকে রাখতে হয়। অবশ্য আমার অনেক গোপন খবরও তিনি রাখেন। আমরা পরস্পর খুবই অন্তরঙ্গ। ভাল কথা, তুমি কি জান, রানী সুদক্ষিণা উষস্তি চাক্রায়নের আদেশে রাজপ্রাসাদে বন্দিনী হয়ে ছিলেন?

সে কি, এ কথা জানি না তো!

তবে আরও একটু খবর শুনে রাখ। সম্প্রতি তিনি নাকি রাজপ্রাসাদের বন্দীগৃহ থেকে পলাতকা।

এ সমস্ত কি ব্যাপার! সব কিছুই-যে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে।

গোকর্ণ প্রদেশ অন্যান্য রাজ্যের মত নয়। এখানে একজন উষস্তি চাক্রায়ন আছেন। এখানে মন্ত্রীত্ব করতে হলে এ সমস্ত সংবাদ রাখতে হয়। তুমি আজ রাত্রে আমার এখানে এসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। শূদ্রদের ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে উলুপী, সত্যি কথাটা বোলো কিন্তু, প্রশ্ন করল সাত্যকি।

খুব ভাল। এত ভাল-যে লাগবে তা কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু তুমি আমাকে এত ভয় দেখিয়েছিলে কেন বল তো?

মিথ্যে ভয় তো দেখাই নি, এটা তো ভয়েরই জায়গা। রাত্রিবেলা হয়তো ঘুমিয়ে আছো গভীর ঘুমে, সময় মত সঙ্কেত পেলে না। ব্যস্, জেগে উঠে দেখবে, রাজার সৈন্যেরা তোমার ঘর ঘিরে ফেলেছে। তার পর ভেবে দেখ একবার অবস্থাটা। যদি তুমি শূদ্রের ঘরের কালো মেয়ে হতে, ওরা হয়তো মেয়ে বলে তোমায় ছেড়েও দিতে পারত। কিন্তু যদি তারা দেখে যে, তুমি ওদের ঘরের মেয়ে হয়ে

ওদের শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়েছ, তখন ওরা হয়তো তোমাকে মাতঙ্গি বুড়ির মতই পুড়িয়ে মারবে।

পুড়িয়ে মারবে? মারুক। তুমি তো জান না সাত্যকি, আমার নিজের বরটা আমাকে কেমন করে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারত। ওখানে আমার যত কলঙ্ক, যত পাপ—সেই পাপের জ্বালায় আমি জ্বলেপুড়ে মরতাম। আঃ, এখন আমি মুক্তি পেয়েছি। সাত্যকি, আমাকে ওই ঘরটায় আর কোনদিন ফিরে যেতে দিও না। আমরা কি চিরদিন এইখানে, এদের মাঝে থেকে যেতে পারি না?

চিরদিন? তোমার কথা শুনে হাসি পায় উলুপী। তুমি বারে বারেই ভুলে যাও, সাত্যকিকে নয়, স্বয়ং মৃত্যুকে তুমি তোমার সাথী করে নিয়েছ। তোমার 'চিরদিন' যে-ক্ষীণ বৃন্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে, মুহূর্তের ভর সইতে চায় না।

কেন তুমি বারে বারে আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দাও? আমি তো জেনে-শুনে তৈরি হয়েই এসেছি। কিন্তু তাই বলে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর এই মুহূর্তগুলিকে আমি সেই চিন্তায় আবিল করে তুলতে চাই না।

ঠিক বলেছ। আমিই ভুল বলেছিলাম। কিন্তু উলুপী, তোমাকে হয়তো আবার ফিরতে হবে সেই ঘরে।

কেন? কেন? ও কথা বোলো না।

অদ্ভুত, অদ্ভুত মেয়ে তুমি। তুমি যা করেছ, এমন কোন মেয়ে করতে পারত না।

কেন, কি করেছি আমি?

তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে রানী সুদক্ষিণাকে মুক্তি দিয়েছ। তুমি শ্রুতকীর্তিকে ভুলিয়ে তার মুখ থেকে উষস্তি চাক্রায়ন আর রাজা কৃতবর্মার গোপন চক্রান্তের কথাটা বের করে নিয়ে এসেছ। আমি সেই মহামূল্য সংবাদ যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সে সংবাদ কি এতই মূল্যবান?

হ্যাঁ, এতই। হয়তো এর জন্য গোকর্ণ প্রদেশের অধিবাসীরা একদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু নগরে না থাকলে তুমি তো এ কাজ করতে পারতে না। আমি ভেবে দেখলাম উলুপী, তুমি ওখানেই গিয়ে থাক। এই, অমনি মুখখানা কেমন হয়ে গেল। আরে, আমাকেও তো প্রায়ই ওখানে যেতে হবে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় যেতে না চাও, আমি বলব না যেতে।

উলুপী হেসে বলল, আচ্ছা, আর মুখ কালো করব না। তোমার যা ইচ্ছা, আমারও তাই। কিন্তু তার আগে বল, আমার সেই কাজ এদের সাহায্যে করবে তো?

নিশ্চয়। তা না হলে বলছি কেন?

আর তুমি মাঝে মাঝেই যাবে? আর আমিও মাঝে মাঝে চলে আসব এখানে, কেমন? কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাবে?

আমার অনেক কাজ সেখানে। তোমাকে পরে বলব সে কথা। মজা কি জান উলুপী, আমি এতদিন ধরে এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওদের কারু কাছে ধরা পড়ি নি। উষস্তি চাক্রায়ন ও মন্ত্রীর চোখেও আমি ধুলো দিতে পেরেছি। ওরা এখান থেকে ওখান থেকে খবর পেয়েছে, কে একজন উচ্চ বর্ণের লোক মাঝে মাঝে শূদ্র পল্লীতে যাতায়াত করে। ওরা লোকটাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু আমার নামটা পায় নি। কারণ সমস্ত শূদ্রপল্লীগুলির মধ্যে দু'-এক জন ছাড়া আর কেউ আমার নাম জানে না আমিও খুব সতর্ক-ভাবে যাতায়াত করি। এই ভাবে অজ্ঞাত অবস্থায় যত দিন থাকতে পারব, এখানে আর ওখানে, দু' জায়গায়ই আমার কাজের সুযোগ থাকবে।

উলুপী কি কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথাটা আর বলা হোল না, বাড়ির কর্তা মঙ্গল এসে বলল, আব্বন এসেছে। আপনার কথা বলছিল। ওকে কি নিয়ে আসব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। কি যেন একটা বিশেষ খবর আছে। তা না হলে আজকালকার দিনে দিনের বেলাই এমন করে চলে আসবে কেন?

কিন্তু যাই হোক, এমন অসাবধানে আসাটা ওর উচিত হয় নি।

একটু বাদেই আব্বনকে সঙ্গে করে নিয়ে মঙ্গল এসে ঘরে ঢুকল।

সাত্যকি বলল, কি আব্বন, এমন সময় এলে কেন? বার বার করে বলে দিয়েছি, তবু তোমরা বো‍্ব না। ওরা যদি দেখে থাকে, কি হবে বল দেখি? ওরা এখন সব সময় তাকে তাকে আছে। দেখলে কি আর উপায় আছে!

আব্বন সাত্যকির কথা গায়ে না মেখে বলল, আমি কি এমন বোকা-যে ওদের চোখের সামনে দিয়ে আসব? আমি অনেক ঘুরে বনের মধ্য দিয়ে এসেছি। আর এতবড় একটা খবর—এ কি আর না এসে পারা যায়? আমার তো নাচতে ইচ্ছা করছে।

নাচতে ইচ্ছা করছে, কি এমন খবর?

রাজপুরোহিত আজ আমার প্রভুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু রওনা হলেন, তার সঙ্গে এই বড় একটা বোঁচকা। আমাকে ডেকে বললেন, নে, আমার সঙ্গে বোঁচকাটা নিয়ে চল। আমি বোঁচকাটা মাথায় করে তাঁর পিছন পিছন চললাম। গিয়ে দেখি রাজ-পুরোহিতের কাছে আরও তিন জন লোক আছে। তার মধ্যে একজন শ্রুতকীর্তি, আর দু'জনকে আমি চিনি না। ওরা ক'জন মিলে গুজুর গুজুর করে কথা বলছিল।

কি বলছিল ওরা? সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল।

সে আমি শুনতে পাই নি। আমাকে আমার প্রভু বলল, যা, তুই ওইখানে গিয়ে বোস্। আমি আর কি করব, একটু দূরে গিয়েই বসলাম। অনেক চেষ্টা করলাম শুনতে। কিন্তু অত দূর থেকে শোনা যায় নাকি? আমি একটা কথাও শুনতে পেলাম না।

সাত্যকি হতাশার ভঙ্গিতে বলল, বাঃ একটা কথাও পেলে না শুনতে। তবে আবার কি খবর বলতে এসেছ?

আহা, খবর তো আছে।

আছে তো বলছ না কেন?

আব্বন ধমক দিয়ে উঠল, আঃ, বলছি তো শোন না কেন? অনেকক্ষণ কথা বলবার পর ওদের মধ্যে দু'জন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল. আমরা তবে যাই।

রাজপুরোহিত বলল, আচ্ছা, রাজা কৃতবর্মাকে বোলো, আমরা তাঁর খবর পেয়ে সুখী হলাম। আমবা এদিকে সব ব্যবস্থা করছি।

উলুপী বলল, সত্যই এটা একটা খবরের মত খবব।

আঃ, এ আবার কি খবব! আব্বান বলে উঠল, খবব তো এখনও বলাই হয় নি। সে খবর শুনলে তোমরা খুশি হয়ে যাবে।

তবে বলছ না কেন সেই খবর?

আঃ, বলছি তো। আব্বন আবাব বলতে শুরু কবল, কথা বলতে বলতে রাজপুরোহিত হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাব দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে বলল, এই তুই কান খাড়া করে কি শুনছিস রে?

আমার প্রভু বলল, ও একটা গাধা, ওর কথা ধববেন না।

রাজপুরোহিত বলল, গাধা নয়, গাধা নয়, হাড়ে হাডে পাজি।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, আমাকে এমন করে চিনল কি করে?

ঘরের দরজাটা খোলা। আমি স্পষ্ট দেখলাম, একটা মেয়ে দরজার সামনে এসে দাডাল। ওর হাতে একটা ছুবি।

ছুরি?

হ্যাঁ, ছুরিই তো আমি কিছু বললাম না। আমার বলাব কি দরকার। তারপর দেখলাম মেয়েটা সেই ছুরিটা নিয়ে রাজ-পুরোহিতের উপর লাফিয়ে পড়ল

লাফিয়ে পড়ল ?

হ্যাঁ, পড়লই তো। ওরা চেঁচিয়ে উঠল। আর রাজপুরোহিত এক পাশে ঝুঁকে পড়ল। ছুরিটা সোজা লাগল না, ঘাড়ের কতটুকু চিরে দিয়ে চলে গেল। রাজপুরোহিতের ঘাড় থেকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। ওরা মেয়েটার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ওকে সোজা করে তুলে দাঁড় করাল।

রাজপুরোহিত ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখল, শেষে বলল, ও তুমি ? পালিয়ে এসেছ ? উষস্তি চাক্রায়ণ'ক মারতে এসেছিলে ? তাকে মারা এত সহজ নয়।

সাত্যকি আর উলুপী এক সঙ্গে বলে উঠল—রানী সুদক্ষিণা !

আব্বন বলে চলল, মেয়েটা রাজপুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, তুমি মরবে, তুমি মরবে, তুমি মরবে।

রাজপুরোহিত উত্তর দিল, উষস্তি চাক্রায়নের বড় শক্ত প্রাণ। এইটুকু রক্তপাত হলেই সে মরে না।

মেয়েটা আবার তেমনি করে মাথা নেড়ে হেসে হেসে বলতে লাগল, তুমি মরবে, তুমি মরবে, তুমি মরবে। ছুরির আগায় বিষ মাখানো আছে। এ বিষে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না।

কথা শুনে রাজপুরোহিত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কতক্ষণ এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল, ওর শরীর টলতে লাগল। শেষে প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে মাটি থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে সেই মেয়েটার বুকে বসিয়ে দিল। মেয়েটা পড়ে গেল। রাজপুরোহিতও পড়ে গেল ! দু'জনেই মরে গেল।

মরে গেল ? সাত্যকি আর উলুপী চিৎকার করে উঠল।

হ্যাঁ মরেই তো গেল।

সে কথা এত পরে বলতে হয় ! সাত্যকি বলে উঠল।

আব্বন বিবেচক লোকের মতই বলল, সব কথা খুলে না বললে বুঝবে কেমন করে ?

সাত্যকি মঙ্গলকে বলল, আজই আমাকে সুদাসের ওখানে যেতে হবে।

মঙ্গল একটু আপত্তি জানিয়ে বলল, সেটা কি ঠিক হবে? পথে-ঘাটে যে যাকে পাচ্ছে, সে-ই তাকে মারছে। তার চেয়ে লোক পাঠিয়ে সুদাসকে আনিয়ে নেওয়া যাবে।

সাত্যকি বলল, কিছু হবে না। সন্ধ্যার পরে অন্ধকার নামলে চলে যাব।

উলূপী বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তুমি না হয় না-ই গেলে।

কেন?

পথটা বেশী ভাল নয়।

তবে তুমিও যেও না।

ছাড়বেই না তুমি? চল তবে।

সেই রাত্রিতেই ওদের একটা দল ছুটতে ছুটতে সুদাসের কাছে গিয়ে খবর দিল, আচ্ছা শিকার মিলেছে আজ।

কখন? উল্লাসে সুদাসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

এই মাত্র।

একটা?

একটা না দুটো। একটা পুরুষ, আর একটা মেয়ে।

কি করলি?

কেটে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছি। লোকটা মরতে মরতেও বলছিল, তোমরা সুদাসকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তার বন্ধু লোক। আমার নাম সাত্যকি। আমরা বললাম, সুদাসকে আর ডাকতে হবে না। আমরাই তোমার শেষ গতি করতে পারব। তুমি যখন সুদাসের বন্ধু, আমরা বন্ধুর কাজই করব।

সুদাস একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, কি, কি বললে ওর নাম ?

বলছিল, ওর নাম সাত্যকি।

সুদাস লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠল, ওরে, না না না, তারা বলছিস কি ? বলছিস কি ?

ওরা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা স্পষ্ট শুনেছি, তার নাম সাত্যকি।

[শেষ]